আমার বাংলা আমার দেশ

সুধীরচন্দ্র সরকার

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ :: বৈশাখ, ১৩৭১

মুদ্রক : শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস । ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা

নিবেদন

যাঁর এই স্মৃতিচারণ তিনি নিজে গ্রন্থাকারে এ বই দেখে যেতে পারলেন না —ব্যক্তিগত ভাবে আমার এ দুঃখ অপূরণীয়। এই গ্রন্থের লেখক আমার পিতৃদেব স্বর্গত সুধীরচন্দ্র সরকার। তিনি এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখার জন্য যে বাসনা প্রকাশ করেছিলেন অথচ লিখে যেতে পারেন নি, অনিবার্যভাবেই সে ভার আমার ওপর এসে পড়লেও, তাঁর ভাব ও চিন্তাধারাকে যথাযথ আমার পক্ষে প্রকাশ করা যে সম্ভব নয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সে কারণ আমি এই গ্রন্থ সম্পর্কে আমার সামান্য দু'চার কথা এই 'নিবেদন'-এর মধ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

'আমার কাল আমার দেশ' যে সময় থেকে সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তখনই পাঠকসাধারণ তথা সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকমণ্ডলীর সামনে একটি বিস্মৃতপ্রায় অতীত কাল থেকে আধুনিক কালের বহু স্মরণীয় দৃশ্যপট ক্রমান্বয়ে উন্মোচিত হতে থাকে।

অর্ধশতাব্দীব্যাপী সাহিত্য, প্রকাশনা ও সাহিত্যকারদের গতি-প্রকৃতি এবং বাংলা ভাষার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার যে চিত্রটি এই পুস্তকে বিবৃত হয়েছে, তা'তে বহু মূল্যবান ও সাধারণে অজ্ঞাত তথ্য স্থান পেয়েছে। সেজন্য 'আমার কাল আমার দেশ'কে শুধু লেখকের আত্মজীবনী বা আত্মবিশ্লেষণ বললে ভুল হবে—এটা বাংলা দেশের, বাংলা সাহিত্যের ও বাংলা পুস্তক প্রকাশনার একটা ইতিহাস।

এই প্রসঙ্গে স্বনামধন্য সুধী ও সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি যে পত্র লিখেছিলেন তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। তিনি লিখেছিলেন—

> 'আমার কাল আমার দেশ' যবে থেকে বেরুচ্ছে, মন দিয়ে, বড় আনন্দের সঙ্গে পড়ছি। আপনি, চারুবাবু, সত্যেন দত্ত গয়রহ আমার চেয়ে $\frac{1}{2}$ generation বড়। চারুবাবুর অনুবাদ 'আগুনের ফুলকি' যখন প্রবাসীতে বেরুচ্ছে তখনই আমার 'out book'

(!) পড়া আরম্ভ। সত্যেন দত্তের যে শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ কবিতা পাঠ করেন, প্রমথ চৌধুরী বক্তৃতা দেন, কাজী কবিতা ('শূন্য শ্মশানে কাঁদিয়া মরিছে কে ঐ অভাগা নারী'—বোধহয়) পড়েন, সেটাতে আমি উপস্থিত ছিলুম। আমি তখন শান্তি-নিকেতনে পড়ি; তাই আপনি যাঁদের কথা বলছেন, তাঁদের প্রায় সবাইকে—অবশ্য safe distance থেকে—সেখানেই দেখেছি। কারণ আপনারা ছিলেন আমাদের demigods!...আর আজকার modern-রা চারুবাবু, মণি গাঙ্গুলী,—তাঁদের নাম পর্যন্ত শোনেনি! এঁরা সবাই ছিলেন বড় cosmopolitan বাংলা সাহিত্যের সব কটা জানালা এঁরা খুলে ধরেছিলেন—বিশ্ব-সাহিত্যগুলিস্তান বোস্তানের খুশবাই যেন আমাদের সাহিত্য-বাসর ভরে দেয়।...সামান্য পাঠক হিসেবে বলছি, এরকম সরল 'ঘরোয়া' style-এ লেখা অর্বাচীনদের কর্ম নয়। আপনি এঁদের চিনেছিলেন গভীর অনুভূতির মারফৎ; তাই আপনার লেখাটিতে আছে সরল অনুভূতি—আল্লাকে অসংখ্য শুকৃরিয়া। 'সাহিত্য বিচার' তথা 'ইস্তেটিকসে'র নামে অধুনা যে বাক্যের বহ্বাড়ম্বর প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে তার থেকে, সরস্বতীর কৃপায়, আপনি সম্পূর্ণ মুক্ত। শংকর আপনাকে জয়যুক্ত করুন।'

পিতৃদেবের এই লেখার ব্যাপারে অনেকেই তাঁকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু বিশেষ ক'রে দু'জনের নাম আমাকে করতেই হবে—তাঁরা হলেন শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রশান্ত মিত্র।



সুধীরচন্দ্র সরকার

মানুষের চলার শেষ কোথায় ?

শেষ আছে কিনা তাও জানি না। কারণ গতিই জীবন। এই গতি যেদিন থেমে যায়, সেদিন পৃথিবীতে মানুষের কাজও ফুরিয়ে যায়, সে বিদায় নেয় পৃথিবী থেকে।

এই দীর্ঘ পথপরিক্রমার পর যখন সে পথের শেষপ্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ায় তখন তার দৃষ্টি চলে যায় সেই সুদূরে যেখানে তার পথের শুরু হয়েছে। মনে পড়ে একে একে ফেলে-আসা দিনগুলির কথা—যে দিনগুলি আনন্দে ও বেদনায় ভরা, হাসি ও অশ্রুতে সমুজ্জ্বল, আশা ও নিরাশায় দোদুল্যমান। মনে পড়ে কত চেনা-অচেনা মুখের কথা, মনের পর্দায় ভেসে ওঠে কত খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট ঘটনার কথা—অবসর সময়ে সেগুলি রোমন্থন করতে কখনো বা ভাল লাগে, কখনো বা শিউরে উঠি, কখনো সেইসব ঘটনা মনে প্রেরণা জোগায়, কখনো বা সেগুলি এনে দেয় ভবিষ্যতের সাবধানবাণী।

আমি আজ জীবনের সায়াহ্নবেলায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘজীবনের পথ-পরিক্রমায় ক্লান্ত হয়ে অতীতের দিকে চোখ ফেরাতেই নানা ঘটনা আর চরিত্রের ভীড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। ছায়াছবির ঘটনার মত সবকিছুই একে একে মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। এ যেন নিজের জীবনের হিসাবনিকাশের একটা ব্যালান্স সীট টানার মত।

বহু সাধারণ ও অসাধারণ, জ্ঞানী, গুণী ও সুধীজনের সংস্পর্শে এসে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে এই শতাব্দীর দেশ, সমাজ এবং দেশের মানুষকে কি রকম দেখেছি তারই একটা মোটামুটি চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করছি পাঠকদের কাছে। আমার পরিশ্রম সার্থক হলে ধন্য মনে করব নিজেকে।

আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে—১৮৯২ সালে বহরমপুরে আমি প্রথম পৃথিবীতে আলো-হাওয়ার সংস্পর্শে আসি। আমার পিতা রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকার মহাশয় তখন সেখানে আইনজীবী হিসাবে বিশেষ প্রভাবশালী। ভাইবোনে মিলে আমরা ছিলাম বারজন কিন্তু এখন বেঁচে আছি শুধু আমি আর আমার এক বোন।

বাবাকে নানা জায়গায় কর্মব্যপদেশে ঘুরে বেড়াতে হত। সেইজন্যে বাবার সঙ্গে আমরাও নানা জায়গায় যেতাম। বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী রক্ষণশীল কড়ামেজাজী লোক। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং নিয়মতান্ত্রিকতার মাঝে আমরা বড় হয়ে উঠেছিলাম। আমোদ আহ্লাদ বা খেলাধূলার দিকে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে বাবাকে দেখলে মনে হত অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির কিন্তু আসলে তা ছিলেন না তিনি—তাঁর মনটি সত্যই কোমল ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে বাবার সঙ্গে আমি প্রথম যাই রাজসাহী, তারপর বাবা চলে আসেন হাওড়ায় ১৯০৩-০৪ সালে। সেখানে আমরা তিন-চার বছর ছিলাম। এই সময়েই রুশ-জাপান যুদ্ধ লাগে, শেষকালে অবশ্য জাপানীরাই পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে সমগ্র যুদ্ধে জয়ী হয়। এই রুশ-জাপান যুদ্ধের বিবরণী তখনকার সব খবরের কাগজে খুব ফলাও করে বেরুত। আর সেইসব সংবাদ আমাদের কিশোর মনে দারুণ আগ্রহ জাগিয়ে তুলত। রোজ সকালে উঠে খবরের কাগজ পড়ার উৎসাহ একটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গেল। আমার সাহিত্য-জীবনের এই সূত্রপাত।

এর পর বাবা যান পাবনায়। বহরমপুরে আমার জন্মস্থান হলেও আমাদের আসল পৈত্রিক ভিটা হল পাবনা জেলার মালঞ্চী গ্রাম। ইছামতী নদীর তীরে ছোট্ট একটি গ্রাম। তারপর পাবনা থেকে

যান পুরুলিয়ায়—সেখানে তিনি মুন্সেফ থেকে সাব-জজ হন। তখনকার দিনে বি-এল এর নিচে পি-এল পাশ করেও ওকালতি করা যেত। এখানে দু'তিন বছর থাকার পর কলকাতার আলিপুরে আসেন সাব-জজ হয়ে এবং তার প্রায় চার বছর পরেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সে ১৯১০ সালের কথা। আমার মেজদাদা প্রবোধচন্দ্র সরকার যিনি কালিম্পং-এ প্র্যাকটিশ করতেন তিনিও পি-এল পাশ ক'রে ওকালতি করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের অধীনে পি-এল ও মুন্সেফী পরীক্ষা হ'ত। এই সময় ১৯১১ সালে তদানীন্তন ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতে আসেন এবং বাবাও দিল্লী দরবার উপলক্ষে রায় বাহাদুর খেতাব প্রাপ্ত হন। তখন হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি ছিলেন সার লরেন্স জিনকিন্স। অবসর নেবার আগে বাবা আমার এক ভাইকে ছোট আদালতের বিচারক ও ভগ্নিপতিকে মুন্সেফ করে দিয়েছিলেন।

বাবার বই লেখার খুব ঝোঁক ছিল—লিখেছেনও অনেকগুলি, তবে সেগুলি সবই আইনসংক্রান্ত বই এবং ইংরেজীতে। এইসব আইন-পুস্তকের চাহিদা তখন খুব ভাল ছিল, সেই কারণে বেশ কিছু টাকাও পাওয়া যেতে লাগল। বাবা তখন আমার ন'দাদা সুবোধচন্দ্র সরকারকে নিয়ে বর্তমানের এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স পুস্তকের দোকানের পত্তন করেন ১৯১০ সালে। আজ অর্ধ শতাব্দীরও বেশী হয়ে গেল প্রকাশক এবং পুস্তকবিক্রেতা হিসাবে অতীব সম্মান এবং গৌরবের সঙ্গে এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স চলে আসছে।

আমাদের পরিবারের অনেকেরই মধ্যে বিদ্যানুরাগ প্রবল ছিল বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষায়। বাবার তো ছিলই, তা ছাড়া প্রখ্যাতা মহিলা সাহিত্যিক সরলাবালা সরকার ছিলেন আমার বড় বৌদি, শরৎচন্দ্র সরকারের পত্নী। সরলাবালা সরকার ছিলেন মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের ভাগ্নী। তিনি সুকবি ছিলেন—তাঁর প্রথম কবিতার বই হল 'প্রবাহ'। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য বই অনেক

আছে। তখনকার 'সাহিত্য', 'জাহ্নবী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হত। তারপর 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ'-এও তাঁর বহু লেখা বেরিয়েছে। ইনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সে সম্পর্কে একটি বইও লেখেন। এঁরই মেয়ে হলেন শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকার—আনন্দবাজার পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক ও কর্ণধার শ্রীঅশোককুমার সরকারের মাতা।

কাদম্বিনী দেবী ছিলেন আমার বড়দিদি। লোকসমাজে যে বিশেষ পরিচিতা ছিলেন তা বলা চলে না। উচ্চশিক্ষিতা বলতে আমরা যেরকম বি-এ, এম-এ পাশকরা লোককেই সাধারণত বুঝি— তিনি তাও ছিলেন না। তবু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখতেন। বড়দি আধ্যাত্মিক জগতেই বিচরণ করতে ভালবাসতেন, তাঁর ঈশ্বর জিজ্ঞাসা ও 'অসামান্য ধীশক্তি' রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে উভয়ের মধ্যে পত্রযোগে নানা বিষয়ের আলাপ-আলোচনা চলেছিল। তাঁদের মধ্যে কি ধরনের পত্র বিনিময় হতো তারই দু'একখানি নীচে তুলে দিলাম ঃ

ওঁ ৯ই মে, ১৯০৬

কল্যাণীয়াসু

আমার নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে।

সংসারক্লিষ্ট হৃদয়ের শান্তির জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। ইহা নিশ্চয় জানিয়ো সুখ দুঃখ বাহিরের ঘটনার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, বাহিরের ঘটনা অতি ক্ষুদ্র উপলক্ষ্য মাত্র, ঈশ্বর যাহার অন্তকরণে সুখী হইবার শক্তি দেন সেই জীবন হইতে জগৎ হইতে সুখ লাভ করিতে পারে। আমি অনেক লোককে জানি যাহারা সুখকর সমস্ত উপকরণ দ্বারা বেষ্টিত, কিন্তু চিরজীবন সুখ অনুভব করিল না। দূর

হইতে উপদেশ দেওয়া সহজ—কিন্তু আমি জানি অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে জীবন যখন সর্বদা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে তখন জগৎ হইতে রস আকর্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন।...তোমার চারিদিকে যেটুকু লেশমাত্র সুখ যেটুকু কণামাত্র আনন্দ আছে তাহাকেই মনের সম্মুখে রাখ—বল 'আনন্দং পরমানন্দম্।' পরাভূত হইয়ো না—দুঃখকে সর্বদা দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে থাকিলেই তাহার জাল ছিন্ন করা কঠিন হইয়া উঠে—সমস্ত দুঃখ দৈন্য অভাবের চেয়ে যে আমি বড় ইহা বারম্বার মনকে বুঝাইয়া......মন যখনই অপ্রসন্ন হইতে চাহিবে তখনি তাহাকে তোমার সমস্ত শক্তিতে উর্ধ্বের দিকে টানিয়া তুলিবে, বলিবে—

সুখং বা যদিবা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ম্
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়েনাপরাজিতা—

সুখই হউক দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক অপ্রিয়ই হউক যাহাই প্রাপ্ত হইবে তাহাকেই অপরাজিত চিত্তে উপাসনা করিবে। ইতি—২৬শে বৈশাখ, ১৩১৩।

আশীর্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর একখানি চিঠিতে স্বাধীনতালাভের পথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির মতদ্বৈধতার পরিচয় পাওয়া যায়—তিনি লিখেছিলেন :

"ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করতে হবে কিম্বা ভারতবর্ষ কোনদিন স্বাধীন হবার চেষ্টা করবে না এমন কথা আমি বলিনি। মহাত্মাজি বলেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আমরা থাকব এবং সে রকম থাকবার ইচ্ছা না করা

"religiously wrong" অর্থাৎ ধর্মবিরুদ্ধ। আমি তা বলি নে। আমি বলি, স্বাধীনতা বাইরের কোন একটা ঘটনার উপর নির্ভর করে না; দেশের যে অবস্থা ঘট্‌লে স্বাধীনতার মূলপত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয় সে অবস্থা ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করাই আমাদের বর্তমান কর্তব্য। সে অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না—তার সাধনা তার চেয়েও কঠিন ও বিচিত্র—তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্যা চাই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা তপস্যা নয়। যে সব কাজে মনের সমস্ত শক্তির জাগরণ ও দীর্ঘকালের প্রাত্যহিক ত্যাগস্বীকার চাই সে কাজে যখন আমাদের ছেলেদের কোনো উৎসাহ দেখি নে যখন দেখি তারা নিরন্তর তীব্র হৃদয়াবেগের নেশায় মেতে থাকতে চায় "তদা ন সংশে বিজয়ায়, সঞ্জয়।" …ইতি ২২ মাঘ ১৩২৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই ধরনের প্রায় নব্বুই খানি রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি কয়েক বছর আগে আমি বিশ্বভারতীকে দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর 'চিঠিপত্র'-তে (৭ম ভাগ) এই চিঠিগুলি মুদ্রিত হয়েছে।

বড়দির বিয়ে হয় কুষ্টিয়ার রূপিহাট গ্রামের প্রাণগোপাল দত্তের সঙ্গে, কিন্তু বিয়ের অল্পদিনের মধ্যে জামাইবাবু মারা যান। এই অল্প বয়সে বিধবা হওয়ায় তিনি যে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন, এই শোকের হাত থেকে খানিকটা সান্ত্বনালাভের আশায় তিনি রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে আশ্রয় লাভ করেন এবং ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন।

এই রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন বড়বৌদি অর্থাৎ শ্রীমতী সরলাবালা সরকার। কবির 'রাজর্ষি' পড়ে বড়দি এতদূর

প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যে, সেই সময় যে কাণ্ডটি তিনি করেছিলেন তাতে আমাদের পরিবারের সকলের মনেই একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। ঘটনাটি যতদূর আমার মনে পড়ছে তা এই রকম।

আমি আগেই বলেছি যে আমাদের আদি বাড়ী হল পাবনা জেলার মালঞ্চী গ্রামে। আমাদের দেশের বাড়ীতে খুব ধুমধাম-সহকারে তুর্গাপূজা হতো। সেবার আমরা অনেকেই গেছি পুজোর সময়। বাংলাদেশের গ্রামের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। বাংলামায়ের সে শস্যশ্যামলা রূপও যেমন এখন আর চোখে পড়ে না, তেমনি চোখে পড়ে না আগেকার মত শান্তশিষ্ট সরল মানুষগুলিকে। এখনকার যান্ত্রিক সভ্যতা আর রাজনৈতিক আবহাওয়ায় সবার মধ্যেই এনে দিয়েছে বিরাট পরিবর্তন।

এই পুজোর সময় আমাদের ওখানে পাঁঠাবলি হতো। পাঁঠার মাংস খেতে যতই ভাল লাগুক, চোখের সামনে একটা নিরীহ জীবকে বলি দেওয়া হচ্ছে এ দৃশ্য দেখতে সাধারণত মন চাইত না। তবু একটা প্রথা চিরকাল ধরে চলে আসছে—কারুর ভাল লাগুক বা না লাগুক এটা একটা পূজার অঙ্গ হিসাবেই চলে আসছিল।

বড়দি এই সময় ঝোঁক ধ'রে বসলেন বলি বন্ধ করতে হবে। জ্যেষ্ঠদের অনেক অনুরোধ, অনুনয়-বিনয় প্রভৃতি করার পরও যখন তাঁর কথা কেউ শুনলেন না, তখন তিনি অনশন শুরু করেন।

মহাষ্টমীর দিন এইস্থানে অনেক পাঁঠা বলি দেবার জন্যে আনা হয়েছে। আমি এবং আমার সমবয়সী ছেলেরা একটা চাপা উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যতই বলির সময় এগিয়ে আসতে লাগল ততই আমাদের মানসিক উত্তেজনাও বৃদ্ধি পেতে লাগল।

বলির সময় আসতেই হঠাৎ এ কি দৃশ্য! আমরা সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম দিদি পাঁঠাবলির হাঁড়িকাঠের ভেতর মাথাটি ঢুকিয়ে দিয়ে বসে আছেন। এর আগে তিন দিন ধরে বড়দি আহার

ত্যাগ করেছেন। পুরোহিত থেকে বাড়ীর সকলেই তাকে অনুরোধ করতে লাগলেন। একি অলুক্ষণে কাণ্ড! এতদিনের প্রথা—বলি রহিত হলে সংসারে মহা অমঙ্গল ঘটবে যে!

কিন্তু বড়দির মুখে শুধু এক কথা—আগে বলি বন্ধ কর, তবে আমি উঠব। নইলে আমাকেই আগে বলি দাও।

শেষে বড়দিরই জয় হল। আমাদের বাড়ীর যাঁরা অভিভাবক-স্থানীয়, তাঁরা জগজ্জননীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে এ বাড়ীতে আর কখনও পশু বলি হবে না। তখন দিদি হাঁড়িকাঠ থেকে বেরিয়ে এসে অনশন ভঙ্গ করেন। দিদির এই অদ্ভুত মনের জোর আমাদের কিশোর মনকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল।

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বনলতা দেবী সম্পাদিত কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত 'অন্তঃপুর' মাসিক পত্রে (প্রকাশ ১৩০৪ মাঘ) বড়দির কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সরলা দেবী চৌধুরাণী প্রতিষ্ঠিত ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলে তিনি কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করেন।

সুতরাং ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাড়ীতে যে সাহিত্য আলোচনা হত তা আমি শুনতাম। বাবা, দাদা, বৌদি, দিদিদের সাহিত্য সাধনা থেকে আমারও মনে ধীরে ধীরে সাহিত্যানুরাগ জন্মাতে শুরু করে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত জীবনের গতি একমুখী হয়েই চলেছে—পুস্তক, পত্রিকা এবং প্রকাশনাক্ষেত্রে।

বড়দার মেয়েই হলো নির্ঝরিণী। এর সঙ্গে বিয়ে হয় প্রফুল্লকুমার সরকারের পুরুলিয়ায় ১৯০৩-০৪ সালে। তখন প্রফুল্লকুমার বি-এ পাশ করেছেন। বাবা পুরুলিয়া থেকে বদলি হ'লে আমরা যখন ভবানীপুরের কেদার বসু লেনের বাড়ীতে আসি, তখন সেইখানে থেকে প্রফুল্লকুমার আইন পড়তে শুরু করেন।

বাংলা ভাষায় প্রফুল্লকুমার অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বি-এ

পড়ার সময় 'বঙ্কিমচন্দ্র' সম্বন্ধে একটি রচনা প্রতিযোগিতায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

আমার যতদূর জানা আছে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসঙ্গের চেয়েও তাঁর বঙ্কিম-সাহিত্যে অধিকার বেশী ছিল। আমরা ওঁর দু'তিনখানি বই ছেপেছিলাম।

তারপর বি-এল পাশ করার পর উড়িষ্যার ঢেনকানল রাজ্যে কিছুদিন কাজ করে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই পত্রিকার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন।

যতদূর মনে পড়ে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পুরুলিয়া থেকে কলকাতা এসে ভবানীপুরে কেদার বসু লেনে আমরা উঠি। এর আগে ১৯০৩-০৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুলে আমি পড়েছি। ১৯০৬ সালের শেষে ভবানীপুরে পোড়াবাজারে কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছিল। এই কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে একটা প্রদর্শনীও হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর প্রবেশ পথে একটি বৃহদাকার বেলুন ছিল। কংগ্রেস অধিবেশন তিন-চার দিনে শেষ হলেও প্রদর্শনীটি কিন্তু অনেকদিন ধরে চলেছিল। এই কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম ভূতপূর্ব ভারতীয় সভ্য বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা দাদাভাই নৌরজী। তিনি সেই সময় সর্বপ্রথম 'স্বরাজ' কথাটি ব্যবহার করেন। তিনি প্রচার করলেন যে, কংগ্রেসের আদর্শ হল 'স্বরাজ' লাভ করা। এই 'স্বরাজ' কথাটি ব্যবহার করে দেশে রাজনৈতিক মহলে বেশ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করলেন। আমাদের 'স্বরাজ' লাভ করাই তখন একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হয়ে পড়লো।

আমি কলকাতায় এসে ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বন স্কুলে ভর্তি হলাম। এর আগে আমাকে ছাত্রজীবন কাটাতে হয়েছে উকীলস্ ইনস্টিটিউশান, ঢাকা ; পাবনা ইনস্টিটিউশান, পাবনা ; হাওড়া জেলা স্কুল, হাওড়া ; ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশান, পুরুলিয়া ; এল এম এস ইনস্টিটিউশন, ভবানীপুর প্রভৃতি।

যাই হোক, এই সাউথ সুবার্বন স্কুলটি হরিশ পার্কের গায়ে লাগানো। আমি এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যে জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়লাম। অর্থাৎ আমি তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি—আমাদের ক্লাসের সব ছেলেই কলকাতার। পুরুলিয়া থেকে এসেছি বলে ক্লাসের ছেলেরা আমায় 'বাঙাল' বলে নানারকম টিটকারী দিত যদিও আমার জন্মস্থান হল পশ্চিমবঙ্গে। এবং সেই টিটকারীর বহর আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল। এখানে বলা দরকার যে তখন শেয়ালদা স্টেশনে নামলেই সকলকে 'বাঙাল' বলে পরিচিত হতে হত। কিন্তু আমি পুরুলিয়া থেকে হাওড়ায় এসে নামলেও এই 'বাঙাল' আখ্যা থেকে আমি পরিত্রাণ পেলাম না।

কলকাতার স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর তিনটি জিনিসের পরিবেশ আমার খুব ভালো লাগলো। ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলা দেখা এবং স্বদেশী আন্দোলনের নানারকম পরিস্থিতি। এই সময়ে এই তিনটি জিনিসের মধ্যে আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম।

ক্রিকেট খেলার কথা বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয় মহারাজা অফ্ নাটোরস ইলেভেন, মহারাজা অফ কুচবিহারস্ ইলেভেন, ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব এবং ইউরোপীয়ানদের বালিগঞ্জে ক্রিকেট ক্লাব। এই চারটি ক্লাবই কলকাতায় তখন সেরা ক্রিকেট টীম ছিল। আমরা দল বেঁধে সবাই ইডেন গার্ডেনসে বা অন্যত্র এই দলগুলির খেলা দেখে শীতকালটা কাটিয়ে দিতাম।

এই সময় আর একটি উৎসব গড়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল—সেটি হলো 'লেডী মিণ্টো ফ্যান্সী ফেট্'। তৎকালীন ভাইসরয়পত্নী লেডী মিণ্টো কর্তৃক নার্সদের সাহায্যকল্পে এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই উৎসব হ'তে যে টাকা উঠতো তা নার্সদের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হ'ত। তখনকার কালে সমস্ত দেশের মধ্যে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ছিল সাহেবদের মধ্যে দুর্ধর্ষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল দল। এই প্রতিযোগিতায়

তখনকার বাঙালী ফুটবল ক্লাব মোহনবাগান দুর্ধর্ষ ক্যালকাটা ফুটবল দলকে হারিয়ে দিয়ে ক্রীড়ামহলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। এতে আমরা খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলাম, কারণ রোগা লিকলিকে একদল বাঙালীর ছেলে খালি পায়ে খেলে ওরকম একটা দুর্ধর্ষ দলকে হারিয়ে দিল—যাদের বুটের সামনে এগুনোই রীতিমত একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল।

এ যেন আমাদের একটা জাতীয় জয়। কিন্তু এ আনন্দ আমাদের বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না—হরিষে বিষাদ এসে গেল। কারণ ক্যালকাটা দল প্রতিবাদ জানায় যে মোহনবাগান দল প্রফুল্ল বিশ্বাস নামক একজন খেলোয়াড়কে খেলিয়েছিল যে তাদের ক্লাবের সভ্য নয়। সেজন্যে মোহনবাগানকে সে প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল করে দেওয়া হয়। অবশ্য এই একটা জিনিস ভালভাবে প্রমাণিত হলো যে রোগা লিকলিকে বাঙালীর ছেলেরা খালি পায়ে খেললেও তাদের মনোবল এত অসাধারণ ছিল যে তারা শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় দলকে হারিয়ে দিতে পারে।

বিখ্যাত বাঙালী খেলোয়াড়দের মধ্যে ভাদুড়ী ভ্রাতৃদ্বয়, সুধীর চট্টোপাধ্যায়, অভিলাষ ঘোষ ও কানু প্রভৃতি ছিলেন। এর প্রতিশোধ অবশ্য মোহনবাগান দল নিজেই নিয়েছিল ১৯১১ সালে। পর পর পাঁচটি ইউরোপীয় দলকে (যেমন থার্ড মিডল্‌সেক্স, ডালহৌসী, রাইফল ব্রিগেড, রেঞ্জার্স, ইষ্ট ইয়র্ক) হারিয়ে বাংলার তরুণ খেলোয়াড়েরা প্রমাণ করল যে তারাও ইউরোপীয় দলের মতই দুর্ধর্ষ।

ঐতিহাসিক আই-এফ-এ শীল্ড ফাইনালের খবর এখানে কিছু দেওয়া দরকার। মোহনবাগান খেলছে ইস্ট ইয়র্ক দলের সঙ্গে। খেলার স্থল ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের এক পাশে শাদা চেয়ার-মার্কা গ্যালারিতে অধিকাংশ সাহেবরাই বসতে পারত। কালা আদমীর এখানে স্থান ছিল না। হাফ-টাইমের আগেই দেখা গেল গোরা দল

যাই হোক, এই সাউথ সুবার্বন স্কুলটি হরিশ পার্কের গায়ে লাগানো। আমি এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যে জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়লাম। অর্থাৎ আমি তখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি—আমাদের ক্লাসের সব ছেলেই কলকাতার। পুরুলিয়া থেকে এসেছি বলে ক্লাসের ছেলেরা আমায় 'বাঙাল' বলে নানারকম টিটকারী দিত যদিও আমার জন্মস্থান হল পশ্চিমবঙ্গে। এবং সেই টিটকারীর বহর আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল। এখানে বলা দরকার যে তখন শেয়ালদা স্টেশনে নামলেই সকলকে 'বাঙাল' বলে পরিচিত হতে হত। কিন্তু আমি পুরুলিয়া থেকে হাওড়ায় এসে নামলেও এই 'বাঙাল' আখ্যা থেকে আমি পরিত্রাণ পেলাম না।

কলকাতার স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর তিনটি জিনিসের পরিবেশ আমার খুব ভালো লাগলো। ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলা দেখা এবং স্বদেশী আন্দোলনের নানারকম পরিস্থিতি। এই সময়ে এই তিনটি জিনিসের মধ্যে আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম।

ক্রিকেট খেলার কথা বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয় মহারাজা অফ্ নাটোরস ইলেভেন, মহারাজা অফ কুচবিহারস্ ইলেভেন, ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব এবং ইউরোপীয়ানদের বালিগঞ্জে ক্রিকেট ক্লাব। এই চারটি ক্লাবই কলকাতায় তখন সেরা ক্রিকেট টীম ছিল। আমরা দল বেঁধে সবাই ইডেন গার্ডেনসে বা অন্যত্র এই দলগুলির খেলা দেখে শীতকালটা কাটিয়ে দিতাম।

এই সময় আর একটি উৎসব গড়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল—সেটি হলো 'লেডী মিণ্টো ফ্যান্সী ফেট্'। তৎকালীন ভাইসরয়পত্নী লেডী মিণ্টো কর্তৃক নার্সদের সাহায্যকল্পে এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই উৎসব হ'তে যে টাকা উঠতো তা নার্সদের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হ'ত। তখনকার কালে সমস্ত দেশের মধ্যে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ছিল সাহেবদের মধ্যে দুর্ধর্ষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল দল। এই প্রতিযোগিতায়

তখনকার বাঙালী ফুটবল ক্লাব মোহনবাগান দুর্ধর্ষ ক্যালকাটা ফুটবল দলকে হারিয়ে দিয়ে ক্রীড়ামহলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। এতে আমরা খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলাম, কারণ রোগা লিকলিকে একদল বাঙালীর ছেলে খালি পায়ে খেলে ওরকম একটা দুর্ধর্ষ দলকে হারিয়ে দিল—যাদের বুটের সামনে এগুনোই রীতিমত একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল।

এ যেন আমাদের একটা জাতীয় জয়। কিন্তু এ আনন্দ আমাদের বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না—হরিষে বিষাদ এসে গেল। কারণ ক্যালকাটা দল প্রতিবাদ জানায় যে মোহনবাগান দল প্রফুল্ল বিশ্বাস নামক একজন খেলোয়াড়কে খেলিয়েছিল যে তাদের ক্লাবের সভ্য নয়। সেজন্যে মোহনবাগানকে সে প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল করে দেওয়া হয়। অবশ্য এই একটা জিনিস ভালভাবে প্রমাণিত হলো যে রোগা লিকলিকে বাঙালীর ছেলেরা খালি পায়ে খেললেও তাদের মনোবল এত অসাধারণ ছিল যে তারা শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় দলকে হারিয়ে দিতে পারে।

বিখ্যাত বাঙালী খেলোয়াড়দের মধ্যে ভাদুড়ী ভ্রাতৃদ্বয়, সুধীর চট্টোপাধ্যায়, অভিলাষ ঘোষ ও কানু প্রভৃতি ছিলেন। এর প্রতিশোধ অবশ্য মোহনবাগান দল নিজেই নিয়েছিল ১৯১১ সালে। পর পর পাঁচটি ইউরোপীয় দলকে (যেমন থার্ড মিডল্‌সেক্স, ডালহৌসী, রাইফল ব্রিগেড, রেঞ্জার্স, ইষ্ট ইয়র্ক) হারিয়ে বাংলার তরুণ খেলোয়াড়েরা প্রমাণ করল যে তারাও ইউরোপীয় দলের মতই দুর্ধর্ষ।

ঐতিহাসিক আই-এফ-এ শীল্ড ফাইনালের খবর এখানে কিছু দেওয়া দরকার। মোহনবাগান খেলছে ইস্ট ইয়র্ক দলের সঙ্গে। খেলার স্থল ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের এক পাশে শাদা চেয়ার-মার্কা গ্যালারিতে অধিকাংশ সাহেবরাই বসতে পারত। কালা আদমীর এখানে স্থান ছিল না। হাফ-টাইমের আগেই দেখা গেল গোরা দল

১—০ গোলে এগিয়ে গেছে। অনেক আশা নিয়ে আমরা দেখতে গেছি খেলা, কিন্তু এই বিপর্যয়ে শুধু আমরা কেন সমগ্র বাঙালীসমাজই যেন দারুণ মুশড়ে পড়ল। মোহনবাগানের আমরা বরাবর একটা গুণ দেখেছি যে, প্রথম দিকে হারলেও শেষ দিকে তারা ইউরোপীয় দলকে প্রায়ই অতিক্রম ক'রে যেত। আমরা তখন এই খেলাটিকে একেবারে জাতীয় খেলা বলে ধরে নিয়েছিলাম।

বিরতির পর চাকা গেল ঘুরে। নতুন উদ্যমে মোহনবাগান খেলতে শুরু করল। আমাদের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যেন ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না হলেন। পর পর দুটো গোল দিয়ে মোহনবাগান আই-এফ-এ শীল্ড জয়লাভের অভূতপূর্ব গৌরব অর্জন করল। তখন অবশ্য খেলা দেখতে সাধারণ লোকের জন্য গ্যালারীর বন্দোবস্ত ছিল না। বড় বড় কাঠের বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে হতো। অনেক সময় এই কাঠের বাক্স ভেঙে লোকে প'ড়ে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হ'ত। বহু লোক এই বাক্স ভাড়া দিয়ে বেশ দু' পয়সা উপার্জন করত।

এখানে একটা সামান্য ঘটনার কথা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে যে এই খেলা দেখবার জন্যে লোকেরা কিরকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কলকাতায় সে সময় একটি ইংরাজী সান্ধ্য পত্রিকা প্রকাশিত হতো—তার নাম ছিল 'এম্পায়ার'। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের মাঠ থেকে মিশন রো-এ এম্পায়ার পত্রিকার অফিস পর্যন্ত সেই সময় এই খেলার বিশেষ সংবাদদানের জন্য একটি বিশেষ টেলিফোন লাইন বসানো হয়েছিল। খেলার হাফ-টাইম পর্যন্ত খবর নিয়ে একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হলো, এবং খেলার মাঠে তা বিক্রি হতে লাগল। খেলা শেষ হ'লেও এই বিজয়বার্ত্তার খবর নিয়ে একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই থেকে বোঝা যাবে যে কলকাতায় তখন এই খেলার হার-জিৎ নিয়ে বাঙালী ও সাহেবদের মধ্যে কতখানি উদ্দীপনা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। সে একদিন

গেছে, এখন আমরা সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনের কথা যেন ভুলেই গিয়েছি।

কারণ তখনকার মোহনবাগান আর এখনকার মোহনবাগান দলে অনেক প্রভেদ। তখন সেটা সত্যিকার বাঙালী দল ছিল, এখন অবাঙালী খেলোয়াড়রাও অনেকে মোহনবাগানে খেলেন। মোহনবাগান তখন খালি পায়ে খেলত, এখন বুট পায়ে দিয়ে খেলছে। যেটা বাঙালীর বিশেষ দোষ ছিল। যদিও বুট পায়ে দিয়ে খেললে খেলোয়াড়দের গতি ও কৌশল একটু শ্লথ হয়ে যায়, আমার মনে হয়।

ফুটবলের মত ক্রিকেট খেলা দেখবারও ঝোঁক আমার কম ছিল না। কলকাতায় তখন ক্রিকেট দলগুলির ভিতর তিনটি দলের খুব নাম-ডাক ছিল। যেমন ক্যালকাটা, কুচবিহার মহারাজার একাদশ এবং নাটোরের মহারাজার একাদশ। বাইরে থেকেও মাঝে মাঝে দু'একটি দল ক্রিকেট খেলতে আসত, যেমন পাতিয়ালা মহারাজার একাদশ এবং জাম সাহেবের একাদশ। এইসব দলে আমরা দেখেছি কর্নেল মিস্ত্রি, নাটোরের বিখ্যাত বোলার পি. বালু যিনি পরে প্রথম ভারতীয় দলের সঙ্গে বোলার হিসেবে ইংলণ্ডে খেলতে গিয়েছিলেন; আর ছিলেন কুচবিহারের বিখ্যাত বোলার ওয়ার্ডেন; কুচবিহারের মহারাজার পরিবারভুক্ত যুবরাজ হিটিও বেশ ভালো খেলতেন।

এই সময় কলকাতার ক্রীড়াজগতে এমন একটা ঘটনা ঘটে, যাতে চারদিকে বেশ সাড়া পড়ে যায়। সেবারে কলকাতায় খেলতে এসেছিলেন প্রিন্স রঞ্জি অর্থাৎ পৃথিবী বিখ্যাত খেলোয়াড় রণজিৎ সিং। ক্যালকাটা মাঠে ক্যালকাটা ক্লাব তাদের একজন নিয়মিত খেলোয়াড়ের অভাবে তাদের ভারতীয় গ্রাউণ্ডসম্যান ফাগুরামকে খেলতে মাঠে নামান। ফাগুরাম দলের মধ্যে নিয়মিত না খেললেও অনুশীলনের সময় রীতিমত বল করতেন। যাই হোক, কয়েকটা বল খেলবার পর ফাগুরামের বলেই রঞ্জি আউট হয়ে যান।

আর একটি ঘটনার কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সে সময় একদিন পাতিয়ালা টীমের খেলা মহারাণী দেখবেন বলে তাঁর গাড়ীকে মাঠের ভিতরে ও প্রায় টেণ্টের গায়ে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। এই সুবিধাটুকু দেওয়া হয়েছিল পাতিয়ালার রাণীর সম্মানে। আবার মোটরের কাঁচেরও এমন কারসাজি যে আরোহিণী ভালভাবে খেলা দেখতে পাবেন, কিন্তু বাইরের কেউ তাঁকে দেখতে পাবে না। অবশ্য আজকের দিনের ক্রিকেট খেলা দর্শনার্থীদের ভিড়ের তুলনায় সে ভিড় অতি নগণ্য।

ছাত্রজীবনটা যে আমি শুধু খেলাধূলা দেখেই কাটিয়েছি তা নয়, সেই সময় সব থেকে আমাদের তরুণ মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল স্বদেশী আন্দোলন। সে বিষয়ে দু'চার কথা এখানে বলতে চাই—

বাংলাদেশেই এই আন্দোলনটা তখন বেশ জোরদারভাবে চলেচে। আমাদের ক্লাসে দু' একজন ছাত্র ছিলেন যাঁরা এই বিপ্লবীদের সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে যুক্ত ছিলেন। আবার দু' একজন এমন ছাত্র ছিলো যারা ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচরের কাজ করে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে টাকা নিত। তাদের কাজ ছিল ক্লাসের কোনো ছেলের সন্দেহজনক গতিবিধি বা কার্যকলাপ দেখলেই পুলিশে খবর দেওয়া। আমরা এ স্বদেশী আন্দোলনকে মনেপ্রাণে সমর্থন করতাম বটে, তবে প্রচ্ছন্নভাবে।

বিপ্লবীদের কার্যকলাপের বিষয়ে পড়বার জন্যে মনটা সবসময় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। তাই প্রতিদিন বিকেলে স্কুলের ছুটির পর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' কাগজখানি না পড়লে মনে স্বস্তি পেতাম না। এ ছাড়াও প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত অনুশীলন দলের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'যুগান্তর' পড়তাম। শেষকালে এই যুগান্তর গুপ্তভাবে বিক্রয় করা হোতো। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর হিসাবে কারাবরণ করেন।

তখন সবচেয়ে রোমাঞ্চকর খবর ছিল আলিপুরের বিখ্যাত

বোমার মামলা। স্কুলের ছুটি হওয়া পর্যন্ত সবুর সইত না, কোন কোন দিন স্কুল কামাই করেও আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে যেতাম আলিপুরে ফৌজদারী আদালতে এই বোমার মামলার আসামীদের দেখতে। কোর্টের সামনে প্রকাণ্ড দুটি কালো রঙের মোটরগাড়ী দাঁড়িয়ে থাকত। এই গাড়ীগুলিকে ইংরাজীতে Black Maria বলা হত। প্রথম গাড়ী আসামী ভর্তি হয়ে গেলে বাকী আসামীরা দ্বিতীয় গাড়ীতে উঠতেন। বেশ মনে আছে সবশেষে উঠতেন শ্রীঅরবিন্দ। গাড়ীর চালক এবং রক্ষীরা সকলেই ছিলেন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট। গাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পর সকলের শেষে আসতেন নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। আমাদের সকলের কাছে ও আসামীদের কাছেও নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী তখন বিশ্বাসঘাতক বলে পরিচিত। গাড়ীর চালকের পাশে তাঁকে বসানো হতো যাতে কোনো অঘটন না ঘটে। যতক্ষণ না গাড়ীটি আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যেত ততক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম। শেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমরা যে যার বাড়ীর দিকে রওনা দিতাম।

নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর জন্য বোমার দলের আসামীরা ধরা পড়ে—এ বিশ্বাসঘাতকতার কি করে প্রতিশোধ নেওয়া যায়, তার চেষ্টা তখন তলে তলে চলছিল। শেষে একদিন জেলখানার হাসপাতালের মধ্যে কানাই দত্ত ও সত্যেন বসু অসুখের ভাণ ক'রে গেলেন। সেখানে তাঁরা নরেন গোস্বামীকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর মত স্বীকারোক্তি করবেন জানালেন। ফলে যা অনিবার্য তাই হল! এই সুযোগে নরেন গোস্বামী কানাই দত্ত ও সত্যেন বসু কর্তৃক নিহত হলেন। ফলে সত্যেন বসু ও কানাই দত্তের ফাঁসি হল। জেলের ভেতর ফাঁসি হওয়ার পর যখন কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে কানাই দত্তের মৃতদেহ নিয়ে আসা হল সৎকারের জন্য, তখন আমি সে স্থানে উপস্থিত ছিলাম। একজন ধুরন্ধর ব্যবসায়ী সঙ্গে সঙ্গে কানাই দত্তের ছবি

ছেপে গোপনে বিক্রি করতে লাগল। আমিও একটি ছবি কিনে স্কুলের খাতার মধ্যে রেখে দিলাম। তার কিছুদিন পরে সেটি নষ্ট করে ফেলেছিলাম পুলিশের ভয়ে।

বৃটিশ সরকারের মতে এঁরা দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত হলেও আমাদের তরুণ মনে তাঁরা হলেন শহীদ। দেশকে ভালবাসা অপরাধ নয়, বিদেশীর শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করা কি দেশদ্রোহিতা? শাসক-সম্প্রদায় বিদেশী বলে তাঁরা আমাদের মনে এই সব ধারণা ঢুকিয়ে দেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। আমাদের খোলাখুলি-ভাবে এই সব বিপ্লবী দলে যোগ দেবার সাহস বা সামর্থ্য না থাকলেও আন্তরিক সমর্থন ছিল এঁদের কাজে। তখন প্রায়ই মনে হত যদি এঁদের সঙ্গে একটা কিছু কাজ করতে পারি, তাহলে জীবন সার্থক মনে করব।

তারপর নানা বিপ্লবীদের হাতে অনেক পুলিশ কর্মচারীর হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়, তাদের বিস্তৃত বিবরণ না দেওয়াই এখানে ভালো। তবে বলে রাখা ভালো আলিপুরের জেলখানায় কানাই দত্ত ও সত্যেন বসুর দ্বারা হত্যাকাণ্ড ছাড়া আরো দু'একটি হত্যাকাণ্ড হয়। তবে বাকী হত্যার লক্ষ্য ছিল পুলিশ। সেইসব ঘটনার মধ্য দিয়েই আমাদের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক দিনই কাগজ খুললে একটা-না-একটা স্বদেশী ঘটনার বিবরণ পাওয়া যেতো। শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি সকলের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা শোনবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

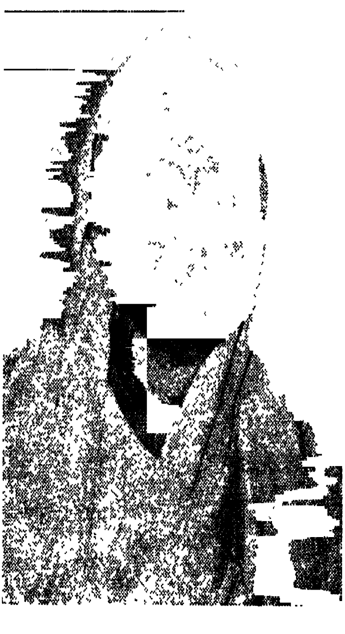
এই সময় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দু'টি দল ছিল—একটি হচ্ছে গরম দল (Extremist) ও একটি নরম দল (Moderate)। গরম দলে ছিলেন, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। নরম দলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ।াসবিহারী ঘোষ ইত্যাদি ছিলেন।



মনোমোহিনী দেবী



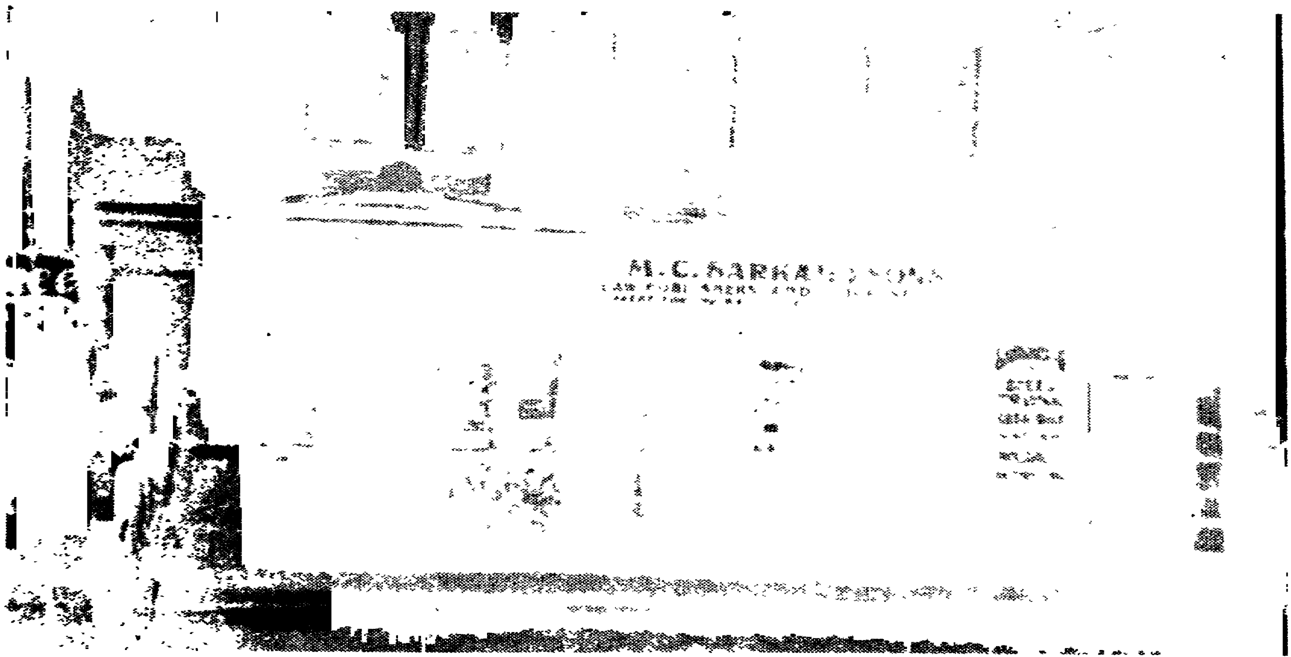
সুলেখা সরকার



সরলাবালা সরকার



নির্ঝরিণী সরকার



ওয়াই. এম. সি. এ-র নীচে দোকানঘর
(১৯২৮ সালে গৃহীত ছবি)

এই সময় আমাদের বাংলা দেশে দুটি আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠেছিল, একটি আন্দোলন হচ্ছে 'শিবাজী উৎসব'। মহারাষ্ট্র দেশ থেকে মহামান্য তিলক মহারাজ এসে এই আন্দোলনের পুরোভাগে বাংলা দেশে এসে দাঁড়ালেন। রবীন্দ্রনাথও এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। কবিগুরুর 'শিবাজি উৎসব' কবিতাটি এই সময়েই রচিত।

কোন দূর শতাব্দের কোন্
এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন্ শৈলে
অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে,
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা
তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি—
"এক ধর্মরাজ্যপাশে
খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

মহামতি তিলক তখন বাংলাদেশে এসে দাদাভাই নৌরজীর কথা খুব ভালভাবে জোরের সঙ্গে প্রচার করলেন—Swaraj is my birthright, and I must have it. এই সময় আমাদের মধ্যে আর একটা ব্যাপারও বেশ নাড়া দিয়েছিল। সেটা হচ্ছে গোখলের বাণী—What Bengal thinks to-day, whole of India thinks to morrow. এই কথা গোখলে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ব'লে আমাদের মনকে খুব আনন্দিত ও উৎসাহিত করেছিলেন।

অপর আন্দোলনটির নাম দেওয়া যেতে পারে 'বঙ্কিম আন্দোলন'। অমর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' তখন ঘরে

ঘরে পঠিত হোত। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতকে তখন থেকেই আমরা জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করেছিলাম। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' তখন গীতা-বাইবেলরূপে পরিগণিত হতো। এ ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকগুলিও বাংলাদেশের তরুণ মনে দারুণ উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার করতো।

এইভাবে আমাদের স্কুলজীবন শেষ হলো। এল. এম. এস স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এই সময় 'মর্ডান রিভিয়ু'তে বিদেশের সম্বন্ধে নানারকম লেখা বেরুবার দরুন আমার বিদেশে যাওয়ার এবং শিক্ষালাভ করবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু বাড়ীর পরিস্থিতি ও অর্থাভাবে সম্ভব হয়নি। এর পর ১৯১০ সালে ভর্তি হলাম সিটি কলেজে। এইখানেই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় শ্রীঅমল হোমের।

এখানে বলা দরকার যে, আমার সাহিত্যে হাতে-খড়ি এর মধ্যেই হয়ে গেছে। এই সময় লক্ষ্মীবিলাস প্রেস প্রকাশিত 'প্রবাহিনী' মাসিক পত্রিকায় আমি প্রথম লিখতে আরম্ভ করি নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে। অবশ্য বেশীদিন লিখতে পারিনি। এর জন্য আমি মাসে পাঁচ টাকা করে লেখার জন্য পেতাম। এইটেই আমার প্রথম লিখে টাকা পাওয়া। ১৯০৮-০৯ সালে আমি 'ভারতী'তে লেখা পাঠাই। তখন 'ভারতী'র সম্পাদিকা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রথম লেখা পাঠানোর পর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, কবে ছাপার অক্ষরে নিজের লেখাটি দেখতে পাব। ছাপার অক্ষরে নিজের লেখার সঙ্গে নিজের নাম দেখার মধ্যে যে অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার হয় তা বোধহয় নিজের নবজাত সন্তানদর্শনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। একদিন স্বর্ণকুমারী দেবী আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

তখনও স্কুলের ছাত্র, কতটুকুই বা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা হয়েছে তখন

আমার। তার ওপরে দেখা করতে হবে তখনকার দিনের সব থেকে প্রগতিশীল ঠাকুরপরিবারের স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে! দুরু দুরু বক্ষে গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু আমার সব ভয় কেটে গেল তাঁর নম্র ও বিনয়ী ব্যবহারে। আমি জানতে পারলাম যে লেখাটি আমার মনোনীত হয়েছে এবং আগামী সংখ্যায় তা প্রকাশিত হবে। এ ছাড়াও তিনি আমাকে অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ দিলেন।

শুরু হলো আমার সাহিত্য-জীবন। ভারতী ছাড়া অন্যান্য দু'একটি কাগজেও লিখতে শুরু করলাম। কিন্তু আসলে আমার সাহিত্যরচনার শিক্ষানবীশী আরম্ভ স্বর্গত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের অধীনে। তিনি তখন হেদুয়ার ধারে মানিকতলা স্ট্রীটের ওপর এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশান নামে একটি স্কুল খুলেছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রথমে আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য জৈন আইকোনোগ্রাফী নামক একটি প্রবন্ধ বাংলায় অনুবাদ করতে দিলেন। আমি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। তিনি খুশী হয়ে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন।

এই সময় বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স 'ভারতবর্ষ' নামক একটি মাসিক পত্র প্রকাশের আয়োজন করছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হবেন এর সম্পাদক কিন্তু এই সময় হঠাৎ মারা যাওয়ায় তিনি আর সম্পাদক হতে পারলেন না। তাঁর জায়গায় সম্পাদক হলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়। তখন আমি ও আমার বন্ধু প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'ভারতবর্ষে' দুজনে মিলে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলাম।

এর আগে 'জাহ্নবী' নামক মাসিক পত্রিকার পুনরুত্থান হয়। এই পত্রিকাটি প্রথমে বের করেছিলেন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে বন্ধ হয়ে যায়। পরে এটির পুনঃপ্রকাশ করেন সুধাকৃষ্ণ বাগচী। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর আমরা কয়েকজন মিলে এই পত্রিকার সম্পাদনা করতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে আমি ছাড়া

ছিল অমল হোম, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ও হেমেন্দ্রকুমার রায়। এই কয়জনের নামই 'জাহ্নবী'তে সম্পাদক হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অত অল্প বয়সে সম্পাদক হিসাবে নাম প্রকাশিত হওয়ায় আমরা খুবই গর্ব অনুভব করতাম। আমি ছাড়া সকলেই তখন সাহিত্যক্ষেত্রে বেশ পরিচিতি লাভ করেছিল।

নবীন চিত্রশিল্পী হিসাবে চারু রায় তখন বেশ নাম করেছেন এই 'জাহ্নবী'তেই ছবি এঁকে। তিনি আমাদের সম্পাদিত 'জাহ্নবী'র প্রচ্ছদপটটি এঁকে দেন। এই তাঁর ছবি প্রথম মুদ্রিত হ'ল।

'জাহ্নবী'র নিজস্ব লেখকগোষ্ঠী নিয়ে মাঝে মাঝে সাহিত্যসভা বসত—আমরা সবাই সেই সাহিত্যসভায় মিলিত হতাম। ছাত্র অবস্থাতেই আমি সম্পাদক হয়েছিলাম, একথা ভাবলে এখন কি রকম আশ্চর্য বোধ হয়। অমল হোম সেই সময় বিখ্যাত ইংরাজ লেখিকা মারী করেলীর চিঠি সংগ্রহ করে পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। আমিও সেই কাগজে তখন বিখ্যাত রুশ লেখক ম্যাক্সিম গোর্কীর একটি ছোটগল্প বাংলায় প্রথম অনুবাদ করি।

এরপর আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ ঘটে তদানীন্তন বিখ্যাত মাসিক 'যমুনা' পত্রিকার সঙ্গে। স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ পাল ছিলেন এর সম্পাদক। 'যমুনা'র অফিসটি ছিল কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ও সুকিয়া স্ট্রীটের সংযোগস্থলে, দোতলায়। এখানেই আমি নানা সাহিত্যিকের সংস্পর্শে আসি এবং পরিচিত হই। এইখানে একদিন একটা খুব মজার ঘটনা ঘটেছিল।

একদিন দুপুরবেলা আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে বেশ আড্ডা জমিয়েছি। দলের মধ্যে ছিল প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চারু রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং আর কেউ কেউ। নানা ধরনের গাল-গল্পের ভেতর দিয়ে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই ক্ষিধেটা বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। অফিসের দরজাটি বন্ধ করে তার সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত আছি। আলোচনা হচ্ছিল 'যমুনা' প্রকাশে ক্রমশই বেশ দেরী হয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়ে।

আর এই দেরীর একমাত্র কারণ হচ্ছেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে ছিলেন—সেখান থেকে সময়মত তাঁর 'চরিত্রহীনের' কিস্তি এসে পৌঁছুচ্ছে না। শরৎবাবুর প্রতিভা অবশ্য তার পূর্বেই স্বীকৃত হয়ে গেছে। এর আগে ১৩১৪ সালে 'ভারতী'তে শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' পড়ে আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলাম। যদিও প্রথম ছুটি সংখ্যায় লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ সংখ্যায় লেখকের নাম প্রকাশিত হয়েছিল—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম লেখাটি রবীন্দ্রনাথের।

যাই হোক, এই নিয়ে আমরা একটু উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছি—আমাদের কে যেন বলে উঠল, শরৎবাবু নিশ্চয়ই চরিত্রহীন, তাই 'চরিত্রহীন' লেখা পাঠাতে দেরী করছেন। কথাটা অবশ্য খুবই হাল্কাভাবে ঠাট্টাচ্ছলে বলা হয়েছিল—কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ঘরের দরজাটি খুলে একজন প্রবেশ করলেন। সঙ্গে আবার একটা কুকুর। সাধারণ জামা-কাপড় পরা শীর্ণকায়, খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা লোকটি। ঘরে ঢুকতেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কাকে চাই?

তিনি বললেন, ফণীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

তাঁকে বলা হ'ল যে তিনি তো এখন নেই, সন্ধ্যাবেলায় আসবেন, তখন এলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি বললেন, তাহলে আমি একটু অপেক্ষা করে তাঁর সঙ্গে দেখা করেই যাব। অনেক দূরদেশ থেকে আসছি কিনা। একটু থেমে আবার বললেন, আর একটা কথা—শরৎচন্দ্র চরিত্রহীন নন, তিনি ঠিক সময়েই লেখা দেবেন।

হঠাৎ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁকে ওকালতী করতে শুনে প্রেমাঙ্কুর বলে উঠলো, শরৎচন্দ্র ঠিক সময়ে লেখা দেবেন কিনা সে খবর আপনি জানলেন কি করে?

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, আমারই নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ একটা বোমা ফাটলেও আমরা এতটা অবাক হতাম না। সেই সময় শরৎচন্দ্রকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ছাড়া কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না যে, দাড়িসম্বলিত তাঁর চেহারা কি রকম অদ্ভুত ছিল। সুদূরপ্রসারী কল্পনার সাহায্যেও কেউ ভাবতে পারতেন না যে কোন সাহিত্যিকের এরকম চেহারা হতে পারে। কয়েক মুহূর্ত আমাদের মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। সকলেই চুপচাপ, শরৎচন্দ্র একটা চেয়ারে বসে মৃদু মৃদু হাসছেন, আর তার পায়ের কাছে বসে তাঁর প্রিয় কুকুর ভেলু আমাদের এই অস্বস্তিকর অবস্থাটাকে বেশ উপভোগ করছে। তারপর চারুই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল, আপনিই শরৎচন্দ্র—সত্যি কথা বলতে কি—আমরা ভেবেছিলুম কোন—

মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে শরৎচন্দ্র বললেনঃ কোনো দপ্তরী! বলে তিনি হাসতে লাগলেন। আমরাও সে হাসিতে যোগ দিলাম।

এই রকম অদ্ভুত ঘটনাচক্রে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে পরে আরও বলছি।

রিপন কলেজে পড়ার সময় একটি দিনের কথা সহজে ভুলতে পারব না। সেটা হল ১৯১৩ সালের একটি দিন।

খবর বেরুল রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন 'গীতাঞ্জলি' লিখে। একজন ভারতীয় বলে নয় একজন বাঙালীর এই অভূতপূর্ব সম্মান যে আমাদের জাতীয় গৌরব, এ আর কাউকে বলে বোঝাতে হল না। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে সমগ্র বাঙালী জাতির অন্তর ভরে উঠল। খালি মনে হতে লাগল কবে গিয়ে সেই বিরাট মনীষার শ্রীচরণ দর্শন করে আসব। একদিন সে সুযোগ ঘটে গেল।

সঙ্গীও কয়েকজন জুটে গেল। বেশ কয়েকজন মিলে হৈ হৈ করতে করতে আমরা বোলপুরে গেলাম। আমাদের দলে ছিল

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু রায় ও আরও অনেকে। গিয়ে উঠলাম 'গেস্ট হাউসে'।

ভোর সাড়ে চারটার সময়—তখনও আমাদের ভালো করে ঘুম ভাঙেনি। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এসে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বললেন, সুধীরবাবু, যদি কবির কবিতা পাঠ ও প্রার্থনা শুনতে চান তো আমার সঙ্গে চলে আসুন।

আমার চোখে তখন ঘুম জড়িয়ে রয়েছে। বললাম, এত ভোরে? চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, হ্যাঁ—হ্যাঁ। ভারতের ঋষিদের সামগান শুনতে এবং দেখতে চান তো আমার সঙ্গে উঠে আসুন, এ সুযোগ সকলের জীবনে বার বার আসে না।

আমরা সকলে উঠে গেলাম চারুবাবুর সঙ্গে। কবির কুটীরে গিয়ে উঠলাম। গিয়ে দেখি, সত্যিই সেটা একটা স্মরণীয় দৃশ্য। কয়েকটি আশ্রমের ছাত্রকে ডেকে নিয়ে নিজের রচনা পড়ে শোনাচ্ছেন কবি, বাইরে তখনও অন্ধকার, দূর দিগন্তে ঊষার অবগুণ্ঠন-উন্মোচনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মাথার উপরে শুকতারাটি জ্বলজ্বল করছে। ঘর অন্ধকার। মধ্যে একটি সেজবাতির নীচে বসে গুরুদেব তাঁর উদাত্ত সুরেলা কণ্ঠে কবিতা পাঠ করে চলেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এ অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি মনের মধ্যে চিরকাল সঞ্চয় করে রাখার মত।

আমরা সবাই বসলাম সেখানে নিঃশব্দে। বহুক্ষণ পরে গুরুদেব যখন তাঁর পাঠ শেষ করলেন, তখন সোনালি রোদে ঘর ভরে গিয়েছে।

১৯১৫ সালে রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে আমি বি-এ পাশ করি। সে সময় আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বিজ্ঞানাচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। 'পুরাতন কথা'র লেখক বিপিন-বিহারী গুপ্তও আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরকে অবশ্য আমাদের সময়ে কোনো ক্লাসই নিতে দেখিনি, তবে আগের

কথা জানি না। তিনি বেলা আড়াইটে-তিনটের সময় কলেজ লাইব্রেরীতে আসর জমিয়ে বসতেন।

বি-এ পাশ করার পর আমার ঝোঁক হ'ল একটা ছাপাখানা শুরু করার, কিন্তু এজন্যে তো টাকার দরকার। বাবাকে এ কথাটা বলতেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি ছাব্বিশ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটে 'মডার্ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস' নাম দিয়ে একটি ছাপাখানা আরম্ভ করে দিলাম। মাসিক কিস্তিতে হাজার পাঁচেক টাকায় এই প্রেস কেনা হয়েছিল। আর সেই সঙ্গে ল' কলেজে আমার বিকালে আইন পড়াও চলতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল যে ল' কলেজে পড়া আর ছাপাখানা দেখাশোনা করা, দুটো কাজ একসঙ্গে চালানো আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, দুদিকেই অসুবিধে হতে লাগল।

এর মধ্যে বাবা রায়বাহাদুর এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স নামে একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে ভারও আমার ওপরেই এসে পড়ল। ছাপাখানা, দোকান এবং ল' কলেজে আইন পড়া এই তিনটি কাজে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। দোকানে পিতার নামের সঙ্গে 'রায় বাহাদুর' যুক্ত হওয়ার কারণ হলো যে পিতৃদেব এই সময় এই উপাধি লাভ করেন। ১৯১১ সালে যখন পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে এসে কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন সেই উপলক্ষে বাবা এই 'রায়বাহাদুর' উপাধি পান।

আমি তখন বাধ্য হয়ে ছাপাখানা দেখা এবং আইন পড়া দুটোই স্থগিত রেখে একমাত্র দোকানের পরিচালনাতেই মন দিলাম। কারণ আমার ন'দা সুবোধচন্দ্র সরকার সরকারী চাকুরী নেবার দরুন দোকানের সমস্ত ভার আমার ওপর এসে পড়ল। আমাদের দোকানটি তখন ৯০।২এ হ্যারিসন রোড থেকে ৭৫।১।১ হ্যারিসন রোডে (কলেজ স্ট্রীট জংশনে) ওয়াই. এম. সি. এ বিল্ডিং-এ উঠে এসেছে। সেই থেকে সম্পূর্ণ দোকানের ভার আমার ওপরই আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে।

আমরা যখন কলেজের ছাত্র—অর্থাৎ ১৯১০-১৪ সালে সেই সময় ব্রাহ্মধর্ম আমার মনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারপর কলেজ ছাড়বার পরও সে প্রভাবটা শিগ্‌গীর কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তারপর আমার প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ছিল ব্রাহ্ম—যেমন অমল হোম, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

এঁদের সঙ্গে প্রায়ই যেতাম সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে গান শুনতে। খুব ভাল লাগত সে পরিবেশটি। এই সময় একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয় আমার। মেয়েটিকে আমার এত ভালো লেগে গেল যে ঠিক করলাম তাকেই বিয়ে করব। তাতে যদি ধর্মত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতে হয় তাতেও কোনো আপত্তি নেই।

মনের যখন এইরকম অবস্থা তখন বাবা কি রকম করে ব্যাপারটা টের পেলেন। মুখে কিছু বললেন না বটে, কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বল্পভাষী—কিন্তু তলে তলে আমার বিয়ে ঠিক করে বসলেন। বাবার বিরুদ্ধে আমরা কোনকালেই কেউ কোনো কথা বলতে পারিনি—এ ক্ষেত্রে তো একেবারেই অসম্ভব। বাবার ঠিক-করা মেয়েকেই বিবাহ করলাম। প্রথমে খুব মন ক্ষুণ্ণ হলেও পরে কিন্তু বাবার নির্বাচিত মেয়েটিই আমার জীবনে এনে দিয়েছিল সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি।

আমার বিবাহ হয় পাবনায় ১৯১৫ সালে। আমার বয়স তখন তেইশ, আর আমার স্ত্রীর বয়স সাড়ে তের। আমার স্ত্রীর প্রথমে নাম ছিল যোগমায়া। এঁর বাবা অর্থাৎ আমার শ্বশুরমশায় ছিলেন আসামের 'একস্ট্রা অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার' অর্থাৎ সোজা কথায় বাংলাদেশে যাকে বলা হয় ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট।

যোগমায়া নামটি কিন্তু আমার দিদি অর্থাৎ কাদম্বিনী দেবীর কেন জানি না, পছন্দ হল না—তিনি নাম দিলেন সুলেখা এবং এই নামটিই

বরাবর রয়ে গেল। যোগমায়া নামটি ক্রমশ বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়ে গেল।

তখনকার দিনের হিসাবে লেখাপড়া তিনি ভালই জানতেন, তবে অঙ্কটা তিনি সত্যিই ভাল জানতেন—বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেদের নিজেই অঙ্ক শেখাতেন। সত্যিকার সহধর্মিণী বলতে যা বোঝায় সুলেখা ছিলেন আমার তাই। সাড়ে তের বছর বয়সে তিনি আমাদের সংসারে আসেন। সেই থেকে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমার কাছ ছাড়া তিনি কোথাও থাকেননি। পিত্রালয়ে পর্যন্ত অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে কখনও যেতেন না। সকল রকম বিপদ-আপদে তিনি আমায় সাহায্য করতেন এবং পাশে এসে দাঁড়াতেন। আমার প্রতি তাঁর ভালবাসা যে কি গভীর ছিল তার পরিচয় আমি পেয়েছি একাধিকবার। কতবার দেখেছি সাংসারিক বা ব্যবসায়িক কোন কোন বিষয়ে আমার মন যখন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত, তখন সুলেখার সাহচর্য, সান্ত্বনা ও সহানুভূতি আমাকে দিয়েছে নতুন প্রেরণা ও নতুন মনোবল। তাঁর ভালবাসার মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল না, ছিল না প্রগল্‌ভতা— কিন্তু ছিল একটি শান্ত সুন্দর কল্যাণী রূপ যা অপরিসীম স্নেহ ও মমতায় পূর্ণ করে রেখেছিল আমাদের বিবাহিত জীবনের তেতাল্লিশটি বছর।

১৯৫৮ সালে যখন তাঁকে কঠিন ব্যাধিতে আক্রমণ করল, তখন আমি হয়ে গেলাম দিশেহারা। আপ্রাণ চেষ্টা করলাম—যেমন করে হোক, যেভাবে হোক, সুলেখাকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ওঁকে ধরে রাখা গেল না। মহাকালের চিরন্তন আহ্বানে তাঁকে সাড়া দিতেই হলো।

সুলেখার অন্তরটি ছিল অত্যন্ত কোমল। তাঁর কাছে কোন লোক, আত্মীয় অনাত্মীয় যেই হোক, কিছু চাইলে তিনি ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। এমনি ছোটখাটো দান-ধ্যান তাঁর অনেক ছিল। কত লোককে যে টাকাকড়ি দিয়েছিলেন তিন তা আমারও জানা ছিল

না। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য অনেকে আমাকে সে টাকা ফেরৎ দিতে এসেছিল, কিন্তু আমি তাঁর স্মৃতির অবমাননা করিনি। আমি তাদের বলেছিলাম—যদি সত্যিই কারুর ঋণ শোধ করার ইচ্ছা থাকে তবে এই টাকাটা যেন কোন কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেয়।

আমার ন'দা রায়বাহাদুর সুবোধচন্দ্র সরকার ছিলেন হাইকোর্টের স্পেশাল অফিসার, পরে হন ছোট আদালতের জজ। এই থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম সরকারী চাকরীতে ঢোকেন মুন্সেফ হিসাবে। বাবার লেখা আইন পুস্তকগুলি ইনি নতুন করে সম্পাদনা করে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে পুনর্মুদ্রণ করেন নিজের প্রকাশনা সংস্থার মাধ্যমে। তিনি নিজেও কয়েকখানি আইন পুস্তক লিখেছিলেন। সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার একবার মনোমালিন্য হয় এবং ব্যাপারটা প্রায় আদালত পর্যন্ত গড়ায় আর কি! কিন্তু পরে নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা হয়ে গেল। আর এই আপোষটা সম্ভব হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের ও সেই সময়ের বিখ্যাত ব্যারিস্টার শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মধ্যস্থতায়। বেশ কিছুদিন থেকেই ন'দা চক্ষুরোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন—শেষে তিনি ঠিক করলেন যে বিলেতে গিয়ে চোখ অপারেশন করবেন। আমি দেখলাম, এ একটা মস্ত সুযোগ বিদেশ ভ্রমণের। আর এদিকে তখন আমাদের মধ্যে বিরোধের মেঘ কেটে গিয়ে আবার সৌহার্দ্য ফিরে এসেছে। আমিও এই সুযোগটা ছেড়ে না দিয়ে ভিড়ে গেলাম ন'দার সঙ্গে।

চোখ অপারেশন তাঁর সেখানে ভালই হ'ল। তিনি দেশে ফিরে এলেন। তারপর গত বৎসর তিনি লোকান্তর গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় আশী বছর। তিনি সুসাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং জীবনের শেষাদন পর্যন্ত এইসব বিষয়ে

আগ্রহ প্রকাশ করে গেছেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি বেনামীতে একটি গল্প লিখে কুন্তলীন পুরস্কার পান।

১৯১৪-১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই আমার মনে হয় বাংলা পুস্তক ব্যবসায়ে নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়। সেই ধারা এখনও বজায় আছে এবং ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতালাভের পর থেকে আরও স্ফীত হয়েছে।

এর পর ১৯২৯ সালে হ্যারিসন রোড থেকে দোকান প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে অ্যালবার্ট হলের নীচে উঠে আসে। এই ঘরটি কি করে পাই সে সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা দরকার।

অ্যালবার্ট হলের নীচে যে ঘরটি আমরা পেয়েছিলাম তা ছিল একজন প্রচুর বিত্তশালী প্রকাশকের। তাঁদের দোকানটা দেনার জন্য বন্ধক ছিল এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কাছে। কিন্তু রাজশেখর বসু মহাশয়ের জামাতা অমরনাথ পালিতের সাহায্যে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কাছে থেকে আটশো টাকায় প্রথমে ঐ ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র কিনে নিই। কিন্তু ঘরের দখল পেলাম না। কয়েকজন প্রভাব ও বিত্তশালী পুস্তক-ব্যবসায়ীর জন্য অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ ঘরটির দখল আমাদের দিতে রাজী না হওয়ায় আমি তখন সুভাষচন্দ্র বসু ও সুরেশচন্দ্র মজুমদারের শরণাপন্ন হই। সুরেশবাবু ভার নিয়েছিলেন যে, যেমন করে হোক তিনি সুভাষবাবুকে বলে এই ঘরটি আমাদের পাইয়ে দেবেন। সেই সময় সুভাষবাবু অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউটের একজন ট্রাস্টি ছিলেন এবং তাঁর কথার খুব গুরুত্ব ছিল। ট্রাস্টিদের একটি মিটিং-এ ঘরটি আমাদের দেওয়া হবে কিনা এ সম্পর্কে বেশ জোরালো আলোচনা হয়। সেদিন সুভাষবাবু সারাদিনই অনেকগুলি সভার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় তিনি যখন এই সভায় এসে পৌঁছুলেন তখন ট্রাস্টিদের এই মিটিং প্রায় শেষ হয়-হয়। তিনি এসে আমাদের পক্ষে ভোট দিয়ে দোকানঘরটি আমাদের

দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর ভোটটি না পেলে কিন্তু দোকানঘরটি আমাদের পক্ষে পাওয়া খুব মুস্কিল হতো। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল অবদি এই ঘরে থাকার পর কতকগুলি অনিবার্য কারণের জন্য আমরা বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীটের এই বর্তমান ঘরটিতে উঠে আসি। আমরা প্রথমে শুধু আইনের পুস্তকাবলীরই প্রকাশক ছিলাম। তারপর শরৎচন্দ্র, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কিছু বাংলা উপন্যাস প্রকাশ করি। তারপর ১৯৩৯ সাল থেকে পুরোপুরি বাংলা পুস্তক-প্রকাশক হিসাবে পরিচিতি লাভ করি।

বাবার কয়েকটি আইন পুস্তক নিয়েই আমাদের দোকানের পত্তন হয় এবং ক্রমে ক্রমে আইনের পুস্তক বিক্রেতা হিসাবে আমরা প্রসিদ্ধি লাভ করি, কিন্তু আমার বাংলা সাহিত্য প্রীতি এবং মনোবৃত্তির জন্য ক্রমশঃ আইন পুস্তক প্রকাশ কমে আসে এবং আমি পুরোপুরি বাংলা সাহিত্য-পুস্তক প্রকাশের দিকে নজর দিই।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার কয়েক বছরের মধ্যে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, সাহিত্য, মানসী ও মর্ম্মবাণী, যমুনা ইত্যাদি কয়েকটি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকার আসর খুব জমে উঠেছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে তখন শরৎবাবু এসে গেছেন, অনুরূপা দেবী 'সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী' হয়েছেন। আর নিরুপমা দেবী, জলধর সেন, চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি সাহিত্যিক হিসাবেও যেমন খ্যাতিলাভ করেছেন, আর এঁরা বাংলা উপন্যাস জগতের আসরও বেশ জমিয়ে তুলেছেন। কিন্তু এত নাম উল্লেখ করা সত্ত্বেও উপন্যাসের প্রচার আজকালকার মত এত বিস্তৃতি লাভ করেনি।

নামজাদা লেখকদের উপন্যাসই হাজার কপির বেশী ছাপা হতো না। পাঁচশো কপি বই কাটতেই সময় লাগত কয়েক মাস, তারপর অবশিষ্ট সংখ্যা বিক্রি হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগত। কারণ

শিক্ষিতের সংখ্যাও তখন যেমন কম ছিল, তেমনি বই-কিনে-পড়া পাঠকের সংখ্যা ছিল ততোধিক কম। সেইজন্য এক-একজন লেখকের পুস্তকের সংস্করণ হতে বেশ সময় লাগত। তখন কোনো বই-এ দাম তিন, সাড়ে তিন টাকা হলেই খুব বেশী মনে হতো। বিক্রি না হবার ভয়ে প্রকাশকরা বেশী দামের বই প্রকাশ করতে সাহসী হতেন না। আমার মনে আছে যে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন'-এর প্রকাশক ছিলাম আমরাই এবং এইরকম একখানি সুবৃহৎ পুস্তকের দাম তিন টাকা হবে কি সাড়ে তিন টাকা হবে এই নিয়ে শরৎবাবুর সঙ্গে আমাকে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করতে হয়েছিল।

বর্তমানে একখানা উপন্যাসের দাম এসে ঠেকেছে তিরিশ টাকায়। শুধু উপন্যাস কেন, অন্যান্য বিষয়ের বই-এর দামও খুব বেড়েছে। অবশ্য এখন পুস্তক প্রকাশের নানাবিধ খরচ, যেমন ছাপা, বাঁধাই, কাগজ, ব্লক, সর্বোপরি বিজ্ঞাপনের খরচ সব জিনিসেরই দাম আগের থেকে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উপর মুদ্রামূল্য হ্রাসও একটি কারণ। ফলে এখন অনেক বই বেরুচ্ছে যা খুব ভাল এবং চটকদার হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ ইচ্ছুক পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। তবে একটা সুখের বিষয় যে বর্তমানে লাইব্রেরীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে বেশী দামের বইয়ের চাহিদাও বেড়েছে। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আজকাল দেখতে পাই, পুস্তক-প্রকাশক বা সাহিত্যিকদের জীবনযাত্রা উচ্চমানে গিয়ে ঠেকেছে।

আগেই বলেছি যে, পূর্বে যে-কোন পুস্তকের মুদ্রণ-সংখ্যা হাজার কপির বেশী উঠত না, এখন কিন্তু যে-কোন উপন্যাস দুই তিন বা তারও বেশী হাজারে ছাপা হয় এবং বিক্রিও হয়ে যায়। এর থেকে বেশ বোঝা যায় যে বাংলা সাধারণ বইয়ের চাহিদা বেশ বেড়েছে। আর শুধু তাই নয়, গল্প উপন্যাস ছাড়া এত বিভিন্ন ধরনের অজস্র বই বাজারে বেরুচ্ছে যে আমরা দেখে অবাক হই।

যেমন ধরুন সাহিত্য-আলোচনা, ইতিহাস, জীবনী, দর্শন, ভ্রমণ, শিকার-কাহিনী, রম্যরচনা, ছেলেদের বই, নাটক, নাট্যালোচনা, সিনেমা, রঙ্গমঞ্চ, খেলাধূলা সম্বন্ধে বহু বই আছে। এক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই যে কত বই আছে তার ঠিক নেই—তাঁর কাব্য, তাঁর দর্শন, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে অজস্র বই আছে। তেমনি আছে অন্যান্য মনীষীদের প্রতিভা সম্বন্ধে নানা আলোচনা। এসব মৌলিক রচনা ছাড়াও আছে বিরাট অনুবাদ সাহিত্য ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক প্রকাশ। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সাহিত্যিকেরই কিছু না কিছু রচনা বাংলায় অনূদিত হয়েছে। কত বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়ে ছাত্রদের এবং রসিকসমাজের চাহিদা মেটাচ্ছে। দেশের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্রদের কাছে পরীক্ষার সুবিধার জন্য এইসব পুস্তক অপরিহার্য।

এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে কোন্ ধরনের বই বাংলাদেশে বেশী চলে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। তবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে প্রথমে উপন্যাস, জীবন-চরিত, ভ্রমণ কাহিনী, ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকই বেশী চলে। তবে সব দেশেই এটা স্বীকার্য যে প্রকাশক এবং লেখক সব থেকে অধিক অর্থ পান স্কুল ও কলেজ পাঠ্য বই থেকে। বাংলাদেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানি প্রভৃতি সরকারের উদ্যোগে অনেক বাংলা বই প্রকাশও শুরু হয়েছে। সরকারী প্রচেষ্টা ছাড়া বে-সরকারী প্রচেষ্টায় সাহিত্য পুরস্কারের রেওয়াজও বর্তমানকালে চালু হয়েছে।

আমাদের দেশে ১৯১৪-১৬ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার। এখন সম্প্রতি স্কুল ফাইনাল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী ছাত্রদের সংখ্যা দাঁড়িয়ে গেছে প্রায় দেড়লক্ষের উপর। সেই পরিমাণে প্রকাশকরা ছাত্রদের চাহিদা মেটাতে পারছেন না। আমি হিসাব করে দেখেছি, ভালো পুস্তক-প্রকাশক অন্তত

আটচল্লিশ খানা স্কুল বই প্রতি বৎসরে প্রকাশ করেন এবং প্রতি বই পাঁচ হাজার কপি করে ছাপানো হয় বলে ধরলেও প্রকাশক ও গ্রন্থকার যে কি পরিমাণ লাভবান হন তা সহজেই বোঝা যায়।

অবশ্য কিছুটা বই-ছাপার লভ্যাংশ এখন আস্তে আস্তে সরকারের হাতে চলে আসছে। তাঁরা নিজেরাই সস্তায় স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করে প্রকাশকদের লভ্যাংশ কিছুটা নিয়ে নেওয়ায় পুস্তকব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। এর জন্যে দায়ী কারা সেটা বলা মুস্কিল। তবে পাঠ্যসূচী অনুসারে টেক্সট্ বুক কমিটি উঠে যাওয়ায় যে কোনো প্রতিষ্ঠান পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠ্য হিসাবে নির্বাচন করতে পারেন।

সকলেই জানেন ভারত ও রাজ্য সরকারগুলি শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলিকে জাতীয়করণ করতে চেষ্টা করেছেন এবং ভারতীয় সংবিধানে অবৈতনিক শিশুশিক্ষা বাধ্যতামুলকভাবে প্রবর্তনার ধারা সন্নিবিষ্ট আছে। এই ব্যাপারেই বোধহয় তাঁরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন। এতে দেশে ক্ষতি অথবা লাভ হচ্ছে কিনা সেটা অবশ্য বিবেচ্য।

তারপর আর একটা কথা। ভারত সরকারের অদ্ভুত আমদানি-রপ্তানির নিয়ম-কানুনের জন্য বেশ কিছু বই বিদেশ থেকে সস্তায় আসতে শুরু করেছে। মুদ্রাস্ফীতির দরুন এখন হয়ত দাম কিছুটা বেড়েছে। এইসব কারণে আমাদের প্রকাশন-ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে। দেখা গেছে, সব দেশেই স্কুল ও কলেজ বই পুস্তক-ব্যবসায়ের মেরুদণ্ড। আমাদের দেশেও তাই। তবে অবসর সময়ে এইসব পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকেরা ছিটোফোঁটাভাবে বাংলা সাধারণ পুস্তক প্রকাশ করে প্রকৃত সাহিত্যের পোষণ করছেন। এটাও আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে পুস্তক-প্রকাশন ক্ষেত্রে কয়েকজন ব্যবসায়ী কেবল বাংলাসাহিত্যের ব্যবসা করে বেশ শক্তিশালী হয়ে প্রকৃত সাহিত্যেরই পৃষ্ঠপোষকতা করছেন—এটা খুব সুখের কথা।



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যাঁরা কেবল বাংলা সাহিত্য নিয়ে কারবার করেন তাঁদেরও দু' একটা সঙ্কটের কথা উল্লেখ করা দরকার। সাহিত্যিকদের অর্থের চাহিদা মেটাতে গিয়ে অনেক সময় এই সব প্রকাশকদের বেশ বিপন্ন হতে হয়। সাহিত্যিকদের ন্যায্য প্রাপ্য সম্পর্কে বিদেশে ও এদেশে নীতির অনেক প্রভেদ, এবং তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে কার ক্ষতি হচ্ছে সেটা বিবেচনার ভার পাঠকসাধারণের ওপর দেওয়া ভালো। অবশ্য এটা মানতেই হবে যে আমাদের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা ওদেশের জর্জ বার্নার্ড শ' যে টাকা প্রকাশকের কাছে দাবী করতে পারেন অন্য খুব কম লেখকই তা পারেন।

আর একটা কথা এখানে বলা দরকার। সম্প্রতি আমি বিদেশ থেকে যা দেখে এসেছি তা হল এই যে চলচ্চিত্র থেকে সব দেশের লেখকরাই অনেক টাকা পেয়ে থাকেন। এতে বিদেশী প্রকাশকদের কাছে সামান্য কিছু অর্থাগমের একটি নূতন দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। এটা ঠিক, এই সব নতুন গ্রন্থকারদের বই চলচ্চিত্রে রূপায়িত হওয়ার সুযোগ হয়েছে তাঁরা প্রথম অপরিচিত লেখকের গ্রন্থপ্রকাশের ঝুঁকি নিয়েছিলেন বলেই। কিন্তু আমাদের দেশে প্রকাশকরা পুস্তকের চিত্রস্বত্ব থেকে কোনো অংশই পান না। পাশ্চাত্য দেশের প্রকাশকরা বলেন, তাঁদের প্রচেষ্টায় যখন পুস্তকটি সুখ্যাতি অর্জন করল এবং সেইজন্যই চিত্রনির্মাতাদের নজরে পড়ে চলচ্চিত্র রূপ দেওয়া সম্ভব হল, তখন লভ্যাংশের সামান্য কিছু অংশ তাঁরা পাবেন না কেন? জার্মানীতে আমি নিজের চোখে এই ব্যবস্থা দেখে এসেছি। সুতরাং আমাদের দেশেও কোনো লেখকের গল্পের চলচ্চিত্রের স্বত্ব বিক্রয়ের সময় প্রকাশকের সামান্য একটা অংশ অবশ্যই থাকা উচিত।

পুস্তকপ্রকাশনা ক্ষেত্রে নেমে বাংলাদেশের অল্প বিস্তর সব সাহিত্যিকের সঙ্গেই বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছি। তাদের মধ্যে কয়েকজনের সম্বন্ধে আমার কিছু বলা দরকার। প্রথমেই

আরম্ভ করি বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিয়ে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম আলাপ কি করে হয়েছিল সে কথা আগেই বলেছি। এই নিয়ে আমাদের বন্ধুমহলে বেশ কিছুদিন হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছিল।

যাই হোক, এই সময় থেকে শরৎবাবুর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে এল। শেষে এমন এক পর্যায়ে দাঁড়ালো যে প্রতিদিনই তাঁর সঙ্গে গল্প, আড্ডা ও নানারকম আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল 'যমুনা' অফিসে ও আমাদের দোকানে। তিনি কিন্তু কখনও একলা আসতেন না, তাঁর নিত্যসহচর ভেলু কুকুর তাঁর সঙ্গ কোনদিন ছাড়তো না। শরৎবাবুর সঙ্গে আমাদের আন্তরিকতা খুবই অবশ্য বেড়ে গেল, কিন্তু তিনি নিজে এর মধ্যে খুব দোটানায় পড়ে গেলেন 'ভারতবর্ষ' ও 'যমুনা' নিয়ে।

সেই সময় কেবলমাত্র 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হয়েছে। 'ভারতবর্ষে'র প্রধান কর্ণধার তখন শরৎবাবুর বিশেষ বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। তিনি ক্রমে ক্রমে শরৎবাবুকে 'ভারতবর্ষে'র দিকে টেনে নিয়ে গেলেন। 'ভারতবর্ষে'র অর্থবলের কাছে 'যমুনা'র অর্থবল ভেসে গেল। আমার যতদূর মনে পড়ে 'ভারতবর্ষে' শরৎবাবুর প্রথম যে উপন্যাসখানি প্রকাশিত হলো তার নাম হলো 'বিরাজ বৌ'।

এই গোলযোগের মধ্যে আমিও অন্যভাবে শরৎবাবুর সঙ্গে পুস্তকপ্রকাশনের ব্যাপারে জড়িত হলাম। সাহিত্যিক বন্ধুরা আমাকে বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে এই সময় শরৎবাবুর যে সমস্ত লেখা বিভিন্ন কাগজে বেরিয়েছে তা আমাকে পুস্তকাকারে একত্রিত করে প্রকাশ করতে হবে। এই ব্যাপারে আমার প্রথমেই মত দেওয়াটা একটু মুস্কিল হয়ে পড়ল। কয়েকটা বাধার সম্মুখীন হতে হল আমাকে।

প্রথমত, আমরা তো শুধুই তখন আইনসংক্রান্ত পুস্তকের প্রকাশক,

বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে তখনো সম্পূর্ণ অপরিচিত। প্রধান চিন্তা হলো যে বাংলা বই ছেপে ক্ষতিগ্রস্ত হবো কিনা। তখনকার দিনে শরৎবাবুর পুস্তকপ্রকাশেও যথেষ্ট ঝুঁকি ছিল, কারণ সাহিত্য-জগতে তিনি তখন নবাগত। তার লেখা আমাদের খুব ভাল লাগলেও সাধারণ পাঠকের কাছে কিরকম চাহিদা হবে তা আমরা মোটেই ধারণা করতে পারিনি। তা না হলে সামান্য কয়েক হাজার টাকা দিলে পরে তাঁর সেই সময় লিখিত সমস্ত বইয়ের 'কপিরাইট' পাওয়া যেতো। অবশ্য এই ধরণের দুষ্ট পরিকল্পনাই বলুন আর ব্যবসাদারী বুদ্ধিই বলুন, আমার মাথায় কোনদিন আসেনি, কারণ আমার মনে আছে, পরবর্তী জীবনে কয়েকটি পুস্তকের 'কপিরাইট' কিনে পরে আবার সেই 'কপিরাইট' গ্রন্থকারদের ফিরিয়ে দিয়েছিলুম। যেমন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' এবং চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যমুনা পুলিনে ভিখারিণী' প্রভৃতি কয়েকটি বই।

দ্বিতীয় কারণ হলো রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন। শরৎচন্দ্র জানালেন যে তিনি খুব শিগগীর রেঙ্গুনে ফিরে যাবেন। তাঁর কাছে বই ছাপবার অনুমতি নিতে হলে তা রেঙ্গুন যাত্রার আগেই নিতে হবে।

সেই সময় আমাদের কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে এক বিবাহের অনুষ্ঠান ছিল। এই উপলক্ষে বিবাহের পরে স্টার থিয়েটারে একটি অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। এই অভিনয় দেখার জন্যে আমি শরৎবাবুকে আমন্ত্রণ করি। শরৎবাবু সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং অভিনয় শেষে রাত দুটোর পর আমাদের শিবনারায়ণ দাস লেনস্থ বাড়ীতেই বাকী রাতটুকু কাটালেন।

পরদিন ভোরবেলায় শরৎচন্দ্রের নিদ্রা তখন সবেমাত্র ভেঙেছে এমন সময় 'যমুনা' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল আমাদের বাড়ীতে এলেন। তারপর অনেক আলাপ-আলোচনার পর শরৎচন্দ্রের ছয়খানি পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ভার আমরা পেলাম।

এই বইগুলি হলো: চন্দ্রনাথ, নারীর মূল্য, পরিণীতা, নিষ্কৃতি, বৈকুণ্ঠের উইল ও চরিত্রহীন। ফণীন্দ্রনাথ পাল শরৎবাবুর বইগুলি যাতে আমরা পাই সেজন্য যথেষ্ট প্রয়াস করেন। যতদূর মনে পড়ে মাত্র ছশো টাকায় (তাও দুই-তিন খেপে) অগ্রিম দিয়ে এই চুক্তি এইখানেই সম্পন্ন হয়। চুক্তিতে লেখা ছিল প্রত্যেক বইয়ের প্রথম সংস্করণ এক হাজার কপি পর্যন্ত আমরা ছাপতে পারবো। তারপর যখন এ সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন এর পুনর্মুদ্রণ গ্রন্থকারের ইচ্ছাধীন। তাছাড়া রয়ালটির দিক থেকেও তাঁর যা প্রাপ্য ছিল, তাও তাঁকে দিয়ে দেওয়া হয় বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

এর ফলে হলো কি, অন্য একজন প্রতিপত্তিশালী প্রকাশক আমাদের এ-সৌভাগ্য সহ্য করতে পারলেন না। কারণ, শরৎবাবুর বইগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জনপ্রিয়তা ও পুস্তকগুলির চাহিদা হু-হু করে বেড়ে গেল। তখন এই প্রকাশকমশাই শরৎবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করে ফেললেন অনেকক্ষেত্রে আমাদের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার আগেই, এবং ভবিষ্যতে যাতে তাঁর গ্রন্থাবলীর একচ্ছত্র প্রকাশক হতে পারেন, সেজন্য আমাদের কাছ থেকে প্রকাশিত বইগুলি ক্ষেপে ক্ষেপে বহু কপি কিনে নিলেন।

শরৎবাবুর সঙ্গে আমাদের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাতে তাঁর গ্রন্থাবলী আমাদের প্রকাশন-সংস্থা থেকে প্রকাশিত হবে এইরূপ একটি বিশ্বাস আমাদের ছিল এবং তিনিও অন্যরকম কিছু ভাবেননি। শরৎ-বাবুর প্রকাশন-ব্যবসার আইনকানুন সম্বন্ধে বিশেষ জানা ছিল না সে-সময়। ইচ্ছা করলে আমরা কৌশলে এমনভাবে চুক্তি করে নিতে পারতাম যাতে বইগুলির প্রকাশন-স্বত্ব চিরকালের জন্য আমাদেরই থাকে। কিন্তু আমাদের সুদীর্ঘ প্রকাশন-ব্যবসায়ে কোনদিন কারু কাছ থেকে অন্যায়ভাবে সুযোগ-সুবিধা নেবার চেষ্টা করিনি, সেজন্য সেদিনও কোনরকম নীতিবিগর্হিত পন্থা অবলম্বন করতে পারি নি।

এই সমস্ত বই-এর প্রথম প্রকাশন ব্যাপারে শরৎবাবুর সঙ্গে আমার

সম্বন্ধ একটু ক্ষীণ হলেও সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়নি। তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি 'বসুমতী'-তে 'জাগরণ' নামে একটা উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। আমি তখন সেই বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি রাজী হয়ে যান। আমিও সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে বইটির প্রকাশন-স্বত্ব ক্রয় করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ উপন্যাসটি তিনি শেষ করতে না পারায় টাকাটা আমায় পরে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এই সময় আর একটি ঘটনার কথা বলি। তখন 'বঙ্গবাণী'তে শরৎবাবুর 'পথের দাবী' ধারাবাহিকভাবে ছাপা শুরু হয়েছে। 'বঙ্গবাণী' বিখ্যাত শিক্ষাবিদ হাইকোর্টের বিচারপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরিবার হ'তে প্রকাশিত হ'ত। 'পথের দাবী'র প্রকাশন-স্বত্ব আমি গ্রহণ করব এই সর্তে আমি তাঁকে এক হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে আসি। শরৎচন্দ্র সানন্দে এই অর্থ গ্রহণ করলেন এবং পুস্তকাকারে প্রকাশ করার স্বত্বটি আমাকেই দিতে রাজী হলেন। কিন্তু 'বঙ্গবাণী'তে অনেকখানি প্রকাশিত হবার পর দেখা গেল যে, বইখানির কোনো কোনো স্থানে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে কঠোর উক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে (এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য দ্রষ্টব্য)। আমরা তখন বৃটিশ গভর্নমেন্টের অধীনস্থ প্রজা। এইসব কঠোর উক্তি রাজদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কখনই তা সহ্য করবেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, তাঁরা সে বই-এর প্রচার বন্ধ করবেনই উপরন্তু প্রকাশকও কারারুদ্ধ হবেন। আমার জেলে যাবার ভীতি থাকাতে শরৎবাবুকে আমি অনুরোধ করেছিলাম কয়েকটি অংশ সামান্য অদলবদল করে দিতে। শরৎবাবু আমার এ অনুরোধে রাজী হলেন না। তখন বাধ্য হয়ে 'পথের দাবী' প্রকাশ করার ইচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমি তাঁকে বললাম, তিনি যেন এর প্রকাশন-স্বত্ব অন্য কাউকে দিয়ে দেন। এইভাবে 'পথের দাবী' হস্তান্তরিত হলো—শরৎবাবু অবশ্য পরে টাকা আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

তবে শেষ পর্যন্ত আমার ধারণাই ঠিক হলো। পুস্তকাকারে 'পথের দাবী' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বইখানি বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে দিলেন এবং সমস্ত মুদ্রিত কপিগুলি হস্তগত করলেন। প্রকাশকদের অবশ্য শ্রীঘর দর্শন করতে হয়নি—হয়ত তাঁরা সম্মানিত ও বিত্তশালী ছিলেন বলে। আমরা শুনেছি যে, নিষিদ্ধ 'পথের দাবী' বই গোপনে গোপনে বৃটিশ সরকারের চক্ষুর অন্তরালে সতের-আঠার টাকা করে এক-এক কপি বিক্রী হয়েছে। স্বাধীনতার পর অবশ্য এ-নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং আমরাই পরে 'পথের দাবী'র আট-ন'টি সংস্করণ করেছি।

'চরিত্রহীন' প্রকাশ সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে—সে-বিষয়ে এখানে কিছু বলা দরকার মনে করি। ১৩২০ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে চৈত্র ও ১২৩১ বঙ্গাব্দে যমুনায় আংশিকভাবে 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হয়। পরে সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে ১১ই নভেম্বর ১৯১৭ (কার্তিক ১৩২৪ বঙ্গাব্দ) আমরা প্রকাশ করি। যে পর্যন্ত 'যমুনা'তে 'চরিত্র-হীন' প্রকাশিত হয়েছিল, সে পর্যন্ত মুদ্রণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়নি। তারপর শেষটুকু আদায় করতে আমার খুব বেগ পেতে হয়েছিল। সেই সময় শরৎবাবু থাকতেন হাওড়ায়। প্রায় প্রতি রাববার 'চরিত্র-হীনে'র কপি আদায় করতে আমায় যেতে হতো। প্রায়ই আমার সঙ্গে থাকতেন আমার সাহিত্যিক বন্ধু প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

এই সময় একদিন একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল।

সেদিন আমি একলাই গেছি হাওড়ায় শরৎবাবুর কাছ থেকে 'কপি' আনতে। আমাকে দেখে শরৎবাবুর প্রিয় কুকুর ভেলু এমন তেড়ে এল যে, আমি প্রাণ ভয়ে চেয়ারটাকে তক্তাপোষের উপর তুলে হাত-পা গুটিয়ে চেয়ারের উপর বসে আছি। এদিকে চৌকির নীচে ভেলু প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করে চলেছে। খালি মনে হচ্ছে—এই বুঝি কামড়ালো। ভেলু যে পরিমাণ চিৎকার করছে, আমি তার

থেকেও গলাটা আরও একটু চড়িয়ে শরৎবাবুকে ডেকে চলেছি। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ভেলুকে নিরস্ত করে আমায় আশ্বস্ত করলেন।

লেখা সম্বন্ধে যাঁরাই শরৎবাবুর নিকটস্থ হয়েছেন, তাঁরাই জানেন, তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করা কিরকম দুষ্কর ছিল। শরৎবাবুর তাড়াতাড়ি লেখার অভ্যাস ছিল না, বেশ সময় নিয়েই তিনি লিখতেন। আমরা কোন কোন রবিবার মাত্র একটি শ্লিপ নিয়ে চলে এসেছি। এইভাবে প্রায় দু' বছর ধরে 'চরিত্রহীনে'র লেখা শেষ হলে বই প্রকাশিত হয়। এই সম্বন্ধে আর একটা কথাও এখানে লেখা দরকার মনে করি। 'চরিত্রহীন' ছাপা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় বই-এর কী দাম হবে তাই নিয়ে শরৎবাবুর সঙ্গে প্রায়ই আমার তর্কাতর্কি হতো। তর্কটা এমন কিছুই নয়—বই-এর দাম তিন টাকা হবে, না সাড়ে তিন টাকা হবে! শেষ পর্যন্ত তিন টাকাই ধার্য হলো। আজকের দিনে অবশ্য বাংলা বইএর দাম তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এখন তো বাংলা উপন্যাসের দাম বারো টাকা থেকে ওঠানামা করছে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত। কিন্তু আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সামান্য আট আনা বাড়ানো-কমানো নিয়ে কী যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল, তা এখনকার পাঠক-পাঠিকা ও প্রকাশকদের বোঝা সম্ভবপর নয়।

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত 'চরিত্রহীনে'র পঞ্চম সংস্করণে শরৎচন্দ্র নিজে লিখেছিলেন ঃ

> "চরিত্রহীনের গোড়ার অর্ধেকটা লিখেছিলাম অল্প-বয়সে। তারপরে ওটা ছিল পড়ে। শেষ করার কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয়নি। প্রয়োজন হ'লো বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্যরচনার আতিশয্য ঢুকেচে ওর নানা স্থানে, নানা আকারে। অথচ, সংস্কারের সময় ছিল না—ঐভাবেই

ওটা রয়ে গেল। বর্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্তন না করে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম।”

‘চরিত্রহীনে’র প্রথম পাণ্ডুলিপি সবটাই আগুনে পুড়ে যায়। রেঙ্গুন থেকে ২৮শে মার্চ ১৯১২ তারিখে শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখেন,

> “আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং চরিত্রহীন উপন্যাসের manuscript…। আবার শুরু করিব। এখন উৎসাহ পাই না। ‘চরিত্রহীন’ ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল—সবই গেল।”

‘চরিত্রহীন’ গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে শরৎচন্দ্র উপন্যাসটি নতুন করে লিখেছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। ‘যমুনা’য় যখন ‘চরিত্রহীন’ প্রকাশ শুরু হয়, তখন শরৎচন্দ্র ‘যমুনা’র সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। ধারাবাহিকভাবে আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আমি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি না পেয়ে মুদ্রণ শুরু করায় অসুবিধায় পড়ি। কপির অভাবে ছাপা প্রায়ই স্থগিত রাখতে হতো। যতদূর মনে পড়ে, তখন ‘চরিত্রহীন’ ছাপা হয়েছিল কুন্তলীন প্রেসে। আমি শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখলে তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে উত্তরে জানান ঃ

> “কাল রাত্রে তোমার পত্র পাইলাম। বিলম্ব যে হইতেছে এবং তাহাতে যে ক্ষতি হইতেছে সে কি জানি না? তার প্রায় অধিকাংশই নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যদি দু’-এক মাস দেরী হয় বরং সে ভালো, কিন্তু পাছে এমন করিয়া শুরু করিয়া খারাপ হইয়া যায়, সেই আমার ভয়…”

১৩২৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পর ‘চরিত্রহীনের’ যে কত চাহিদা, তা প্রথমদিনই প্রকাশ পায়। প্রথম দিনই সাড়ে চারশ’ কপি বই বিক্রি হয়ে যায়—এ-কথা স্বর্গত সুসাহিত্যক হেমেন্দ্রকুমার

অন্যত্র লিখেছিলেন। হেমেন্দ্রবাবু আরও লিখেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মৃত্যুর পূর্বে 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক হওয়ার সময় শরৎচন্দ্রকে 'ভারতবর্ষে'র নিয়মিত লেখকরূপে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য দ্বিজেন্দ্রলালকে 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি পড়তে দেন। অশ্লীলতার জন্য তিনি 'ভারতবর্ষে' 'চরিত্র-হীন' প্রকাশ করতে রাজী হলেন না। 'চরিত্রহীন' বাতিল হয়ে ফিরে আসে এবং পরে 'যমুনা'য় বেরুতে আরম্ভ করে।

শরৎচন্দ্রের যুগে অনেক নীতিবাগীশের দল তাঁর লেখাকে অশ্লীল বলে অভিহিত করেছিলেন এবং এ-লেখা সকলকে পড়তে নিষেধ করতেন। অথচ তুলনা করলে বোঝা যাবে এই অশ্লীলতা বাংলা-সাহিত্যে আজকাল কোথায় গিয়ে ঠেকেছে!

শরৎচন্দ্রের লেখা পাণ্ডুলিপি দেখলে মনে হতো যে, লেখা খুব কষ্টকল্পিত, সহজ ও সরল নয়। কারণ, যদিও হাতের লেখা খুব সুস্পষ্ট এবং সুন্দর ছিল, তবু লেখায় ভীষণ কাটাকুটি এবং অদল-বদল থাকতো। কিন্তু পাঠোদ্ধার করা যেতো অনায়াসেই। শরৎচন্দ্র খুব শৌখিন লেখক ছিলেন বলে কাগজ ও কলম সবসময় প্রথম শ্রেণীর ব্যবহার করতেন।

ফণীবাবু ১০ই মে ১৯১৩ সালে শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

> 'চরিত্রহীন' যাতে 'যমুনা'য় বার হয়, তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাই হবে। নিশ্চিন্ত হোন। তবে শুনিতেছি ওটাতে মেসের ঝি থাকাতে রুচি নিয়ে হয়ত একটু খিটিমিটি বাধিবে। তা বাধুক। লোকে যতই কেন নিন্দা করুক না, যারা যত বেশী নিন্দা করিবে, তারা তত বেশী পড়িবে। ওটা ভাল হোক, মন্দ হোক, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে। যারা বোঝে না, যারা আর্ট-এর ধার ধারে না, তারা হয়ত

> নিন্দা করবে। কিন্তু নিন্দা করলেও কাজ হবে। তবে ওটা psychology এবং analysis সম্বন্ধে যে খুব ভাল, তাতে সন্দেহই নেই। এবং ওটা সম্পূর্ণ Scientific Ethical Novel! এখন টের পাওয়া যাচ্ছে না।"

শরৎচন্দ্র একখানি চিঠিতে প্রমথনাথকে লেখেন যে সুরেন্দ্রমামা ও জনৈক প্রকাশক এ-বইটি immoral বলেছেন—এটি নাকি কোনো পত্রিকাই প্রকাশ করতে পারে না।

শরৎচন্দ্র এক জায়গায় (শরৎ-সাহিত্য-সম্ভার ১১শ খণ্ড) লিখেছেন ঃ

> এটা চরিত্রহীনের লেখা চরিত্রহীন—তোমাদের সুরুচির দলের মঞ্চে গিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়বে—তাছাড়া অত্যন্ত অশোভন দেখাবে।

হায়! মেসের ঝি সাবিত্রী! আজকালকার দিনে তোমার স্থান অনেক উচ্চঘরের নারীরাই নিয়েছে। আমাদের দোকান থেকে চরিত্রহীন প্রকাশের পর থেকে আমরা অশ্লীল প্রকাশক বলে খ্যাতি-লাভ করলাম। আরও কয়েকটি অশ্লীল বই সেই সময়ে আমাদের দোকান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন পঙ্ক-তিলক, প্রাচীর ও প্রান্তর, বেদে, শুভা প্রভৃতি। সেই সময় এই সকল বই সাধারণ কলেজ ও স্কুল পাঠাগারে রাখা হতো না। আর আজকালকার দিনে?

আমরা শরৎবাবুর প্রথম যে ছয়খানি বই প্রকাশ করেছিলাম তার শেষ বই হলো 'নারীর মূল্য'। এই বইখানি প্রকাশে অসম্ভব দেরী হয়েছিলো। শেষে শরৎবাবু নিজেই এই দেরীর জন্য কৈফিয়ৎ দিয়ে আমার নাম দিয়ে একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় আমাদের প্রকাশকগণ এমন চমৎকার ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন যে তাঁরা ধরতেই পারলেন না যে ভূমিকাটি শরৎবাবুর নিজের লেখা—আমার নাম দিয়ে ছাপা হয়েছে মাত্র। আমার কলম দিয়ে এই রকম লেখা

বেরোতেই পারে না। ফলে পরবর্তী একাধিক সংস্করণে এই ভূমিকাটি প্রকাশকরা বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

ভূমিকাটি ছিল এই—পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হল :

> "১৩২০ সালের 'যমুনা' মাসিক পত্রে 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকরূপে যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমরা এগুলি গ্রন্থাকারে ছাপিবার অনুমতি লাভ করি।
>
> কি মনে করিয়া যে শরৎবাবু তখন আত্মগোপন করিয়া শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে তিনিই জানেন, তবে তাঁহার ইচ্ছা ছিল এমনি আরও কয়েকটি 'মূল্য' লিখিয়া 'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়া পরে যখন গ্রন্থ ছাপা হইবে, তখন তাহা নিজের নামেই বাহির করিবেন। তারপরে এই দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গেল, না লিখিলেন তিনি আর কোনো মূল্য, না হইতে পাইল 'দ্বাদশ মূল্য' ছাপা। আমরা গিয়া বলি, মশায়, আপনার দ্বাদশ মূল্য আপনারই থাক, পারেন ত' আগামী জন্মে লিখবেন, কিন্তু যে 'মূল্য' আপাততঃ হাতে পাইয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার করি। তিনি বলেন, না হে থাক, এ আর বই করিয়া কাজ নাই। কিন্তু কারণ কিছুই বলেন না। এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল, অথচ তাঁহার মতের পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাও নয়। আমাদের শুধু মনে হয়, তখনকার কালে নারীরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে কথা কহিতে শিখে নাই বলিয়াই এ কাজ তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন কাগজে কাগজে ইঁহাদের দাবী-দাওয়ার প্রাবল্য ও পরাক্রান্ত নিবন্ধাদি দর্শন করিয়া এই বৃদ্ধ গ্রন্থকার ভয় পাইয়া গেছেন। তবে এ কেবল আমাদের অনুমান, সত্যি নাও হইতে পারে। কিন্তু এ

কথা ঠিক যে, এ বই ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশ করিয়া ভাল করিয়াছি, কি মন্দ করিয়াছি, তাহা পাঠক বলিতে পারেন। আমাদের ত' মনে হয় মন্দ করি নাই। কিন্তু ইহার যত কিছু দায়িত্ব সে আমাদেরই।"

'নারীর মূল্য' পুস্তকাকারে ১৩৩০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয় এবং লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্রের নিজের নামই থাকে। পূর্বে 'যমুনা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় তাঁর ভগিনী অনিলা দেবীর নাম ছিল এই রচনাগুলির লেখিকা হিসাবে। 'যমুনা'য় 'নারীর মূল্য' প্রকাশিত হয় বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায়।

আমাদের প্রকাশিত ছয়খানি বই-এর যখন যেটির প্রথম সংস্করণ ফুরোতে লাগল, তখনই অন্য প্রকাশক সে বই-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর সব বই আমাদের প্রকাশনার আওতার বাইরে চলে যাওয়ায় তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগটাও ক্ষীণ হয়ে উঠল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা আবার ফিরে এল তাঁর মৃত্যুর সময়।

আমি তখন দক্ষিণ কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের কাছে বাড়ী করে বাস করতে শুরু করেছি। শরৎবাবুর বাড়ীও আমার বাড়ীর কাছেই —প্রায় আধ মাইলের মধ্যে। তিনি বাড়ী তৈরী করেছিলেন অশ্বিনী দত্ত রোডে। শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দুদিন আমার বাড়ীতে এসেছিলেন আমাকে শরৎবাবুর কাছে নিয়ে যাবার জন্য। এই দু'দিনই আমি বাড়ীতে না থাকায় তিনি ফিরে যান। তৃতীয় দিন আমাকে আমার বাড়ীতে এসে পাকড়াও করেন রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টার সময়। ব্যাপারটা কি জিজ্ঞেস করায় তিনি তখন কিছু বললেন না, শুধু বললেনঃ চল না, তোমাকে একবার ডেকেছে।

দীর্ঘদিন পরে দেখা। তাঁর চেহারাটি দেখা মাত্রই আঁতকে উঠলাম। বললাম : আপনার চেহারাটা তো ভাল দেখাচ্ছে না—কি চেহারা হয়েছে আপনার!

এমন সময় পিছন দিক থেকে আমার পিঠের উপর একটি বেশ ভারী কিল পড়ল। চমকে ফিরে দেখি সেটি শরৎবাবুর মাতুলের ইঙ্গিত। অর্থাৎ আমি যেন ওঁর সামনে ওঁর শরীরের বিষয় কিছু না বলি, তাহলে উনি বেশী মাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়বেন।

ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম যে তাঁর চেহারায় আগের মত সে দীপ্তি বা জ্যোতি নেই—কিরকম যেন বিবর্ণ, ম্লান দেখাচ্ছে। বেশ মনে হয় মৃত্যুর ছায়া যেন তাঁকে ঘিরে রয়েছে। ম্লান হেসে তিনি আমাকে মামুলি ছ'এক কথার পর প্রস্তাব করলেন হাজারখানেক টাকা তাঁকে দিতে হবে। কারণ তিনি জানালেন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় কোন এক নার্সিং হোমে তাঁর অপারেশনের ব্যবস্থা করেছেন এবং অস্ত্রোপচার করবেন বিখ্যাত সার্জন ডাঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই টাকাটি তাঁর বিশেষ প্রয়োজন এই চিকিৎসার জন্য। শরৎবাবু নিজে আমায় বললেন যে সুস্থ হয়ে ফিরে এসে একখানি উপন্যাস লিখে তিনি আমায় এ টাকা শোধ করে দেবেন।

তাঁর এ অবস্থায় আমি আর কোনো রকম চিন্তা না করে ছ'এক-দিনের মধ্যে তাঁকে এ টাকাটা হাতে দিয়ে এলাম। এই টাকা দেওয়ার সময় নরেন্দ্র দেব আমার সঙ্গে ছিলেন। এর কয়েকদিন পরে তাঁকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দিন কুড়ি পরে তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার হয়। এই অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁর রোগ নিরাময় হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল এবং একদিন তিনি এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অমৃতলোকের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ তাঁর বাড়ীতে আনা হলে আমরা সকলে দেখতে গেলাম এবং কেওড়াতলার শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় যে

শোকযাত্রা হয়, আমরা সে শবানুগমনে যোগদান করে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। এই শোকযাত্রায় কিন্তু শরৎবাবুর মত সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা জানানোর পক্ষে আশানুরূপ লোক হয়নি ব'লে আমার মনে হয়।

তাঁর মৃত্যুর পরই যেন সারা দেশ সচেতন হয়ে উঠল যে কতবড় সাহিত্যিককে তারা হারিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই যে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শেষ হল তা নয়, বরং তাঁর সাহিত্য প্রচারের ব্যাপারে এক নতুন ভূমিকা গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। এই হাজার টাকার বিনিময়ে বেশ কিছুদিন পরে শরৎবাবুর ছেলেবেলার গল্পগুলি ছাপাবার ব্যবস্থা করি। ছোটদের জন্য তিনি যে কতকগুলি গল্প লিখেছিলেন এই পুস্তকটি সেই গল্পগুলিরই সংগ্রহ। এই ব্যাপারে নরেন্দ্র দেব আমায় সবসময় সহায়তা করেছিলেন। আমি আগেই বলেছি যে তাঁর 'পথের দাবী' প্রকাশ করার কথা ছিল প্রথমে আমাদেরই, কিন্তু তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের কোপে পড়ার ভয়ে আমরা তা প্রকাশ করি নি। 'পথের দাবী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়—। দীর্ঘদিন পরে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের রোষমুক্তি হবার পর আমরাই তা পুনরায় প্রকাশ করি এবং বর্তমানে কয়েকটি সংস্করণও হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের আধুনিক কালের তেরো খণ্ডে সম্পূর্ণ শোভন সংস্করণ গ্রন্থাবলী আমরাই প্রচার করে আসছি।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই যেন তাঁর গ্রন্থের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁর জীবিতকালে পুস্তকের যে আয় তিনি দেখে গেছেন মৃত্যুর পরে তা এত স্ফীত হবে এ তিনি কল্পনাও করেননি। শুনেছি, তাঁর একটি গল্পের হিন্দি চিত্রস্বত্বের জন্য কিছুদিন আগে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর জীবিতকালে এই চিত্রস্বত্ব চার-পাঁচশো টাকায় পাওয়া যেত।

সাহিত্যসেবী ও প্রকাশক হিসাবে সুদীর্ঘকাল নিষ্ঠাসহকারে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার দরুন অন্য যেসব বিখ্যাত মনীষী ও সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তাঁদের মধ্যে রাজশেখর বসু (পরশুরাম) ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি।

রাজশেখরবাবুর সমস্ত বই প্রকাশ করার দরুন তাঁর অতি নিকট-সান্নিধ্যে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। সেইজন্যে তাঁর সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে পারবো আশা করি।

১৩৩২ সালে রাজশেখরবাবু ও তাঁর ভাইদের গৃহে পার্শীবাগানের 'উৎকেন্দ্র' নামক আড্ডায় মধ্যে মধ্যে যাতায়াত আরম্ভ করেছি। স্বর্গত ঐতিহাসিক বন্ধুবর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে রাজশেখরবাবুর কাছে প্রথম নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। 'উৎকেন্দ্রে'র অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে পরিচয়ও তাঁর মাধ্যমেই হয়। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন সেই সময় 'উৎকেন্দ্রে'র একজন প্রধান কর্ণধার। তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের বহু ছবি এঁকে দিয়েছিলেন।

সকলেই জানেন যে, রাজশেখরবাবুর ছদ্মনাম ছিল পরশুরাম এবং তিনি এই নামেই সমস্ত গল্পের বইগুলি লিখেছিলেন। অবশ্য অন্যান্য গ্রন্থগুলি যেমন—রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত, চলন্তিকা, লঘুগুরু, বিচিন্তা, চলচ্চিন্তা প্রভৃতি রাজশেখর বসু নামেই প্রকাশিত হয়। যে সময় আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, সেই সময় তাঁর প্রথম বই বেরিয়েছে 'গড্ডলিকা'। কতকগুলি মনোরম রসসমৃদ্ধ গল্পের সমষ্টি এই 'গড্ডলিকা'। এ-হেন বইও একজন ভালো প্রকাশকের অভাবে আশাপ্রদ বিক্রি হয়নি। সেই কারণে তিনি একজন ভালো প্রকাশক খুঁজছিলেন এবং সেই সূত্রেই বন্ধুবর ব্রজেন্দ্রনাথ আমাকে নিয়ে গিয়ে রাজশেখরবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। এবং ক্রমশঃ আমিই তাঁর সমস্ত বই পরে প্রকাশ করি।

পরশুরাম ছদ্মনাম গ্রহণের একটি সুন্দর গল্প আছে। ‘গড্ডলিকা’র প্রথম গল্পটি লেখার পর মুদ্রণের পূর্বে তিনি একটি ছদ্মনাম খুঁজছিলেন, কিন্তু ঠিক নিজের পছন্দমত কোনো নাম তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এই সময় পার্ক ষ্ট্রীটের বিখ্যাত স্বর্ণকার পরশুরাম একদিন তাঁর বাড়ীতে এসে হাজির। হঠাৎ এই নামটাই তাঁর মনে লেগে গেল এবং ‘পরশুরাম’ ছদ্মনামটিই তিনি গ্রহণ করলেন।

তাঁর প্রথম পুস্তক ‘গড্ডলিকা’র প্রকাশক ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সংস্করণের অবশিষ্ট কপিগুলির বিক্রয়ের ব্যবস্থা থেকেই তাঁর সব পুস্তক বিক্রয়ের ভার আমার হাতে এসে গেল এবং আজ পর্যন্ত তা আমাদের প্রতিষ্ঠানের হাতেই আছে।

রাজশেখরবাবুর পাণ্ডুলিপি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে তা কত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল। এই ধরনের পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল পাণ্ডুলিপির প্রকাশকদের ও কম্পোজিটারদের কাছে শুধু লোভনীয়ই নয়, তা অমূল্য। আমরা রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা দেখেছি—কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে শরৎচন্দ্র, হেমেন্দ্রকুমার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্রের লেখায় অবশ্য মাঝে মাঝে কাটাকুটি থাকলেও, তাঁর লেখা ছিল ছোট ধাঁচের এবং পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। পড়তে কোনো কষ্ট হতো না।

এইদিক দিয়ে রাজশেখরবাবুর পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রেসে প্রকাশককে কখনো কোনো বিপদে পড়তে বা কোনো অসুবিধার জন্য প্রকাশককে আর গ্রন্থকারের শরণাপন্ন হতে হোত না। তাঁর একখানা বই-এর সমস্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে কাটছাঁট, পরিবর্তন বা পরিবর্জন একেবারেই দেখা যেতো না। এইরূপ কয়েকটি অপরূপ পাণ্ডুলিপি আমি সযত্নে সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছি। পাণ্ডুলিপিতে যদি কোনো কথা কেটে অন্য কথা বসাতে হোত তা হ'লে ছোট টুকরা কাগজে সেই কথাটি লিখে সেই স্থানে বসিয়ে দিতেন। প্রত্যেক গল্প বা পাণ্ডুলিপির



রাজশেখর বসু

যে, প্রথমে তাঁদের কাছে পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের উপযুক্ত ক'রে সমস্ত শব্দসংখ্যা তিনি সেই সঙ্গে লেখার শেষে লিখে দিতেন। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক পাণ্ডুলিপিতে তিনি লিখে দিতেন প্রত্যেক লাইনের মাপ, প্রত্যেক পাতার লাইন-সংখ্যা, প্রত্যেক লাইনের মধ্যে ফাঁকের মাপ—ইত্যাদি গুনে গেঁথে রাজশেখরবাবু এমনভাবে নিজের কল্পিত হিসাব করে দিতেন যে ছাপার পর তাঁর বই একটুও এদিক-ওদিক হোত না বা এক লাইন কম-বেশী হোত না। এ বিষয়ে তাঁর হিসাব-প্রণালী দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সমগ্র গ্রন্থখানির মুদ্রণ প্রভৃতিতে যা খরচ পড়ত তা তাঁর হিসাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যেত। এ-ছাড়া প্রত্যেক পাতা হিসাবে মুদ্রণ-ব্যয় এবং কাগজের মূল্য পর্যন্ত তাঁর হিসাবে ধরা পড়ত।

আর একটি কথা হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে, তাঁর বইগুলির প্রচ্ছদপট সব তাঁরই কল্পনাপ্রসূত, এমনকি একটি প্রচ্ছদপট তাঁর নিজেরই অঙ্কিত। বেশীর ভাগ লেখকের মতো তিনি শুধু বইখানি লেখার পরই নিজেকে মুক্তি দিতেন না—তিনি বইকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুশ্রী করবার জন্য যা-কিছু করা দরকার সব সময় তার চেষ্টা করতেন এবং এ-বিষয়ে আমাকে বহুভাবে সাহায্য করতেন।

এজন্য তিনি সবচেয়ে বেশী এবং আকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন প্রেসের কম্পোজিটারদের কাছ থেকে অর্থাৎ যাদের নামে আমরা চালিয়ে থাকি ছাপাখানার ভূত কথাটা। অনেক লেখকের ধারণা যে প্রেসে 'কপি' দেবার সময় কোনরকমে লিখে দিলেই হল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কপি লেখা হয়েছে, কোনো মুদ্রিত কাগজের অপর পৃষ্ঠায় বা ডায়েরির পৃষ্ঠায় কিছুটা স্পষ্ট, কিছুটা অস্পষ্ট, তারপর কাটাকুটি তো আছেই। আসলে এঁদের বই লেখা হয় প্রথম প্রুফের উপর। এ-বিষয়ে বিলাতী প্রকাশকদের মুদ্রণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই।

আমার এক বন্ধু তাঁর কয়েকখানি বই প্রকাশ করেছেন বড় বিলাতী প্রকাশকদের দ্বারা। কথায় কথায় তিনি আমাদের জানালেন

যে, প্রথমে তাঁদের কাছে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের উপযুক্ত হ'য়ে পাঠাতে হয় টাইপ করে। তারপরে সেই প্রকাশকরা মাঝে মাঝে পাণ্ডুলিপির ইংরাজি সংশোধন করে পুরো পাণ্ডুলিপিটি পুনরায় 'টাইপ' করে লেখকের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ প্রেসে যখন কপি দেওয়া হবে, তখন তা সববিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভুল থাকবে, তখন কাটাকুটি করা চলবে না। অনেকের হয়ত জানা নেই যে, বিলাতী বড় বড় প্রকাশকদের দপ্তরে 'রীডার' থাকে। তাদের কাজ হলো প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির সমস্তটা পাঠ করা, পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজন হলে ভুল সংশোধন করা ও প্রকাশের পক্ষে বা বিপক্ষে চূড়ান্ত মতামত দেওয়া। শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথের বিলাতী প্রকাশকের অফিসে সেই সময় 'রীডার' ছিলেন বিখ্যাত কবি ও সমালোচক স্টাফোর্ড এ. ব্রুক।

যাঁরা রাজশেখরবাবুর প্রুফ সংশোধন করা দেখেছেন, তাঁরা প্রুফগুলির পরিচ্ছন্নতা দেখে অবাক হয়ে গেছেন। প্যারা যোগ করা নেই, এখান থেকে ওখানে লাইন টেনে দেওয়া নেই, লাইন কেটে নতুন লাইন বসানো নেই, এমনকি কোনো শব্দ বদলানো পর্যন্ত নেই। শুধু কম্পোজের সামান্য দুই-একটা ভুল ছাড়া তাঁর প্রুফে আর কোনোরকম কাটাকুটি দেখা যেতো না। কারণ, তাঁর লেখায় বাদ দেবারও কিছুই নেই, যোগ করবারও কিছু নেই। এমন সুন্দর ও নির্ভুলভাবে তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতেন। পুস্তক মুদ্রণ বা প্রকাশ ব্যাপারে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করতেন না। কেবল তাঁর বই সম্বন্ধে নয়, সব বিষয়েও তাঁর নিজের মতামত তিনি কোনদিন বড় করে জাহির করেননি।

আমরা সকলেই জানি যে, বাংলা লাইনো উদ্ভাবন-ক্ষেত্রে 'আনন্দ-বাজারে'র সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু এটাও আমাদের ভুললে চলবে না যে, এ-বিষয়ে রাজশেখরবাবু ও যতীন্দ্রকুমার সেনের অবদানও বড় কম নয়।

তাঁর চরিত্রের একটা সবচেয়ে বড় গুণ ছিল যে, যার যে-বিষয়ে কৃতিত্ব আছে, সেই বিষয়ের ভার তিনি তার উপরেই ছেড়ে দিতেন। অনেক সময়ে নিজের মতের সঙ্গে অপরের মত না মিললেও প্রথমে তিনি সকলকে অনুরোধ করতেন এ-দুটো মতকে বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবার জন্যে এবং দুটোর মধ্যে যেটা ভালো, সেইটাই গ্রহণ করতে বলতেন। নিজের মতটাকেই যে নিতে হবে এমন দাবী তিনি কখনও করেননি। যার যে-বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, তার কাছ থেকে তিনি তা শিক্ষার্থীর মতোই জেনে নিতেন।

নিয়মানুবর্তিতায় তিনি ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তিনি যখন যে-কাজটা করতেন, সে-কাজটা শেষ না করে অন্য কাজের দিকে কখনও মন দিতেন না। এমনকি কোনো লোকের সঙ্গে কোনোদিন হয়ত কোনো আলোচনায় ব্যস্ত আছেন, এমন সময় অন্য কেউ এলে তাঁর সঙ্গে কথাই বলতেন না। আমি দেখছি অনেকদিন সকালবেলায় তাঁর বাড়ীতে গেছি, পুস্তক-প্রকাশন ব্যাপারে আলোচনা করছি, এমন সময় কোনো লোক এলে তিনি টেবিলের ওপরে একটি 'নোটিশ' টাঙিয়ে দিতেন—নোটিশে লেখা থাকত 'আমি এখন ব্যস্ত আছি।'

কথা বলতেন খুব কম। তাঁকে হাসতেও যেমন কম দেখা যেত, রাগতেও তেমনি দেখেছি আমরা খুব কম।

সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন সুশৃঙ্খল পণ্ডিত এবং নিরহঙ্কার লোক আমার নজরে খুব কমই পড়েছে। বাংলাভাষার সমৃদ্ধিকল্পে তাঁর অবদান চিরকাল বাঙালী সমাজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে।

রাজশেখরবাবুর বিষয় বলতে গেলে তাঁর জামাতা অমর পালিতের বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। এঁর কাছে আমার দোকানের ব্যাপারে আমি যথেষ্ট ঋণী। অমরবাবু প্রথম জীবনে মেট্রোপলিট্যান ইন্‌ষ্টিটিউ-শনের প্রফেসর ছিলেন। পরে ইনি রাজশেখরবাবুর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরে ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস নামে একটি

বৃহৎ সাবানের কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু নানা কারণবশতঃ এই কারখানা চালাতে না পেরে তিনি এই কারখানা পরে বন্ধ করে দেন ও ওকালতি করতে আরম্ভ করেন।

একদিন রাজশেখরবাবু অমর পালিতকে নিয়ে আমার দোকানে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, এ এবার থেকে আইন প্র্যাকটিশ করবে; এবং যে আইনের বই দরকার হয় এঁকে দেবেন। আমি এই সব আইন বইয়ের পরে দাম দিয়ে দেবো। সেই থেকে অমর পালিতের সঙ্গে আমার বন্ধুতা সুদৃঢ় হয়ে গেল। তাঁর বাড়ীতে আমি প্রায়ই গল্প করতে যেতাম। এমন সময়ে হ্যারিসন রোড ওয়াই. এম.সি.এ বিল্ডিংএর নীচ থেকে ও প্রেসিডেন্সী কলেজের সম্মুখে অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউটে ১৯২৯ সালে আমাদের দোকান স্থানান্তর করি। এখানে দোকান ঘরের তুলনায় ভাড়া খুব বেশী ছিল। যে-দোকান ঘরটি আমি নিয়েছিলাম সেটি তখন এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক ছিল। আটশ টাকা দিয়েও দোকানের দখল পেলাম না। কারণ ঘরটি আলবার্ট ইন্‌স্টিটিউটের অধীনে ছিল। এ ক্ষেত্রে অমর পালিত, সুভাষচন্দ্র বসু ও আনন্দবাজার ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের সুরেশচন্দ্র মজুমদার অ্যালবার্ট ইন্‌স্টিটিউটের মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে ঘরটি পাওয়ার সুবিধে করে দিয়েছিলেন।

এখানে বলা দরকার এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সঙ্গে অমর পালিতের সেই থেকে খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হওয়াতে তিনি এই ব্যাঙ্কে বড় ধরনের চাকরি পেয়ে গেলেন। তারপর তিনি ব্যাঙ্কের কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতার বিখ্যাত ইংরাজ পুস্তক-বিক্রেতা বাটারওয়ার্থ অ্যাণ্ড কোম্পানীতে যোগ দিয়ে তাদের আপিসে কাজ করতে লাগলেন। এই সূত্রে তিনি প্রায় এক বৎসর মাদ্রাজে ছিলেন এবং মাদ্রাজ হ'তে পুস্তক প্রকাশে সাহায্য করেছিলেন। এই ব্যবস্থা বাটারওয়ার্থ কোম্পানী তাদের কাজের সুবিধার জন্য করে ছিলেন।

অমর পালিত মহাশয় বলিষ্ঠ ও সুদর্শন ছিলেন। কি ক'রে যে

তাঁর শরীরে অকালে ক্ষয়রোগ ঢুকল তা আমরা বুঝতে পারিনি। এই রোগেই তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুদিবস বড়ই দুঃখের। তাঁর বাড়ীতে এবং আমাদের মনেও এই দুঃখের ছায়া অনেকদিন গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। অমর পালিত এবং তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ রাজশেখরবাবুর একমাত্র কন্যা কয়েকঘণ্টার ব্যবধানে একই দিনে মারা যান।

রাজশেখর বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্রশেখর বসুও একজন উঁচুদরের সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের একজন গুণগ্রাহী ছাত্র ছিলেন এবং এবিষয়ে অনেক প্রবন্ধাদি লেখেন। সেই সূত্রে 'স্বপ্ন' বলে একটা বই লেখেন এবং সেটা আমরাই প্রকাশ করি। এছাড়া তাঁর 'পুরাণ প্রবেশ' এবং গীতার একটি আলোচনা বিদগ্ধসমাজের বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বা গবেষণামূলক পুস্তকেই যে শুধু তাঁর দক্ষতা ছিল তাই নয়, শিশুসাহিত্যেও তাঁর অবদান অল্প হলেও অসাধারণ। তাঁর 'লাল কালো' ছোটদের একটি বিখ্যাত বই। শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন এই শেষোক্ত বইটি সুন্দর সুন্দর চিত্রে অলংকৃত করেন। এছাড়া 'মৌচাকে' তাঁর বহু সুখপাঠ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সেকালে তিনিই ছিলেন একমাত্র বাঙালী চিকিৎসক যিনি মনস্তত্ত্ব নিয়ে চিকিৎসা করতেন, অর্থাৎ যাকে বলে Psychiatrist।

তাঁর বড় ভাই শশিশেখর বসু হাস্য-রসিক ছিলেন—তিনিও অনেক হাস্যরসাত্মক রচনা লিখে গেছেন। তাঁর একখানি বইও প্রকাশিত হয়েছিল।

'ভারতী'র আসরে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একজন প্রধান আড্ডাধারী। তাঁকে বলা হোত ছন্দের রাজা। কিন্তু আমার মনে

হয় তিনি ভালো কবিতাও লিখতেন, যদিও ছন্দের কলাকৌশল নিয়েই তাঁর সম্পর্কে বেশী মন্তব্য করা হয়ে থাকে।

তাঁর কবিতায় বৈচিত্র্য থাকলেও প্রেমের আমেজ থাকত কম। এত বিভিন্ন মিষ্টি ছন্দে তিনি কবিতা লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো কবির কলম থেকে তা বেরিয়েছে কিনা সন্দেহ। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি সাহিত্যের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ, তিনি ছিলেন বিখ্যাত প্রাচীন সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন গম্ভীরপ্রকৃতির মানুষ। একটি পোশাকেই তাঁকে আমরা বরাবর দেখেছি—শাদা ধুতি আর পাঞ্জাবি। আর প্রায় সবসময় তাঁর সঙ্গে থাকত ছাতা। চেয়ারের ওপরে বসতেন আসনপিঁড়ি হয়ে। তাঁকে দেখতে বেশ গম্ভীরপ্রকৃতির মনে হলেও অত্যন্ত সুরসিক এবং মজলিশী লোক ছিলেন, তবে অন্তরঙ্গতা ছিল কয়েকজনের মধ্যেই। ভারতীর আড্ডায় তিনি একটি প্রধান আইন জারী করেছিলেন যে, রাত্রি ন'টার আগে এখান থেকে ওঠা যাবে না। যিনি উঠবেন তাঁকে জরিমানা দিতে হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন অগাধ পণ্ডিত। এত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল যে, আমরা তাঁর সে-জ্ঞানের পরিধি দেখে অবাক হয়ে যেতাম। অসম্ভব পড়াশুনা করতেন তিনি। তাঁর লাইব্রেরীটি ছিল একটি দেখবার জিনিস। বহু ধরণের বই কিনেছিলেন তিনি, এবং বেশ ভালো করে বাঁধিয়ে রাখতেন। মৃত্যুর সময় তাঁর এই অমূল্য লাইব্রেরী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে দান ক'রে গেছেন। কোথাও কোনো ভাল বইয়ের সন্ধান পেলেই তিনি গিয়ে তা কিনে ফেলতেন।

মৃত্যুর আট-নয় বছর আগে তাঁর চোখের রোগ হয়। দৃষ্টিশক্তি দিনে দিনে কমে আসতে লাগলো দেখে তিনি চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। সমস্ত বড় বড় ডাক্তার তাঁর চোখ পরীক্ষা করে শেষে বলে দিলেন যে এ রোগ আর সারবে না। ক্রমশ দৃষ্টি কমে আসার সঙ্গে

সঙ্গে তিনি অন্ধ হয়ে যাবেন। ডাক্তাররা তাঁকে পড়াশুনা করতে একেবারে বারণ করে দিলেন।

সেই থেকে সত্যেন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন এক রকম জীবন্মৃত হয়েই ছিলেন। কারণ তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর চোখের দৃষ্টি দিন-দিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে—তার ওপর পড়াশুনা করতে না পারার কষ্ট—সেজন্য শেষজীবনে তাঁর সুখ ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের কাছে প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন যে, এরকমভাবে জীবনধারণ করার চেয়ে মৃত্যু ভালো। আমরা তাঁকে কত সান্ত্বনা দিতাম। তাঁর এই শারীরিক অবস্থা সত্ত্বেও তাঁর কবিতা লেখা বন্ধ হয়নি। আমাদের দেশে তখন বিপ্লব ও বিপর্যয়ের অন্ত ছিল না। যখনই কোনো বিপ্লব উপস্থিত হতো তখনই তার অন্তর সাড়া না দিয়ে পারত না। তিনি সেই বিষয় নিয়ে সুন্দর কবিতা লিখতেন।

চোখের অসুখ ছাড়াও পেটের গোলমালেও তিনি প্রায়ই ভুগতেন। পেটের জন্য তাঁর শরীর প্রায়ই খারাপ থাকত। সেজন্য শেষদিকে তিনি আর বিশেষ লিখতেই পারতেন না।

একবার মনে আছে আমরা অর্থাৎ 'ভারতী'র প্রধান প্রধান আড্ডাধারীরা তখন দু-একদিনের ছুটি পেলেই সব বন্ধু-বান্ধব মিলে শহরের এই কোলাহল ছেড়ে পালিয়ে যেতাম কাছাকাছি কোনও জায়গায়। সেখানে দু' একদিন থেকে একটু হাঁপ ছেড়ে আবার কলকাতা চলে আসতাম। সেবার আমরা গিয়েছিলাম বিখ্যাত সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ী হুগলী জেলার জিরেট-বলাগড়ে। সেই দলে সত্যেন দত্ত-ও ছিলেন আর ছিলেন সাঁতারু কবি শান্তি পাল। এই দলের বন্ধুরা প্রায় সকলেই এখন মৃত। এটা হল সত্যেন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার দিন কুড়ি-পঁচিশ আগে—১৯২২ সালে।

একদিন চারুবাবুর জিরেট-বলাগড়ের বৈঠকখানায় বিকেলবেলায় আমাদের আড্ডা বসেছে। সত্যেন্দ্রনাথ পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে বললেন: আজ একটা কবিতা লিখেছি—আপনারা ইচ্ছে

করলে শুনতে পারেন। বলে তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন। আমার মনে হয় এটি তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করলাম।

জ্যৈষ্ঠী-মধু

আহা, ঠুকরিয়ে মধু কুল্‌কুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুলবুলি ;—
টুল্‌টুলে তাজা ফলের নিটোলে
টাট্‌কা ফুটিয়ে ঘুল্‌ঘুলি !

হের, কুল্‌ কুল্‌ কুল্‌ বাস-ভরা
সুরু হ'য়ে গেছে রস্‌ ঝরা,
ভোম্‌রার ভিড়ে ভীমরুলগুলো
মউ খুঁজে ফেরে বিল্‌কুলই।

তারা, ঝাঁক বেঁধে ফেরে চাক্‌ ছেড়ে
দুপুরের সুরে ডাক ছেড়ে,
আঙ্‌রা বোলানো বাতাসের কোলে
ফেরে ঘোরে খালি চুল্‌বুলি।

কত, বোলতা সোনেলা রোদ পিয়ে
বুঁদ হ'য়ে ফেরে রোঁদ দিয়ে ;
ফল্‌সা-বনের জল্‌সা ফুরুলো,
মৌমাছি এলো রোল তুলি' !

ওই, নিঝুম নিথর রোদ খাঁ-খাঁ

শিরীষ-ফুলের ফাগ-মাখা,
ঢুলঢুলে কার চোখ দুটি কালো
রাঙা দুটি হাতে লাল রুলি !

আজ, ঝড়ে-হানা ডাঁটো ফজ্‌লী সে,
মেশে কাঁচা-মিঠে মজ্‌লিসে ;
'রং-চোরা ফলে রস কি জোগালো'—
কুহু কুহু পুছে কার বুলি !

ওগো, কে চলেছে ঢেলা-বন ঠেলে
বুল্‌বুলি-খোঁজা চোখ মেলে,
জাম্‌রুলি-মিঠে ঠোঁট দুটি কাঁপে,
তাপে কাঁপে তনু জুঁইফুলী !

মরি, ভোম্‌রা ছুটেছে তার পাকে,—
'হাওয়া ক'রে দুটো পাখ্‌নাকে
ফলের মধুর মর্‌সুম যাপে
ফুলের মধুর দিন ভুলি' !

কোনো দোকান থেকে কোনো বই কিনতে গেলে তাঁর একটি বিচিত্র স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেতো। তিনি যে বই কিনবেন ঠিক করতেন তার প্রতিটি পাতা উল্টে-পালটে দেখতেন। প্রথম দিনে যতগুলি পাতা পরীক্ষা করা সম্ভব হতো সেখানে একটি কাগজ দিয়ে চিহ্ন করে রেখে যেতেন। পরদিন গিয়ে বাকীটা পরীক্ষা করে তারপর কিনতেন। আমার মনে হয় হয়ত কোনো সময় তিনি বই কেনার পর দাগী বা ময়লা লাগা বা পাতা বাদ পড়া ফর্মা পেয়ে প্রতারিত হয়েছিলেন—তাই এই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন

করেছিলেন। তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি মৃদু হেসে বলতেন—বই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকতে পড়ে তৃপ্তি হয় না।

সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আমি বার দুয়েক গিয়েছিলাম। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে প্রথম তাঁর বাড়ীতে আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে প্রতিদিনই 'ভারতী' অফিসে দেখা হ'ত। সেইখানে আমার সঙ্গে আলাপ হয় বিখ্যাত ইংরাজী লেখক আমেরিকা প্রবাসী স্বর্গত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আর একবার যাই তাঁর মৃত্যুর দিনে।

রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে তিনি নানা বইয়ের নামকরণ করে দিতেন—এ বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত কৃতিত্ব ছিল।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে আমি যখন ছোটদের মাসিক পত্র 'মৌচাক' প্রকাশ করি তখন এর নামকরণ তিনিই করে দিয়েছিলেন। প্রথম সংখ্যায় তাঁর লেখা 'মৌচাক' কবিতাটি এখানে আপনাদের উপহার দিলাম।

কবিতাটি সত্যিই অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেছে—

ঝরছেরে মৌচাকের মধু
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ায়
দাওয়ায় ব'সে ভাবিস কি আর
আয়রে তোরা বেরিয়ে আয়!

কোন্‌খানে চাক খুঁজতে হবে
কোন্ বাগানে কোন্ বনে,
তুড়ুক নেচে ফুড়ুক উড়ে
শালিক হ'ল চন্‌মনে!

ভোম্‌রা চলে বন্‌বনিয়ে
হন্‌হনিয়ে আমরা যাই,

ঠিক্-দুপুরের আগুন হাওয়া
গন্‌গনিয়ে ছুট্‌ছে ভাই।

শুক্‌নো পাতার পাঁপর ভাজা
পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যায়;
জাম্‌রুলে ফুল ঝামরে পড়ে
আমরুলী-রঙ আমপাতায়।

হাওয়ার সাথে ছুট্‌ছি মেতে
রোদের তাতে মুখ্-রাঙা,
কঞ্চি হাতে খুঁজ্‌ছি কেবল
কোথায় মধু চাক্‌ভাঙা?

মৌমাছি যা হাবিস্ করে
ফুলের ফুটোয় শুঁড় দিয়ে,
তাই নেবো ভাই, তাই নেবো আজ—
ফিরবো না তো গুড় নিয়ে।

কুড়ুক-পাখীর কান-জুড়োনো
আওয়াজ ধ'রে চল্ চলে,
কাঠ্‌বিড়ালীর পিছন পিছন
ঘুরবো কাঁটার জঙ্গলে।

লিচুর পাতায় বগ্‌লী যেথায়
বানিয়েছে লাল-পিঁপড়েরা
সেই বনে চল্ সেই গহনে
মৌমাছিদের সেই ডেরা!

সর্ষে-ফুলের মৌ ঝাঁঝালো—
পদ্মফুলের মৌ মিঠে,—
মৌচাকেরই লাখ কুঠুরীর—
মধ্যে কে রয় কোন্ পিঠে?—

দেখতে হবে চাখ্‌তে হবে,
চল ছুটে ভাই যাই সবে,—
মৌচাকে মৌমাছির পুঁজি
মন্ যে ভোলায় সৌরভে।

পরেও তাঁর অনেক কবিতা 'মৌচাকে' প্রকাশিত হয়েছে।

যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা জানেন যে তিনি কি রকম আত্ম-ভোলা প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাস্তব জগতের সাধারণ কাজগুলিও তিনি করতে পারতেন না। যেমন ধরুন, সামান্য মণি-অর্ডারের ফর্ম লেখাও তাঁর দ্বারা হতো না—এ সামান্য ব্যাপারেও তাঁকে কোনো বন্ধুর সাহায্য নিতে হতো। হাট-বাজার করা তো ছেড়েই দিন, কোনোদিনই তিনি তা করতে পারতেন না।

সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটা অবিচ্ছিন্ন কবিপ্রীতি ছিল। আজকাল শুনতে পাই যে সত্যেন্দ্রনাথ নাকি ছন্দ-বিশারদ, সত্যিকার কবি নন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা মনে করতেন না। ১৯২২ সালে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রামমোহন লাইব্রেরী হলে তাঁর স্মৃতির জন্য আমরা একটা সভার অনুষ্ঠান করি। কথা ছিল, সভা শেষ হবার পর একটা রীতিমত কমিটি গঠিত হবে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য। অন্যান্য সভায় যেমন হয়ে থাকে তেমনভাবে কোনো সভাপতির নাম প্রস্তাব আমরা করি নি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই মৃত্যুবাসরে এসে আসন গ্রহণ করলেন। তার পর সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিত কবিতাটি সভাপতির পাঠ করলেন।

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরিগাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে।

শেষের দিকে ছিল—

—আশা করি, মর্তজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্যলোকের দ্বারে—ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা॥

আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনে এমন অভিভূত হয়েছিলাম যে সেদিন সত্যেন দত্তের সেই স্মরণ সভায় আর কোনও রেসোলিউশন নেওয়া বা কমিটি গঠন হল না। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী কবিগুরুর কবিতা শুনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি চলে গেল। এইরকম শোকপূর্ণ সভা আমি আর কখনও দেখিনি।

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম সুহৃৎকে, বাংলাদেশ হারাল তার একজন কৃতী সন্তানকে, বাংলা সাহিত্য হারাল একটি উজ্জ্বল রত্নকে।

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম বিদগ্ধসমাজে অত্যন্ত সুপরিচিত। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর মৃত্যুর বেশ

কিছুদিন আগে হেদুয়ার ধারে এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাটি কিছু-দিনের জন্য সম্পাদনা করেন। 'ভারতবর্ষে'র ইনি প্রথম সম্পাদক। এই 'ভারতবর্ষে' বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার এবং প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়ের যুক্তভাবে লেখা কয়েকটি রচনা প্রকাশ করেন। মেট্রোপলিটান কলেজে তিনি পালি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। কিছুদিন 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদনা করার পর কোন ব্যক্তিগত কারণে তিনি 'ভারতবর্ষে'র সংস্রব ত্যাগ করে 'সংকল্প' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সে পত্রিকাটিরও কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর অকালমৃত্যু ঘটে। তারপর 'পঞ্চপুষ্প' নামে আবার একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটিও দু'তিন বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।

তিনি বহু ভাষা জানতেন। সেই সূত্রে বিভিন্ন ভাষায় চিঠিপত্র পড়ে বা অনুবাদ করে দিয়ে দু পয়সা উপার্জন করতেন। 'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস', 'জৈনজাতক' 'সরস্বতী' প্রভৃতি তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি। বঙ্গীয় মহাকোষ নামে একখানি বৃহৎ শব্দকোষ সংকলনের কাজে ইনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন—কিন্তু তা অসমাপ্ত রেখেই ১৯৪০ সালে ইনি পরলোকগমন করেন।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীই বলতে গেলে সর্ব-প্রথম আমাকে সাহিত্যজগতে অনুপ্রাণিত করেন। এঁরই সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা দীর্ঘকাল (১২৯১-১৩৩২) প্রকাশিত হয়েছিল এবং 'ভারতী'তে আমার লেখা প্রকাশিত হয়। লেখাটি মনোনীত হবার পর স্বর্ণকুমারী দেবী আমাকে চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়ে যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন তা আমার মনের মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে আছে। তাঁর চেহারা ও ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা ব্যক্তিত্ব ও রুচিস্নিগ্ধতা ও নম্রতা ছিল যাতে প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রতি আমার মন শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে ভরে গিয়েছিল—এবং তা শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

সকলেই জানেন যে মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাসখানির নাম হল 'দীপনির্বাণ', প্রকাশিত হল ১৮৭৬ সালে। তাঁর লেখা বহু কবিতা ও নাটক আছে। এঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'স্নেহলতা', 'কাহাকে ?' 'ছিন্নমুকুল', 'মিলন রাত্রি', 'বিচিত্রা', 'স্বপ্নাবলী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁর বাংলা বইয়ের স্বরচিত অনুবাদ **Fatal Garland** ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যেও এঁর বিশেষ দখল ছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে 'জগত্তারিণী পদক' দ্বারা সম্মানিত করেন।

এখানে আমি প্রিয়ম্বদা দেবীর নাম উল্লেখ করছি। তিনি মৌচাকে নিয়মিতভাবে কবিতা লিখতেন। এঁর একটি ছোটদের বই আমি প্রকাশ করেছিলাম। তাতে ছবি এঁকেছিলেন নন্দলাল বসু। বাঙালী মেয়ের প্রধান গুণ হ'ল মিষ্টতা, নম্রতা ও মিষ্টি কথা বলা। এই সব গুণই তাঁর মধ্যে যথেষ্ট ছিল যা আজকাল বাঙালী মেয়েদের মধ্যে দুর্লভ। তা ছাড়া তিনি অপরূপ সুন্দরীও ছিলেন।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুহৃৎদের অন্যতম। তাঁর সঙ্গে একত্রে আমরা বহু আড্ডা দিয়েছি এবং বহু দেশ ভ্রমণ করেছি।

প্রথম যুগে তিনি এলাহাবাদ থেকে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের প্রকাশিত গ্রন্থের সম্পাদনা করতেন। পরে তিনি কলকাতায় এসে 'প্রবাসী'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় 'প্রবাসী'ই ছিল শ্রেষ্ঠ মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। বাংলাদেশে মাসের ১লা তারিখে পত্রিকা প্রকাশের দৃষ্টান্ত প্রথম 'প্রবাসী'ই প্রতিষ্ঠা করে। 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মাসের প্রথম তারিখে 'প্রবাসী' প্রকাশ করার নিয়ম বাংলাদেশে আরম্ভ করেন। 'প্রবাসী'র এই উৎকর্ষ ও উচ্চমানের জন্য রামানন্দ-

বাবুর সঙ্গে চারুবাবুর কৃতিত্ব যে বড় কম ছিল না—এ-কথা স্বীকার করব আমি অকুণ্ঠচিত্তে। চারুবাবু ছিলেন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়্যু'র সহকারী সম্পাদক। যদিও তাঁর নাম সহকারী সম্পাদক হিসাবে ছাপা হ'ত না। 'প্রবাসী'র বিভিন্ন বিচিত্র বিভাগে চারুবাবুরও হাত ছিল—যেমন পঞ্চশস্য, বেতালের বৈঠক, মহিলা মজলিস, ছোটদের পাততাড়ি প্রভৃতি। নতুন নতুন লেখককে আবিষ্কার ক'রে তাঁদের রচনা প্রকাশ করে 'প্রবাসা'র তরফ থেকে চারুবাবু তাঁদের যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন।

চারুবাবু অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছিলেন, তার মধ্যে অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছিল আমাদের প্রকাশনা থেকে। তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম হল 'স্রোতের ফুল'। বলা বাহুল্য, সেখানাও আমরাই প্রকাশ করি। চারুবাবুর এই প্রথম উপন্যাস 'স্রোতের ফুল' প্রথমে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

কেবল গল্প-উপন্যাসই নয়, তাঁর রচিত একাধিক গবেষণামূলক গ্রন্থও তাঁর সাহিত্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। এখানে বেদ-বাণী, রবিরশ্মি প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ'তে বাংলা পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন হলে স্যর আশুতোষ চারুবাবুকে আহ্বান করেন শিক্ষকতা করার জন্য। স্যার আশুতোষের বাড়ি জিরেট-বলাগড় চারুবাবুরও দেশ। তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্য এবং গবেষণার জন্য তিনি এই উপযুক্ত পদ পেলেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপকরূপে যোগ দেন এবং প্রচুর কৃতিত্ব ও যশ অর্জন করেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি অনেক নতুনত্বের আমদানি করেন। প্রথম জীবনে তিনি শিশুদের জন্য পারস্য উপন্যাস ও ভারতের জন্মকথা ইত্যাদি লেখেন। তাঁর কাহিনী অবলম্বনে নির্বাক যুগে 'চোরকাঁটা' নামক একটি চিত্র নির্মিত হয়। ছবিটি পরিচালনা করেন চারু রায় ও প্রযোজনা করেন বীরেন্দ্রনাথ সরকার। পরে তাঁর 'মুক্তিস্নান'



মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়



সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



নরেন্দ্র দেব



হেমেন্দ্রকুমার রায়



সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়



প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়



প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

উপন্যাসটিও চিত্রায়িত হয়। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনূদিত 'যমুনা পুলিনে ভিখারিণী'রও চলচ্চিত্ররূপ হয়েছিল।

চারুবাবু সিনেমা দেখতে খুব ভালবাসতেন। নব্যবাংলার শিল্পের সেই সময় যে আন্দোলন হয়েছিল, চারুবাবু 'প্রবাসী'তে সেইসব ছবি ও সংবাদ বিশেষভাবে পরিবেশনের ব্যবস্থা করে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু রায় ও আমি প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। একবার আমরা তিনজনে বর্মায় যাই। সেই সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন সুধীর চৌধুরী, যিনি পরে রামানন্দবাবুর জামাতা হন।

'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের তখন নিয়মিত লেখা বেরুত। সেই সূত্রে চারুবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় হবার সুযোগ পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ চারুবাবুর লেখা পড়ে সুখ্যাতি করেছিলেন। এমনকি চারুবাবুর কয়েকটি উপন্যাসের 'প্লট'ও নাকি রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত—একথা চারুবাবু নিজে আমাদের বলেছিলেন।

চারুবাবুর সঙ্গে কবি সত্যেন দত্তের গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। সত্যেনবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি সংকলন করে চারুবাবুই 'কাব্য-সঞ্চয়ন' নাম দেন। সে বইখানি আমরাই প্রকাশ করি এবং অনেকগুলি সংস্করণও হয়েছে।

১৯৩৮ সালে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন।

আমাদের প্রকাশন সংস্থা থেকে যেসব মনীষীদের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে স্যর যদুনাথ সরকারের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাঁর নিকট-সান্নিধ্যে এসে এমন একটি মানুষের সন্ধান পেয়েছিলাম যাঁর পাণ্ডিত্য, নিয়মনিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা ও সত্যবাদিতা এবং অপক্ষপাত বিচারক্ষমতা আমাকে অভিভূত করেছিল। এরকম একটি কঠোর নিয়মতান্ত্রিক (Strict Principle) চরিত্র চিরস্মরণীয়।

তাঁর সম্বন্ধে কিছু না বললে আমার এই বই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাই এখানে দু চার কথায় আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

স্যর যদুনাথ আমাদের আত্মীয়ও ছিলেন। ১৯১০ সালে যখন আমাদের পুস্তক প্রতিষ্ঠান প্রথম স্থাপিত হয়, তখন থেকেই আত্মীয় হিসেবে ও তাঁর প্রকাশক হিসেবে তাঁর সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। তিনি অত্যন্ত রাশভারী এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কারও সঙ্গে তাঁকে দিলখোলা মেজাজে হাসি-ঠাট্টা করতে দেখা যায়নি—অন্তত আমি দেখিনি। তিনি সব সময়েই অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে কাজকর্ম দেখতেন ও চালাতেন। যাঁদের সঙ্গে তিনি ব্যবসায়িক কথাবার্তা বলতেন, তাঁদের সঙ্গে কখনও কোন কথার নড়চড় হতে দিতেন না। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, সময়ানুবর্তিতা এবং কথাবার্তায় এতটুকু এদিক-ওদিক হবার উপায় ছিল না। সব বিষয়েই ঘড়ির কাঁটার মত চলতেন তিনি।

বাহ্যতঃ তিনি কঠোর প্রকৃতির হলেও অন্তরে তাঁর স্নেহ-দয়া-মায়া কোনটির অভাব ছিল না। তাঁর প্রচুর আর্থিক দান ছিল—তা কোনদিন তাঁর কথাবার্তায় প্রকাশ পায়নি, সেজন্য আমরাও দানের সম্বন্ধে বিশেষ জানতে পারিনি। সব থেকে দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁর যতখানি সম্মান দেশের কাছে পাওয়া উচিত ছিল, তা তিনি কোনদিন পাননি। অবশ্য তিনি ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে তাঁর মনীষার স্বীকৃতিস্বরূপ 'স্যর' ও 'সি-আই-ই' উপাধি পেয়েছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন—তবু আমার কেন, বহু লোকেরই ধারণা যে, বাঙালীর কাছ থেকে ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ছিল আরো অনেক বেশি।

বিদেশে তাঁর খ্যাতি ও যশ ছিল অপরিসীম। সে দেশের কাগজে তাঁকে **Indian Gibbon** বলা হত। **Decline and fall of Roman Empire** নামে বই লিখে য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক গিবন

খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর নামানুসারেই যদুনাথের এই আখ্যা হয়েছিল। তাঁর লিখিত ইতিহাস পড়লে মনে হবে যে একাধারে উপন্যাস ও ইতিহাস পড়ছি। ইংরাজি ভাষাতেও যেমন তাঁর অদ্ভুত দখল ছিল তেমনি লেখার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। তাঁর লেখা পড়লে যে-কোনো পাঠকের মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। এম-এ পরীক্ষায় তিনি ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন, যদিও পরে ঐতিহাসিক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি সুদূরবিস্তৃত হয়।

সার যদুনাথ যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সে-সময় সার আশুতোষের যুগ তথা প্রতিপত্তি শেষ হয়েছে। সে-সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরমহলের লোকেদের দ্বারা তাঁর কাজকর্মে খুব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, যেজন্য শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। পরে এসব খবর আমরা জানতে পারি।

জীবনের তিক্ত আস্বাদ অনেকরকমে তিনি অনুভব করেছেন। তাহলেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে, নিয়মনিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা এবং ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটনে সত্য কথা বলার সাহস খুব কম ঐতিহাসিকেরই ছিল। এইসব দিক দিয়ে দেখতে গেলে বলতে হবে তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন।

আমরা দেখেছি যে, আচার্য যদুনাথ একবার যদি কারো ওপর কোনো ব্যাপারে বিরূপ হতেন, তাহলে আর কোনদিন তাঁর ওপর অনুকূল মনোভাব পোষণ করতে পারতেন না। অর্থের প্রলোভন তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ ছিল। আমরা কয়েকটা ঘটনা থেকে জানতে পারি যে কোনোরকম অর্থের বিনিময়েও তিনি কখনও কারও স্বপক্ষে লিখতেন না। যা সত্য, যা শাশ্বত, তাই তাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতেন। এর প্রমাণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, তাঁর লিখিত বইয়ের সংখ্যা অনেক, কিন্তু তার মধ্যে কোনো রাজা-মহারাজার অন্যায় প্রশস্তি নেই। একবার কোনো রাজ-

পরিবারের ইতিহাস লেখার জন্য তিনি আহূত হন। এই কাজে তিনি প্রচুর উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ যদুনাথ যে ইতিহাস রচনা করেন তাতে সেই রাজপরিবারের যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায় তাঁদের সম্মানের পরিপন্থী হ'তে পারত বলে সে বই ছাপা বন্ধ হয়ে গেল। এ বই শুধু পড়বার জন্যে তিনি দশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। বই ছাপা হ'লে আরো পেতেন।

আচার্য যদুনাথ কোনো ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লেখার আগে স্থান, কাল, ঘটনা, ব্যক্তি সম্বন্ধে যথার্থ অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন স্থানে যেতেন এবং নিজে সমস্ত বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তবে লিখতেন।

সংসারে তিনি নানারকম দুঃখকষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁর এক কন্যা বিলাতে উচ্চশিক্ষার জন্য যান। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর জামাতা ক্যাপ্টেন ঘোষ প্রিন্স অব ওয়েলস জাহাজ ডুবে যাওয়ায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর দুই পুত্রেরও মৃত্যু তাঁর জীবিতাবস্থায় হয়।

আচার্য যদুনাথের নিয়মানুবর্তিতা ও সত্যনিষ্ঠা সম্পর্কে নানা গল্প শোনা যায়। একবার মনে আছে—১৯৪৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে যে দাঙ্গা হয়, তাতে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছুরিকাহত হয়ে হাসপাতালে যান। সেখানে পুত্রের যেদিন মৃত্যু আসন্ন, সেদিন যদুনাথ ভিজিটিং আওয়ারে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এমনই বিচিত্র তাঁর নিয়মানুবর্তিতা যে, পুত্রের মৃত্যু-মুহূর্তের জন্য তিনি অপেক্ষা না করে নির্দিষ্ট সময়ে হাসপাতাল ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন।

আর একটি ঘটনা আমার নিজের জীবনেই ঘটে। একবার স্যর যদুনাথকে কোনো সভায় নিয়ে যাবার ভার পড়েছিল আমার ওপর। সময় ছিল ছ'টা। সভাস্থল থেকে তাঁর গৃহ খুব দূরে ছিল না। আমি যখন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন ছ'টা বেজে দু' এক মিনিট হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। রাস্তায়

আমাকে দেখে বললেন, তোমার এক মিনিট দেরী দেখে আমি একলাই বেরিয়ে পড়েছি।

কর্তব্যনিষ্ঠায় আচার্য যত্নাথ কত যে দৃঢ়চিত্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন তা' তাঁর নিম্নলিখিত এই চিঠি থেকেই বুঝতে পারা যাবে—

> গত মাসে আমার নাতির বিবাহে অজস্র খরচ হইয়া গিয়াছে, তাহার পর ১৬ই ভোজের রাত্রে এক ঘরে চোর ঢুকিয়া ২২০০৲ টাকার গহনা ও নোট চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। সেগুলি আমার নিমন্ত্রিত আত্মীয়াদের গচ্ছিত সম্পত্তি বলিয়া আমি সেই ক্ষতি তাঁহাদের পূরণ করিয়া দিয়াছি। এজন্য আমার একেবারে হাত খালি হইয়া গিয়াছে।……

তিনি নিজে পুস্তক প্রকাশের ব্যয়ভার নিজে বহন করতেন এবং প্রতি সংস্করণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সংশোধন করতেন। তবে বিক্রয়ের জন্য একজন প্রকাশককেই (আমাদের) নির্দিষ্ট করেছিলেন।

প্রকাশনা বিষয়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। তা থেকে বুঝতে পারবেন তাঁর নিয়মনিষ্ঠা কত কঠোর ছিল। একবার একটি বই-এর সংস্করণ প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসবার আগেই নতুন সংস্করণ মুদ্রিত করা হয়। যখন বই বাঁধা হয়ে এল, তখন দেড়শো-দুশো কপির মত পূর্ব সংস্করণের বই অবিক্রীত ছিল। আমি সেই পুরাতন সংস্করণটির অবিক্রীত বইগুলি আগে বিক্রয় করছি দেখে তিনি বললেন : দেখ বাপু, নতুন সংস্করণ যখন বেরিয়েছে, তখন আর এই পুরাতন সংস্করণ বিক্রয় করা উচিত হবে না। ওগুলো সব নষ্ট করে ফেল।

বাধ্য হয়ে তাই করতে হলো। যদিও তাতে তাঁর অনেক টাকা লোকসান হলো।

১৯৫৮ সালের মে মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিখ্যাত সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তখন, ভালোভাবে যখন আমি ও হেমেন্দ্রকুমার রায় 'ভারতী'র সঙ্গে যুক্ত হলাম। সে সময় সৌরীন্দ্রমোহন ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'ভারতী'র যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। সৌরীনবাবুর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল যে, তিনি সবরকমের বাংলা লেখা লিখতে পারতেন—উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা, সমালোচনা, এমনকি গান পর্যন্ত। 'ভারতী'তে তিনি নিয়মিত পুস্তক সমালোচনাও করতেন।

প্রথম জীবনে থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সেই সময় তাঁর কয়েকটি নাটকও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোটগল্পের নাট্যরূপ দিয়ে তাঁর নাট্য-জীবনের হাতেখড়ি। তারপর তাঁর নিজের লেখা অনেক বই মঞ্চস্থ হয়। যেমন—লাখ টাকা, দশচক্র, যৎকিঞ্চিৎ, কাজরী, মন্দির প্রভৃতি। ছায়াচিত্রেও তাঁর অনেকগুলি কাহিনী রূপায়িত হয়েছে। যেমন—সাবিত্রী, বাবলা, আঁধি প্রভৃতি। এর মধ্যে 'বাবলা' আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করে। তাঁর সন্তানদের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুচিত্রা মিত্র এবং চিত্র-পরিচালনায় সৌমেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমধিক প্রসিদ্ধ।

আমি যখন 'মৌচাক' বের করি, তখন তিনি শিশু-সাহিত্যে প্রথম কলম ধরলেন এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভার আর একটি স্বাক্ষর রাখলেন এই বিভাগেও। শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি অতি অল্প-কালের মধ্যেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর বিখ্যাত শিশু-উপন্যাসগুলির নাম হল পাঠান মুল্লুকে, মা কালীর খাঁড়া, চালিয়াৎ চন্দর, লালকুঠি প্রভৃতি। 'চালিয়াৎ চন্দর' নামে তিনি একটি অদ্ভুত 'টাইপ' সৃষ্টি করেন। এই টাইপটি ছোটদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। শিশু-সাহিত্যের জন্য পাঁচশো টাকা মূল্যের 'মৌচাক' পুরস্কারও তিনি লাভ করেন। ফরমায়েসী লেখায় তাঁর কেউ জুড়ি ছিল না।

তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যসেবা করতে পারেননি। কারণ,

পুলিশ কোর্টে ওকালতি গ্রহণ করায় যতটা আশা করা গিয়েছিল, ততটা সাহিত্যসেবার দিকে মনোনিবেশ করতে পারেননি। জীবনের শেষদিকটায় তিনি আদালতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই সময়টা পুরোপুরিভাবেই সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। রূপকথা, উপকথা এবং অনুবাদেও তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। বার্ধক্য সত্ত্বেও তাঁর কর্ম-ক্ষমতা এবং উৎসাহের অভাব কোনদিন আমরা দেখিনি। বহু জিনিস তিনি নিয়মিত অনুবাদ করে ও নানা বিভাগ পরিচালনা করে সাময়িক পত্রিকাগুলির খোরাক যোগাতেন। এই সমস্ত কাজে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর তৎপরতা দেখে আমরা অবাক হয়ে যেতুম।

আমার মনে হয় তাঁর প্রথম দিকের লেখা 'বৌদির কাণ্ড' 'কুন্তলীন পুরস্কারে'র বইয়ে প্রকাশিত হয়ে পুরস্কারলাভ করে। সম্ভবতঃ এই-ই তাঁর সাহিত্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ।

'মৌচাকে'র পঁচিশ বছর বয়স পূর্ণ হলে তার 'রজত-জয়ন্তী' উৎসবের সর্বাঙ্গীণ ভার ন্যস্ত ছিল সৌরীন্দ্রমোহন ও তাঁর স্ত্রীর উপর। বলা বাহুল্য, এঁরা দুজনে সে-দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন। স্যর যদুনাথ সরকার ছিলেন এই অনুষ্ঠানের সভাপতি।

মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী ও সুরসিক।

কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের মত সরল, অমায়িক ও নিরহঙ্কার মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। তিনি যখন খেলাত ইনস্টিটিউশানে শিক্ষকতা করেন, তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। আগে তিনি শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পদার্পণ করেননি, আমিই তাঁকে জোর করে ছোটদের উপযোগী রচনা লিখতে অনুপ্রাণিত করি। এর ফলে তিনি লেখেন ছোটদের জন্য 'চাঁদের পাহাড়' এবং 'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাস। আর এছাড়াও অনেক ছোটদের উপযুক্ত গল্প—যা বেশীর ভাগই 'মৌচাকে' প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের আড্ডায় তাঁর উপস্থিতি ছিল নিয়মিত। তাঁর সারল্য আমাদের সকলকে মুগ্ধ করত। পরের দুঃখে সহজেই তাঁর মন কেঁদে উঠত। সেইজন্য বহু লোককে তিনি অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন।

তাঁর 'পথের পাঁচালী' চিত্রে রূপায়িত হয়ে আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছে। এছাড়াও তাঁর আরও কয়েকটি কাহিনী চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে, যেমন অপরাজিত, অপুর সংসার, বাক্সবদল, আদর্শ হিন্দু হোটেল, কেদার রাজা প্রভৃতি।

যদিও মাত্র তাঁর দু-একখানা বই-ই আমি প্রকাশ করেছি, তবুও তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্য ও প্রীতির সম্বন্ধ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল।

সুসাহিত্যিক ও সুরসিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী আমার বহু পুরাতন ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর মত হাস্যরসিক ও মজলিসী লেখক আমি খুব কমই দেখেছি। কি ছোটদের, কি বড়দের সবরকম লেখাতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর বেশীর ভাগ লেখাই হলো নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের নিয়ে—আর এই লেখার দ্বারা তিনি বাঙলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন সৃষ্টি করে রেখে গেছেন। দুঃখকষ্ট ও নানারকম গ্লানির মধ্যে তিনি যে হাসির ছটা ফোটাতে পারতেন, সেটা অতুলনীয়। 'মহাস্থবির জাতক' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা—এটি কয়েকটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। এটি তাঁর আত্মজীবনী হলেও আমরা তাতে সমসাময়িক কালের সুন্দর একটা প্রতিচ্ছবি পাই।

সব বিষয়েই তাঁর অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল—যেমন সঙ্গীত, ভ্রমণ, খেলা, অভিনয় এবং সাহিত্য-সাধনা। বহুদিন বহুদেশ প্রেমাঙ্কুরের সঙ্গে ভ্রমণ করেছি। শেষজীবনে তিনি সত্য সত্যই স্থবির হয়ে পড়লেও মুখে তাঁর হাসিটি লেগে থাকত সব সময় এবং তাঁর কথা-বার্তাতেও কৌতুক-রস উপচে পড়ত।

মাত্র কয়েক বৎসর আগে তিনি পরলোকগমন করেছেন। এবং

তাঁর মৃত্যুতে আমি এমন একজন অকৃত্রিম সুহৃদকে হারিয়েছি যার শূন্যস্থান কোনদিন পূর্ণ হবে না।

যৌবনে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী বেশ সুপুরুষ ছিলেন এবং যেখানেই যেতেন, সেখানেই আসর জমিয়ে তুলতেন। আসরে বসে সত্য, মিথ্যা, আজগুবী প্রভৃতি মিলিয়ে তিনি যে গল্পের সৃষ্টি করতেন, তার কৌতুক-রস প্রত্যেকেই উপভোগ করত। 'বেতার জগতে'র তিনি একসময় সম্পাদক ছিলেন। 'যাদুঘর' নামক একটি শিশুদের পত্রিকায় তিনি ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদক।

চিত্র-পরিচালনা ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। নিউ থিয়েটার্সের প্রথম সবাক ছবি 'দেনা পাওনা'র তিনিই ছিলেন পরিচালক। তারপর এখানে বহু হিন্দী ও বাংলা ছবি পরিচালনা করেন। কলিকাতার বাইরে বোম্বাইতেও কয়েকটি ছবি পরিচালনা করেছেন তিনি। বোম্বাইতে হাফেসজীর সঙ্গে গিয়ে তিনি অনেক চিত্র পরিচালনা করেন।

প্রেমাঙ্কুর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে পরিচিত ছিল 'বুড়ো' নামে। যাঁরা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন তাঁরা জানেন যে, প্রেমাঙ্কুরের চরিত্রে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল, যা অপরের মধ্যে দুর্লভ। একদিন গজেনদা-র বিবেকানন্দ রোডস্থ বাড়ীর আড্ডায় একটা ভারী মজার ঘটনা ঘটেছিল।

ঘটনাটা হল—গজেনদা-র আড্ডায় বহু লোক আসতেন—সাহিত্যিক, অ-সাহিত্যিক সবাই। কারণ, গজেনদার মেজাজটাও ছিল যেমন দিলদরিয়া, তাঁর আড্ডাও ছিল তেমনি সবার জন্য অবারিত। এই আড্ডায় একজন অবাঙালী ভদ্রলোক প্রায়ই আসতেন। তিনি এসে রোজই বাঙালীদের নানা বিষয়ে দোষ ধরতেন। বাঙালীরা এটা পারে না, বাঙালীরা ওটা জানে না ইত্যাদি! সব সময়ে তাঁর কথায় একটা বাঙালী-বিদ্বেষ ফুটে উঠত। যদিও এসব তিনি বলতেন ঠাট্টার ছলে, কিন্তু ক্রমাগত শুনতে শুনতে আমরা সবাই অস্বস্তি বোধ করতাম।

একদিন প্রেমাঙ্কুর বলল, আজ ব্যাটাকে জব্দ করতে হবে। আমাদের নিন্দে শুনতে শুনতে কানে তালা ধরে গেল।

আমরা সবাই উৎসুক হয়ে রইলুম—দেখি 'বুড়ো' কি কাণ্ড বাধায়।

যথারীতি সেদিনও সেই অবাঙালী ভদ্রলোক এলেন। এসেই শুরু করলেন ঃ বাঙালীরা এটা পারে না—বাঙালীরা ওটা পারে না—এইসব।

বুড়ো তখন তাকে চ্যালেঞ্জ করে বললে, কিন্তু বাঙালীরা যা পারে আপনি কি তা পারবেন ?

ভদ্রলোক তখন অবজ্ঞার ভঙ্গীতে জানালেন যে, বাঙালীরা যা পারে তিনি তা নিশ্চয়ই পারবেন।

তখন বুড়ো বললে ঃ বেশ, তাহলে বাজী হয়ে যাক।

ভদ্রলোক রাজী হয়ে পাঁচ টাকা বাজী ধরলেন।

প্রেমাঙ্কুর তখন কাপড় খুলে ফেলে মাথায় জড়িয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় বেরিয়ে খানিকটা ঘুরে এসে বললেন ঃ এইবার আপনি এইভাবে যান।

ভদ্রলোক লজ্জায় অধোবদন হয়ে স্বীকার করলেন যে, এ-কাজ অবশ্য তাঁর দ্বারা হবে না—বলে বাজীর পাঁচ টাকা দিয়ে দিলেন।

এরপর কিন্তু সে ভদ্রলোককে আমাদের আড্ডায় আর দেখা যায়নি।

ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে খুব ছেলেমানুষী বলে অনেকের মনে হলেও, আমি বলব যে, বাঙালীদের বিরুদ্ধে নিন্দায় অস্থির হয়ে মনের জ্বালা মেটাতেই এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন প্রেমাঙ্কুর। নয়তো শালীনতা বোধ ও রুচিজ্ঞান তাঁর একতিলও কম ছিল না।

গজেনদার এই আড্ডাতে কাজী নজরুল ইসলাম নিয়মিতভাবে আসতেন এবং শেষকালে আনন্দবাজার-সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারও আসতে আরম্ভ করেছিলেন।

যতদূর মনে পড়ছে হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় কলেজে পড়ার সময় থেকেই অর্থাৎ ১৯১১-১২ সালে। সেইসময় আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে 'জাহ্নবী' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করতে শুরু করেছি, এমন সময় তিনি আমাদের সম্পাদকগোষ্ঠীতে এসে যোগ দিলেন। প্রথমে এই পত্রিকা নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও পরে সুধাকৃষ্ণ বাগচি সম্পাদনা করতেন। অভিনয়, নৃত্য-গীত অর্থাৎ নাট্য-কলা ও আর্ট সম্বন্ধে হেমেন্দ্রবাবু তখন থেকেই লিখতে শুরু করেন। সাধারণত তিনি লিখতেন নানাবিধ প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি। তাঁর লেখা বেশীর ভাগ তখন 'মানসী' ইত্যাদিতে বেরুত। এমন সময় তাঁর ডাক পড়ল 'যমুনা'তে।

শরৎবাবু তখন 'যমুনা'য় লিখতে শুরু করেছেন। 'যমুনা'র খুব নামডাক। সাহিত্যিক মহলে এবং পাঠক মহলে 'যমুনা' তখন বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছে। হেমেন্দ্রবাবু এই সময়ে পুরোপুরিভাবে 'যমুনা'য় যোগ দিলেন। কিন্তু কিছুদিন কাজ করার পরই তাঁকে সেখান থেকে চলে আসতে হয়। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় যোগ দিলেন। আমি 'ভারতী'তে মণিলালের অনুরোধে পুরোপুরি যোগ দিতে পারলাম না। কারণ তখন আমি কলেজে পড়ি।

এরই মধ্যে হেমেন্দ্রকুমারের সাহিত্যিক হিসাবে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর দু'খানি বই ইতিমধ্যে প্রকাশত হয়েছে। একটি ছোটগল্পের, নাম 'পসরা', অপরটি কবিতার, নাম 'যৌবনের গান'।

এরপর ক্রমশ প্রকাশিত হয় বেনো জল, মধুপর্ক, ফুল-শয্যা, পায়ের ধুলো প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ।

'ভারতী'তে থাকাকালীন আমার সদ্য প্রকাশিত 'নাচঘরে'ও নিয়মিত লিখতে লাগলেন। এ ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। কিন্তু এঁর সাহিত্য-জীবনের মোড় ফিরে গেল যখন আমি 'মৌচাক' পত্রিকা বার করি। 'মৌচাকে'র লেখকগোষ্ঠীতে

তিনি যোগদান করে শিশু-সাহিত্যকে বহুবিধ রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুললেন। তাঁর প্রথম শিশু উপন্যাস 'যকের ধন' বাংলার শিশু-সাহিত্যে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করল। এই বইকে শুধু শিশু-সাহিত্যে নয় বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রেও একটি অবিস্মরণীয় অবদান বললে অত্যুক্তি হয় না।

এর পর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছোটদের লেখা নিয়েই তিনি কাটিয়ে দিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে এমন একটা সহজ, সুন্দর, সরলতা ও মাদকতা ছিল যা পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না। মূলতঃ তাঁর লেখাগুলি কিশোর-কিশোরীদের জন্যে হলেও বড়রাও তা থেকে সমান আনন্দ পেতেন। এইখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, আর এই শ্রেষ্ঠত্বের জন্যই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে 'মৌচাক' পুরস্কার পেয়েছিলেন।

ভারতীয় চিত্রশিল্প ও আর্টের প্রতি তাঁর অসাধারণ আগ্রহ ছিল। এইজন্য তিনি আর্ট সম্পর্কিত বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। থিয়েটার, সিনেমা ইত্যাদির প্রতিও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। কয়েকটি থিয়েটারে ও ছবির পর্দায় তিনি নৃত্যের পরিকল্পনা করে দিয়ে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি রেখে গেছেন। মঞ্চ ও চিত্রজগতের সমস্ত শিল্পীদের সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নৃত্যযাদুকর উদয়শঙ্কর—এঁরা ছিলেন হেমেন্দ্রকুমারের বিশিষ্ট বন্ধু।

গীতিকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল অসামান্য। শিশিরকুমার প্রযোজিত ও যোগেশ চৌধুরী রচিত বিখ্যাত 'সীতা' নাটকের 'অন্ধকারের অন্তরেতে' গানখানি তাঁরই রচনা। এ ছাড়াও তাঁর বহু গান রেডিও, গ্রামাফোন ও থিয়েটারে অত্যন্ত প্রশংসার সহিত গীত হয়েছে। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস 'পায়ের ধুলো', 'যকের ধন', 'তরুণী' চিত্রায়িত হয়েছে।

'নাচঘর' পত্রিকা আমি ছেড়ে দেবার পর দীর্ঘদিন তিনি এই

পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। এরপর 'দীপালী' সাপ্তাহিক পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন তিনি বেশ কিছুদিন।

তিনি যেমনি সৌখীন লোক ছিলেন, তেমনি মেজাজটিও ছিল তাঁর দিলদরিয়া।

হেমেন্দ্রকুমারের 'ওমর খৈয়ামে'র অনুবাদ আমরা প্রকাশ করি। এই পুস্তকখানির প্রকাশে আমাদের ব্যয় হয়েছিল প্রচুর। বিলেত থেকে বিখ্যাত চিত্রকর এডমাণ্ড ডুলাকের আঁকা ছবি ছাপিয়ে নিয়ে আসি—বাংলা পুস্তক-প্রকাশনা ক্ষেত্রে এতবড় দুঃসাহস এর আগে কেউ কখনও করেননি।

মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে গেছেন। এঁর মৃত্যুতে আমি হারিয়েছি একজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং শিশু-সাহিত্য হারিয়েছে তার একজন শ্রেষ্ঠ লেখককে।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়—এই নামটির সঙ্গে আজকের পাঠক-পাঠিকাদের খুব বেশী পরিচয় আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে এ রকম একটি বিচিত্র প্রাণচঞ্চল চরিত্রের সঙ্গে একবার পরিচয় হলে তা সহজে ভোলা যায় না। তাই দু' চার কথায় তাঁর সম্বন্ধে আমি সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

আমার যতদূর মনে পড়ে, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয় ১৯২২ সাল নাগাদ। ইনি ছিলেন আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ বন্ধু। সুরেশচন্দ্র 'জাপানে', 'চিত্রবহা', 'পোর্ট আর্থারের ক্ষুধা' প্রভৃতি লিখেছিলেন এবং অনুবাদক হিসাবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নানান টুকিটাকি শেখার জন্য সুরেশচন্দ্র যখন জাপানে যান, ধনগোপালের সঙ্গে সেখানেই তাঁর পরিচয়।

মনে আছে, একদিন আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়িয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মসজিদবাড়ী স্ট্রীটস্থ

বাড়ীতে মধ্যাহ্ন আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসি। সেইখানেই ধনগোপালের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তখন তিনি দীর্ঘদিন আমেরিকা প্রবাসের পর স্বদেশে ফিরেছেন। এই পরিচয়ের কিছুদিন পরেই সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

মাত্র আঠারো বছর বয়সে ১৯০৮ সালে ধনগোপাল জাপান যান শিল্পশিক্ষার জন্য। পরে সেখানে কোনরকম সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে সেখান থেকে আমেরিকায় গিয়ে বহু কষ্ট করে তাঁকে জীবনধারণ করতে হয়। বহু রকম কাজও তাঁকে করতে হয়েছিল সে সময়। যেমন গৃহস্থ বাড়ীতে বাসন মাজা, রান্না করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, খাবার পরিবেশন ইত্যাদি সাংসারিক কাজ থেকে শুরু করে বাগানের মালিগিরি বা শস্যক্ষেত্রে শস্য কাটা বা ফল তোলা পর্যন্ত।

এই সব কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে সময় করে নিয়ে তিনি ইংরাজী সাহিত্য পড়েন এবং তার প্রতি ধনগোপালের গভীর আকর্ষণ জন্মে। পরে তিনি এই ভাষায় নানারকম ছোটদের বই লিখতে আরম্ভ করেন। ১৯২৪ সালে আমেরিকার লাইব্রেরী সমিতির বিচারে শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য পুস্তকের রচয়িতা হিসাবে "গে-নেক" নামক বই লিখে শিশু সাহিত্যের জন্য বিখ্যাত Newbury প্রাইজ পান। এরপর আমেরিকায় শিশু-সাহিত্যে বই লিখে তিনি প্রভূত সম্মান অর্জন করেন। এঁর প্রসিদ্ধ বইগুলির মধ্যে নাম করা যেতে পারে Kari the Elephant, Jungle Beasts & Men, Hari—the jungle lad, My Brother's Face প্রভৃতি। আমাদের দেশের বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার, সাপুড়ে, বাজিকর, বোম্বেটে বা জলদস্যু, শিকারী প্রভৃতির অনেক আশ্চর্য গল্প প্রথম তিনখানি বই-এ আছে। বইগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন এ-দেশের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বাজার ও মেলা, রং-বেরংয়ের পোষাকে নানারকম মানুষ—সমস্তই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। বর্ণিত জায়গার শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি, তাদের গন্ধ যেন আশেপাশে বাতাসে ভাসছে। ছেলে-বুড়ো

সব চরিত্র যেন আমাদের কতকালের চেনা—এমান স্বাভাবিকভাবে চরিত্রগুলি সব চিত্রিত হয়েছে।

মিস মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া'র উত্তরে তিনি লেখেন 'A son of Mother India Answers'—এই বইখানি তাঁর সব বই থেকে বেশী বিক্রি হয়।

ছোটবড় সব পাঠকের জন্যই তিনি অনেকগুলি বই রচনা করে যশস্বী হন। তা ছাড়া আমেরিকার নানা শহরে তিনি আমাদের দেশের সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করে ভারতের নাম প্রচার করেন।

আমাদের প্রথম পরিচয়ের কিছুদিন পরে তিনি আবার আমেরিকায় চলে যান। তারপর আবার যখন তিনি ফিরে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় বেলুড় মঠে। আমার সঙ্গে সাহিত্যিক বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন। তিনি তখন রামকৃষ্ণ-দেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে On the face of Silence নামে একটি পুস্তকও লিখেছিলেন। এবার এসে তিনি সব সময় বেলুড় মঠেই থাকতেন। ধুতি পরতেন এবং সব সময় খালি পায়ে থাকতেন। বিবেকানন্দের মন্দিরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গার ধারে বসে আমাদের মধ্যে চলে বহু বিষয়ের আলোচনা।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নাম এখন অনেকেই ভুলে গেছেন। তাঁর 'চিত্রগ্রীব' 'যূথপতি' ও 'ঘরের ছেলে বাহিরে' বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে 'চিত্রগীব' (Gayneck) ও 'যূথপতি' (Chief of the Herd) নামে ধনগোপালবাবুর ছ'খানি বইয়ের অনুবাদ আমি প্রকাশ করেছি। ধনগোপালের একমাত্র পুত্র এখন আমেরিকায় থাকেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী যাদুগোপাল। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রাঁচীতে শেষপর্যন্ত অন্তরীণ রেখেছিলেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বর্তমানে বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় আমার বহু দিনের। আজ তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করে বাংলা ও বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করেছেন। এ পুরস্কারের মূল্য হল এক লক্ষ টাকা। প্রায় ওদেশের 'নোবেল' পুরস্কারের সমান। তবে যে বইখানির জন্য তিনি এই সম্মান লাভ করলেন, সেই 'গণদেবতা' অবশ্য প্রকাশিত হয়েছে অনেক বছর আগে।

আজ থেকে বহু বছর আগেকার কথা—যখন তারাশঙ্কর সবেমাত্র বাণীর দেউলে প্রবেশাধিকার লাভের ছাড়পত্র পেয়েছেন, সেই সময় একদিন কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের দোকানে এসে প্রবেশ করলেন তারাশঙ্কর। চেহারার মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যা লোককে আকৃষ্ট করবে। তবে আলাপ করার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম যে, লোকটি নিরহঙ্কার, সরল এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির দীপ্তিতে যে কোন অন্ধকারময় পরিবেশকে আলোকিত করতে পারে।

প্রাথমিক আলাপের পর তারাশঙ্কর আমায় তাঁর প্রথম 'চৈতালী ঘূর্ণি' এক কপি দিয়ে অনুরোধ করলেন যে, এইটি তাঁর প্রথম বই, নিজেই এর মুদ্রণব্যয় বহন করেছেন। যেহেতু তিনি নতুন লেখক, দেশের পাঠক সাধারণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এখনও তেমন হয় নি, সেই জন্য আমার দোকানে পুস্তক বিক্রয়ের একটা ব্যবস্থা করে দিতে। আমার রাজি না হওয়ার কোন কারণ ছিল না। সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে আমার দোকান থেকে তাঁর বই বিক্রির ব্যবস্থা করে দিলাম। এর অনেকদিন পরে—যখন তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন—তখন আমরা তাঁর একখানি বই প্রকাশ করি, তার নাম হল 'প্রসাদমালা'।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, ডাকহরকরা, বিপাশা, সন্দীপন পাঠশালা, সপ্তপদী, দুই পুরুষ, বিচারক, জলসাঘর, আরোগ্য নিকেতন,

কালিন্দী, নাগিনী কন্যার কাহিনী, ধাত্রীদেবতা, পঞ্চগ্রাম, মঞ্জুরী অপেরা প্রভৃতি। ধাপে ধাপে তিনি খ্যাতির শীর্ষদেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু চরিত্রমাধুর্যে এখনও তিনি সেই আগেকার তারাশঙ্করই আছেন।

মানুষকে তিনি যত ভালবাসেন, মানুষের সুখ-দুঃখকে তিনি যত নিবিড় করে দেখেছেন এবং বুঝেছেন, যে দরদ এবং সহানুভূতি দিয়ে সমাজের সেই সব অপাংক্তেয় লোকগুলিকে তিনি হৃদয়বৃত্তির দিক দিয়ে মহৎ করে তুলেছেন, তা শরৎবাবুর পর আর কোন লেখকের মধ্যে পাওয়া গেছে বলে আমার জানা নেই। যেসব গ্রামের চিত্র, যেসব মানুষের চিত্র, যেসব সমাজের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে, তা যেমন সত্য, তেমনি শাশ্বত, তেমনি জীবন্ত।

সম্প্রতি 'শনিবারের চিঠি'তে 'আমার কথা'য় আমার সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন তা উদ্ধৃত করে দিলাম।

> অনেক জনের অনেক কথাই কানে এসেছে। কিন্তু স্তব্ধই থেকেছি, একটি বাক্যও উচ্চারণ করি নি। কেবল একদিন শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকারকে (M. C. Sarkar) বলেছিলাম, ভয় করে সুধীরদা। ভয় করে, অতর্কিতে কোথায় মর্মান্তিক আঘাতে আহত হব। আঘাতও সহ্য হয়—কিন্তু আঘাত পেয়ে যদি প্রতিবাদ করি কি আঘাত ফিরিয়ে দিয়ে উঠি, মতিভ্রষ্ট হই তাহলে লজ্জার আর শেষ থাকবে না।
>
> কথাটা হয়েছিল শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবুর বাড়িতে। রাশিয়া থেকে দুজন লেখক এসেছিলেন। ইণ্ডো-সোভিয়েত মৈত্রী পরিষদের সভাপতি হিসেবে সুনীতিবাবু তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কথাটা হয়েছিল সেখানে।
>
> শ্রীযুক্ত সুধীরদা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, ভাল করেন ভাই—ভাল করেন। এই ভাল। আমরা কাজের জন্য

বের হই। বের হতে বাধ্য হই। এবং বাধ্য হয়ে শুনি। কি বলব? তবু বলি, বলি, না-না-না। এমনভাবে বলতে নেই। সৌভাগ্যের দিনগুলিই জীবনের সব নয়। সৌভাগ্যের অন্ত হয়—তার সঙ্গে সব সময়ে জীবনের অন্ত হয় না। আপনি ভালই করেন। তবু মাঝে মাঝে এলে সুখী হই। ভাল লাগে।

সাহিত্যক্ষেত্রে এই একটি মানুষ। জ্যেষ্ঠের উদারতা জ্যেষ্ঠের স্নেহ দিয়ে বসে আছেন এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্সের দোকানের সেই কোণের দিকে। মোটা পুরু লেন্সের চশমা পরে, নিবাতনিষ্কম্প একটি গিরিশৃঙ্গের মত ধ্যানমগ্ন। তাঁর এদিকে—পশ্চিম দিকে বসে আছেন শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য প্রেমেন্দ্র প্রবোধ থেকে প্রমথ গজেন্দ্র বিমল প্রভৃতিদের দু-তিনজন, অথবা আরও কয়েকজন। সামনে বসে আছে বিশু (বিশু মুখুজ্জে), তার পাশে কোনদিন থাকেন শ্রীযুক্ত তুষারবাবু অথবা আর কেউ। আগে থাকতেন শুভ্রকেশ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—কেদারদা। কথাবার্তার মধ্যে সুধীরদা স্তব্ধ—শুধু শুনেই যান। দরদী মানুষ। সত্যকারের জ্যেষ্ঠ। কে শ্রেষ্ঠ—এই নিয়ে যখন অন্যেরা অন্যের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করে যান, তখন তিনি মধ্যে মধ্যে বলেন, না-না-না। এইভাবে এমন করে বলতে নেই। না-না-না। না-না-না। এমন করে বললে ঠকতে হয়।

কোন তর্ক তকরারও তোলেন না। এই সুধীরদা।

সুধীরদা বাংলা-সাহিত্যের একটা কালে—১৯৪০ সন থেকে ১৯৬৭ সন পর্যন্ত নিঃসংশয়ে আমাদের জ্যেষ্ঠ।

তারাশঙ্করের লেখার ওপর তো আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছেই, সব থেকে ভালবাসি তারাশঙ্করকে মানুষ হিসেবে।

তিনি যখন আমাকে জ্যেষ্ঠ বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তখন আমিও সেই সুবাদে শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ দুই-ই জানাই—তিনি যেন শতায়ু হয়ে বঙ্গবাণীর ভাণ্ডার আরও পরিপুষ্ট করেন। তিনি আমার সাহিত্যিক পরিজন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনেক দুঃস্থ সাহিত্যিক পরিবারকে সাহায্য করেছিলেন।

স্বনামধন্য সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথ আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। রামানন্দবাবুর মৃত্যুর পর ইনিই 'প্রবাসী' ও 'মর্ডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা দু'খানির সম্পাদক হন। অফিসের কাজকর্ম সেরে প্রতিদিন বৈকালে আমার দোকানে এসে আসর জমিয়ে তুলতেন নানারকম গল্পগুজবে। সমগ্র বিশ্বের খবরাদিও যেমন তিনি রাখতেন, তেমনি অফুরন্ত ছিল তাঁর গল্পের ভাণ্ডার। লোকের সঙ্গে মিশতেন তিনি অত্যন্ত সরল এবং অনাড়ম্বরভাবে। তাঁর এই অমায়িক এবং নিরহঙ্কার ব্যবহারের দ্বারা তিনি প্রত্যেকেরই অন্তর জয় করেছিলেন। শিশু সাহিত্যে তাঁর অবদান বড় কম নয়। ছোটদের জন্যে বহু গল্প ও অন্যান্য অনেক বিষয়ও তিনি লিখেছেন। ছোটদের জন্য তাঁর প্রথম গল্প বেরোয় 'সন্দেশ'-এ, তারপর অনেক লেখা প্রকাশিত হয় 'মৌচাকে'। 'জগন্নাথ পণ্ডিত' ছদ্মনামে তিনি একটি বই-ও লিখেছিলেন। বইখানির নাম হল 'জগন্নাথের খেয়াল খাতা'। আর সেখানি আমরাই প্রকাশ করি। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি বি-এসসি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর আর একটি বিশেষ গুণ ছিল: তিনি খুব ভাল পাথর চিনতে পারতেন অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন উচুঁদরের জহুরী।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি—১৯১৯-২০ সাল থেকে। তরুণ বয়সে তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। প্রচুর পড়াশুনা করতেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ আর

মনটিও ছিল তাঁর অত্যন্ত কাব্যধর্মী। অনুবাদ সাহিত্যে এবং ছোটদের রচনায় তাঁর মত এমন মিষ্টিহাত খুব কম লেখকেরই ছিল।

তবে তাঁর একটি মারাত্মক নেশা ছিল—সেটি হল 'রেস' খেলা। নৃপেন্দ্রর সঙ্গে আমিও অনেকবার গিয়েছি রেসের মাঠে। কখনও সে জিতেছে কখনও হেরেছে। ফুলের প্রতি তাঁর একটা অসম্ভব আকর্ষণ ছিল। শেষজীবনে প্রায়ই দেখা গেছে রাত্রে যখন বাড়ী ফিরত, তখন তার হাতে একঝাড় রজনীগন্ধা কিংবা পদ্মফুলের গুচ্ছ। তার কথাবার্তা, সহাস্য মুখ আর অমায়িক ব্যবহারে সকলেই পরম প্রীতিলাভ করতো।

'মৌচাকে' প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় এবং বৎসরের প্রথম মাসে তিনি একটা করে প্রশস্তি লিখে দিতেন। আর সে-লেখাটা আমাদের সকলেরই খুব ভাল লাগত। এইটিই 'মৌচাকে'র কয়েক বৎসর ধরে একটি বিশেষত্ব ছিল। প্রত্যেক সাহিত্যিকই তাঁর এই প্রতিভায় মুগ্ধ না হয়ে পারতেন না।

'মৌচাকে'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ছোটদের জন্য শুধু যে তিনি 'মৌচাকে'ই লিখতেন, তা নয়। তবে আমার অনুরোধেই তিনি ছোটদের জন্যে নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। ছোটদের উপযোগী অনেক বইও লিখেছেন তিনি। তাঁর রচনাশৈলীর একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারা ছিল যা ছোট-বড় সকলেই মুগ্ধ করত।

পরিণত বয়সে তিনি চিত্র-নাট্য রচনায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তাঁর প্রথম চিত্রনাট্য হল 'কাশীনাথ', তারপর 'কবি কালিদাস' নামে একটি ছবিতে নাম-ভূমিকায় অভিনয়ও করেছিলেন তিনি। এরপর পরিচালক নীতিন বসুর সঙ্গে ইনি বোম্বাই যান এবং সেখানে 'বিচার' নামে একটি বাংলা ছবিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেন।

জয়ন্তী-মৌচাকে তিনি যা লিখেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম:

'মৌচাকে'র জন্মের সঙ্গে বাংলাদেশে সেদিন যে-সব ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল, তাদের বয়স আজ পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো···তারা আজ যুবক···

'মৌচাক'ও তাদের সঙ্গে সঙ্গে আজ পঁচিশ বছরে পড়লো···কিন্তু সে চির-কিশোর···এই পঁচিশ বছর ধরে সে বাংলার কিশোর-কিশোরীদের জন্য মধু সঞ্চয় করে এসেছে।

আজ যারা বাংলার ঘরে জন্মাচ্ছে, তারা আবার যখন পঁচিশ বছরে পড়বে, তারাও দেখবে পঞ্চাশ বছরের কিশোর সাথী তাদের জন্যে তেমনি মধু আহরণ করে চলেছে···

এমনি ধারা চলুক যুগে যুগে মৌচাকের মধু আহরণের মেলা, আজ কায়মনবাক্যে তাই প্রার্থনা করি··· ।"

কলকাতা রেডিওতে তাঁর অবদান কম নয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি গল্পদাদুর আসর পরিচালনা করে বাংলার ছেলে-মেয়েদের চিত্তজয় করেন।

'গল্পভারতী'র সম্পাদকরূপেও তিনি সাধারণ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

যে সমস্ত সুধী এবং সাহিত্যিকদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার আমার সুযোগ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে ইনি থাকতেন। ছোটগল্প লিখে সুধীন্দ্রনাথ প্রভূত যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেকালে। এঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের নাম হল 'কাশিমের মুরগী'। এঁরই পুত্র হলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শরৎবাবুর সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়, তখন সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর খুব প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। আমরা যখন সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম জোড়াসাঁকোর

বাড়ীতে, তখন সৌম্যেন্দ্রনাথ ছিল সুন্দর ফুটফুটে একটি কিশোর বালক। সবসময় সে থাকত খালি পায়ে—গান্ধীজির আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিল সে।

সৌম্যেন্দ্রনাথ যখন তরুণ বয়সে উপস্থিত হলেন, তখন তাকে বিপ্লবী দলের একজন সন্দেহ করে বৃটিশ সরকার রবীন্দ্রনাথকে বলেছিল—এ যদি এখন বিলেত চলে যায়, তাহলে এর বিরুদ্ধে কোন চার্জ আনা হবে না, নাহলে এ যে-রকম বিপ্লবে মেতে উঠেছে, তাতে একে কারারুদ্ধ করতে আমরা বাধ্য হব। ফলে সৌম্যেন্দ্রনাথকে বিলেত চলে যেতে হয়। সেখানেই তিনি পড়াশুনা করেন এবং Trotskite মতাবলম্বী হন।

সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বিনয়ী, নম্র—পাণ্ডিত্যে এবং ভদ্রতায় তুলনাহীন। তিনি ওকালতি পাশ করেন কিন্তু কোনদিন আদালতে প্র্যাকটিশ করেননি। কিছুদিন আগে এঁর একটা ছোট গল্পের সংগ্রহ 'চিত্রালী' বেরিয়েছে, আর সেটা আমরাই প্রকাশ করেছি। এ ছাড়াও তাঁর আরও কয়েকটি গল্পের বই আছে। চিত্ররেখা, বৈতানিক, করঙ্ক, প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' পত্রিকাখানির সম্পাদনাও করেছিলেন ইনি বেশ কিছুদিন।

এখানে আমি বিখ্যাত সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করছি। তাঁকে আমি মৌচাকে ছোটদের জন্য লেখাতে শুরু করি। 'মাঝির ছেলে' নামক বিখ্যাত ছেলেদের উপন্যাসটি তিনি ধারাবাহিকভাবে 'মৌচাকে' লিখিতে আরম্ভ করেন। এঁর কয়েকটি বইও আমরা প্রকাশ করেছি।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের নাম সাহিত্য-জগতে অতি সুপরিচিত। ছড়া, উপন্যাস, কবিতা, গল্প, ভ্রমণ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লেখাতেই এঁর অসীম পারদর্শিতা।

অধুনালুপ্ত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা'তে যখন অন্নদাশঙ্করের সেই অপূর্ব ভ্রমণ-কাহিনী 'পথে প্রবাসে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই তিনি শরৎচন্দ্রের মতো বাংলা সাহিত্য-জগতে উদিত হয়ে আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করেন। 'পথে প্রবাসে' লিখেই তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করলেন এবং সেই থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে নানাজাতীয় রচনায় বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছেন। এই সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ—সেই পরিচয় সর্বশেষ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে তাঁর 'পথে প্রবাসে' প্রকাশ করার পর থেকে।

আমার অনুরোধে শিশু-সাহিত্যেও তাঁর আগমন সার্থক হয়ে ওঠে নানাজাতীয় লেখার মাধ্যমে। তিনি 'মৌচাকে' ধারাবাহিকভাবে লেখেন আর একটি ভ্রমণ-কাহিনী 'ইউরোপের চিঠি' নাম দিয়ে এবং সে 'ইউরোপের চিঠি' যে প্রত্যেকটি শিশুর চিত্তকে জয় করেছে, এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পরে অবশ্য 'ইউরোপের চিঠি' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ছড়া রচনায় তিনি এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর ছড়াগুলি কৌতুক উদ্রেক করলেও গভীরভাবে বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে যে, তার মধ্যে অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক অব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত আছে। যেমন ধরুন তাঁর বিখ্যাত ছড়া—

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো !
তার বেলা ?

শোনা গিয়েছিল যে, এই ছড়াটি সরকার অনুমোদন করতেন না। কলকাতা আকাশবাণীতে এই গানটি নিষিদ্ধ তালিকায় প'ড়ে গিয়েছিল। যে-কোনো কারণেই হোক, নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই

তাঁকে সরকারী কাজ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। সেই থেকে এখন তিনি সাহিত্য-সেবাতেই সর্বক্ষণ আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত ছড়ার বই দু'খানির নাম হল 'ডালিম গাছে মৌ, ও 'রাঙা ধানের খই'।

'পথে প্রবাসে' ছাড়াও তাঁর আরও অনেক ভ্রমণ কাহিনী আছে। যেমন 'জাপানে' ও 'ফেরা'। 'ফেরা' হল পশ্চিম জার্মানী এবং ইউরোপের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। ভ্রমণ-কাহিনী রচনার মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তিনি অর্জন করেছেন তার স্বীকৃতি অবশ্য পেয়েছেন পাঠকদের কাছ থেকে। 'জাপানে'র জন্য তিনি সাহিত্য-আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেন। শিশু-সাহিত্যের জন্য তিনি 'মৌচাক' পুরস্কার পেয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে এপিকধর্মী উপন্যাস লেখার কৃতিত্ব তাঁর 'সত্যা-সত্য' উপন্যাসে দেখা গেছে। এই উপন্যাস তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

১৯২৫-২৬ সালের কথা। তাঁর প্রথম উপন্যাস হল 'অসমাপিকা'। সেটা আমরাই প্রকাশ করি। 'অসমাপিকা'র পাণ্ডুলিপি পড়ে আমার সেইকালেও এক জায়গায় মনে হল কিরকম যেন একটু ঠেকছে। অর্থাৎ কিনা একটু বেশী রকম উগ্রভাবে নর-নারীর সম্বন্ধটাকে দেখানো হয়েছে। তিনি তখন বহরমপুরের ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর সঙ্গে সেই সময় বহরমপুরে থাকতেন সেই সময়কার আর একজন ম্যাজিস্ট্রেট ডি. এল. মজুমদার। যিনি এখনও ভারত সরকারের কম্পানী ম্যানেজমেণ্ট-এ কাজ করছেন। আমি আর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত দুজনে মিলে গেলাম একদিন তাঁর কাছে বহরমপুরে। তাঁকে এ-বিষয়ে বলতেই তিনি সে-স্থানটা সামান্য সংশোধন করে একটু নরম করে দিয়েছিলেন।

এ-দেশে আই. সি. এস-এর প্রারম্ভিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে অন্নদাশঙ্কর বিলাতে যান শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে। সেখানে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে ভারতে দীর্ঘকাল সিভিল সার্ভিস পদ

অলংকৃত করে ভারত স্বাধীন হবার পরই চাকরীতে ইস্তফা দেন। এই পদত্যাগ করার কারণ যে কি, এ-বিষয়ে তাঁকে অবশ্য কোনদিন প্রশ্ন করিনি এবং তিনিও নিজে থেকে কিছু বলেননি।

প্রাবন্ধিক হিসেবে অন্নদাশঙ্করের স্থান বাংলাসাহিত্যে খুব উঁচুতে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির তিনি বিশেষ অনুরাগী এবং তাঁদের সম্পর্কে এঁর অনেক রচনাও আছে। ইংরাজীতেও এঁর অনেক লেখা আছে।

অন্নদাশঙ্করের সহধর্মিণী হলেন একজন আমেরিকান মহিলা। কিন্তু তিনি এমন চমৎকার বাংলা বলেন ও লিখতে পারেন যে, আর তাঁকে বিদেশী বলে মনেই হয় না। তিনি ভারতীয় নাম নিয়েছেন 'লীলা'। ইনি চমৎকার ইংরেজী লেখেন। বাংলা গল্পের ইংরেজী অনুবাদ Broken Bread নামে একটি বই বের করেছেন। এ বইটিও আমরা প্রকাশ করেছি।

লেখা সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্করের একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। তাঁর লেখা ইচ্ছে করলে বা অর্থ দিলেই পাওয়া যায় না। তিনি খুব বিচার-বিবেচনা করে সাহিত্য রচনা করেন—এ-বিষয়ে ইনি রাজশেখর বসু মহাশয়ের সমগোত্রীয়।

'লীলাময় রায়'—এই ছদ্মনামেও অন্নদাশঙ্কর অনেক রচনা লিখেছেন।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক ও বড় উকীল। তাঁর জ্ঞানের ও শিক্ষার পরিধি করা আমার মত লোকের পক্ষে অসম্ভব। তিনি প্রথমে কলকাতায় ওকালতী করতে সুরু করেন। তাঁর কিছু টাকা দরকার হওয়ায় আমি তাঁকে দু'শো টাকা দিই এবং তাঁর 'শুভা' বইটি প্রকাশ করি। সেকালের দৃষ্টিতে বইটি অশ্লীল বিবেচিত হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এইসঙ্গে আর একজন বড় উকীল ও সাহিত্যসেবী অতুলচন্দ্র গুপ্তের কথা আমার মনে পড়ছে। তিনি নানাভাবে এবং নানা বিষয়ে

আমাকে সাহায্য করেছেন। যখন আমি সাহিত্য-আসরের সূচনা করি তিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য তো করেনই এবং সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সাংবাদিক হিসেবে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নাম বিশ্ববিশ্রুত। বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এবং সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক ইনি তো বটেনই, তাছাড়া মহাত্মা শিশিরকুমারের পুত্র ইনি। এই কাগজ দুটি এবং 'যুগান্তর' পত্রিকার কর্ণধার হিসেবে বর্তমান সাংবাদিক-জগতে ইনি অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ আমার দোকানে। তাঁর আত্মীয় শচীবিলাস রায়চৌধুরীর সঙ্গে টাট্টু ঘোড়ার গাড়িতে আমার দোকানে একবার এসেছিলেন। অমৃতবাজারের গোলাপলাল ঘোষ একটি কাগজের দোকান করেছিলেন, ঘোষ অ্যাণ্ড কোম্পানী নামে। তাঁর পুত্র এই দোকান চালাতেন। সেই সময়ে শচীবিলাস রায়চৌধুরী এই কাগজের দোকানে কাজ করতেন এবং আমরা এই দোকান থেকে প্রচুর কাগজ কিনতাম। সেই সূত্রে তুষারবাবুর সঙ্গে আমার সৌহার্দ ও প্রীতির সম্পর্ক দীর্ঘদিনের, সেইজন্য তাঁর সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলা আমি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি।

তুষারবাবু এখনও মনেপ্রাণে তরুণ। তাঁর মনে এমন একটা শিশুসুলভ ভাব আছে যা আমার দৃষ্টি ও ভালবাসা বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে তিনি একজন সত্যিকারের শিশু-সাহিত্যিক। খুব অল্প সময়ের মধ্যে লোকজনকে তিনি এমন আপনার করে নিতে পারেন—এমনই একটা গুণ তাঁর মধ্যে আছে যা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়।

বই কেনা, বিশেষতঃ বাংলা বই তাঁর একটা বিশেষ ধরনের বাতিক। আর বই কেনার সময় প্রত্যেক বই তিনি তিন-চার কপি করে কেনেন। কারণ, এঁর তিন-চারটি স্থানে [তিন-চারটি লাইব্রেরী

আছে। বাস্তবিক তাঁর লাইব্রেরী বহু পুরাতন আমল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সবরকম পুস্তক ও পত্রিকায় ভরা। শিশু-মাসিক পত্রিকা ও পুস্তক ছাড়াও বড়োদের বই ও পত্রিকাও কম নেই। অর্থাৎ তুষার-বাবুর মত পুস্তক সংগ্রহ বর্তমানে আর কোনো ব্যক্তির আছে বলে আমার জানা নেই। এছাড়াও তাঁর সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া যাবে বটতলার বই, রহস্য-সিরিজ, রহস্য উপন্যাস প্রভৃতি। কারণ, রহস্য-উপন্যাসগুলির প্রতি এঁর দারুণ আকর্ষণ আছে। প্রিয়নাথ মুখো পাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস এবং পাঁচকড়ি দে ও দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্য উপন্যাস তিনি খুব পছন্দ করেন। এসব ছাড়া বিদেশ থেকেও তিনি বহু বই সংগ্রহ করে এনেছেন।

বই সংগ্রহ করেই শুধু তিনি নিশ্চিন্ত হন না, বেশীর ভাগ বই-ই তিনি পড়েন। তাঁর স্মরণশক্তিও আশ্চর্য এ-বিষয়ে আমি নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে যে-গল্প তিনি পড়েছেন, তা তিনি হুবহু বলে দিতে পারেন গল্পের চরিত্রগুলির নামসুদ্ধ। শুধু তাই নয়, কলকাতা থেকে এলাহবাদ পর্যন্ত সমস্ত স্টেশনের নামগুলি পর্যন্ত এঁর মুখস্থ।

তাঁর আর একটি বড়ো গুণ হল যে, আসর জমিয়ে তিনি চমৎকার বৈঠকী গল্প বলতে পারেন। এই সূত্রে তিনি দু'খানি গল্পের বই লিখেছেন। বই দুইখানির নাম হল 'বিচিত্র কাহিনী' এবং 'আরো বিচিত্র কাহিনী'। এই সচিত্র বই দুখানি পড়ে বড়রা এবং ছোটরা উভয় সম্প্রদায়ই প্রচুর আনন্দ পায়। এই বইয়ে শিকারের গল্প, মাছ ধরার গল্প, জীবজন্তুর গল্প, অশরীরী প্রেতাত্মার গল্প প্রচুর আছে। এইসব ধরনের গল্প তিনি চমৎকারভাবে বলতে পারেন এবং লিখতেও পারেন। তাছাড়া তুষারবাবু একজন ভ্রমণবিলাসী লোক—পৃথিবীর সর্বত্র তিনি বহুবার ঘুরেছেন—অর্থাৎ দেশ-ভ্রমণটাই যেন তাঁর নেশা।

তুষারবাবু সম্পর্কে আমার জীবনের আর একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করি। ১৯৫৮ সালে আমার স্ত্রীবিয়োগের এক বছর পরে ১৯৫৯ সালের ২রা আগষ্ট তুষারবাবু তাঁর বারাসাতের বাগান-বাড়িতে আমাকে সংবর্ধনা দেবার এক বিরাট ব্যবস্থা করেন। এখনও সে ঘটনার কথা স্মৃতিপথে উদয় হলে আমি অভিভূত হয়ে যাই। কলকাতার বহু বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা থেকে এইসব সাহিত্যিক ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের দশ মাইল দূরে 'শিশির কুঞ্জ' নামক তাঁর বারাসতের বাগান-বাড়িতে নিয়ে যাবার এবং পৌঁছে দেবার জন্যে কয়েকখানি গাড়ির ব্যবস্থাও করেন তুষারবাবু নিজেই। কেবলমাত্র তাই নয়, অনুষ্ঠানের পর সমবেত উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রায় একশো জনকে তিনি তাঁর বাড়িতে পাত পেড়ে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন। সে রাজসূয় আয়োজনের কথা, মাছ মাংস প্রভৃতির বিভিন্ন পদ ও মিষ্টান্নের কথা যাঁদের মনে আছে, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, এ ধরণের আয়োজন কদাচিৎ কোন অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে।

এই অনুষ্ঠানে সেদিন সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক ও সাহিত্যিক স্বর্গীয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। তুষারবাবু নিজে, তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত তরুণকান্তি ঘোষ ও পরিবারের সকলেই সমবেত অভ্যাগতদের বিশেষ সমাদর ও অভ্যর্থনা করেন। শ্রীযুক্ত তরুণকান্তি সে সময় পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন মন্ত্রী ছিলেন। এই সংবর্ধনা সভায় তুষারবাবু সহ বহুজন তাঁদের প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ বহুবিধ মূল্যবান উপহার দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেন। স্বনামধন্য মনীষী রাজশেখর বসু তাঁর স্বহস্তে প্রস্তুত কয়েকটি গন্ধদ্রব্যসহ একটি রৌপ্য পেটিকা আমাকে উপহার দেন। এই পেটিকার ডালায় তাঁর নিজের সহ আরও ছ'জন বন্ধুর স্বাক্ষর উৎকীর্ণ ছিল। সেদিনের এই সভায়

উপস্থিত সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আজকে যারা আমার আগেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁদের কথাই এই প্রসঙ্গে বেশী করে মনে পড়ছে। এঁরা হচ্ছেন—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, রাজশেখর বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, অবনীনাথ মিত্র, সজনীকান্ত দাস, অবিনাশ-চন্দ্র ঘোষাল ইত্যাদি।

এইখানে আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড, দেশ ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সুরেশচন্দ্র মজুমদারের কথা কিছু বলতে চাই। তাঁর সঙ্গে আমার এককালে খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁর প্রেস থেকে আমাদের অনেক বই ছাপা হত সেই সময়। তাঁর অফুরন্ত দান ছিল। কলকাতা কর্পোরেশনে একসময়ে তাঁর খুব প্রতিপত্তি ছিল। বুড়িবালামের বিপ্লবী বীর বাঘা যতীন সুরেশচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁকে নানাভাবে সুরেশচন্দ্র সাহায্য করেন। সুরেশচন্দ্রকে স্বদেশসেবার পুরস্কার স্বরূপ কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়। তিনি আমার বড় বৌদি সরলাবালা সরকারকে মাতৃভাবে সম্ভাষণ করতেন।

আমার যতদূর মনে আছে, তিনি বাংলাদেশে প্রথমে ইংরেজি ও বাংলা লাইনো মেশিন এনে কাজ সুরু করেন। পরে তিনি দিল্লীতে লোকসভার সভ্য হয়েছিলেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে আমি যখন মির্জাপুরের সিটি কলেজে আই-এ পড়ার জন্য ভর্তি হই, তখন অমল হোম ছিলেন আমার সহপাঠী। ক্রমশ তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ও বন্ধুত্ব বিশেষভাবে জন্মে যায় এবং অল্প দিনের মধ্যে আমার অত্যন্ত নিকট বন্ধুদের ভিতর তিনি একজন হয়ে ওঠেন। এই সময় সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বনামধন্য হেরম্বচন্দ্র মৈত্র আর আমাদের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়—যিনি পরে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল

হয়েছিলেন। ছাত্রজীবনে অমল হোম পড়াশুনায় বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি বটে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসাবে দেশব্যাপী প্রচুর নাম করেছিলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক কালীনাথ রায় মহাশয় কারাবরণ করার পর তরুণ অমল হোম উক্ত পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন এবং সেই থেকে সাংবাদিক জগতে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের আনুকূল্যে এলাহাবাদের জওহরলালের Independent কাগজের সঙ্গে যুক্ত হন। সেইসূত্রে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। এইসব কাজকর্মের ফলে তিনি দেশবন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তাঁকে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদনা ভার দেন এবং দীর্ঘদিন ধরে সুখ্যাতির সঙ্গে এই 'গেজেটে'র সম্পাদনা করেন। তারপর তিনি সরকারী প্রচার বিভাগের কর্মকর্তা হন, পরে ডি. ভি. সি-র প্রচার বিভাগের অধিকর্তার পদ গ্রহণ করেন।

ইনি রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘসান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। ভারতের বহু বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে অমলচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল। এককালে তিনি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে খুব মিশতেন। তাঁরই চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর একখানি ছোট উপন্যাস আমাদের প্রকাশ করতে দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে সেটা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অমল হোম লিখিল একখানি বই আমরা প্রকাশ করি। বইটির নাম 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ'।

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষপূর্তিতে কলকাতা টাউন হলে ১৯৩১ সালে যে সপ্তাহব্যাপী বিপুল রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা'তে অমলচন্দ্র বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং সেই সময় কলকাতা মিউ-নিসিপ্যাল গেজেটের একটি বিশেষ সচিত্র সংখ্যা প্রকাশ ক'রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর পড়াশুনা ছিল এবং বিশেষ করে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অসাধারণ। এরকম একজন সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিক ব্যক্তির সঙ্গে যে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে সেকথা ভেবে আমি গর্ব অনুভব করছি।

এখন অমল অসুস্থ অবস্থায় শয্যাগত হয়ে আছেন। আমরা তাঁর রোগ নিরাময় প্রার্থনা করি।

১৯১২-১৩ সালে যখন আমি রিপণ কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজে) বি-এ পড়ি তখন থেকেই প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ। সেই আলাপ পরে এত গভীর হয় যে, আমরা যুক্তভাবে অনেক লেখা লিখি, আর তা 'ভারতবর্ষে' ছাপা হোত।

বি-এ পরীক্ষার জন্য যখন আমি প্রস্তুত হচ্ছি, প্রভাতচন্দ্রও সে সময়ে আমার বাড়িতে এসে একত্রে পড়াশুনা করত।

আমি যখন 'যমুনা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলাম—তখন প্রভাতচন্দ্রও ওখানে প্রায়ই আসত। শরৎবাবু যখন হাওড়ায় থাকতেন তখন আমি আর প্রভাত দুজনে মিলে একসঙ্গে যেতাম শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য কপি আনতে।

এঁর পিতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তৎকালীন নানা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এঁর মা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় হলেন প্রথম বাঙালী মহিলা যিনি বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করে এসে এদেশে নিয়মিত প্র্যাকটিস করেন। এঁর ভগিনী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী এবং তিনি নিজেও স্বদেশী আন্দোলনে কয়েকবার কারাবরণ করেন। বর্তমানে ইনি 'জনসেবক' পত্রিকার সম্পাদক।

প্রভাতচন্দ্রের বয়স বর্তমানে প্রায় আশী বৎসর, কিন্তু এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কর্মক্ষমতা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

ইনি হলেন একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম—এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ইনি 'জংলী' নামে বিশেষভাবে পরিচিত।

শ্রীহুমায়ুন কবির ১৯২০-২১ সালে যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র তখন থেকেই তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবা করে আসছেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর প্রথম কবিতার বই 'স্বপ্নসাধ' বের হয়। এই পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। আমিই সে পুস্তক প্রকাশ করি।

এখানকার পড়াশুনা শেষ করে তিনি বিলাত চলে যান উচ্চ শিক্ষার জন্য। সেখানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালভাবে পরীক্ষায় পাশ করে পরে বহু সম্মান লাভ করেন। সেই থেকে শ্রীকবিরের সঙ্গে আমার প্রীতি ও সৌহার্দ আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

বিলাতে থাকার সময় 'মৌচাকে' তিনি ধারাবাহিকভাবে কয়েক মাস ধরে অক্সফোর্ডের চিঠি নাম দিয়ে ওদেশের কথা লিখতেন। সে রচনাগুলি সাহিত্যিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে ছোটদের মহলে এগুলি খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল।

তারপর বিলাত থেকে ফিরে এসে নানা শিক্ষায়তনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি স্বর্গত আবুল কালাম আজাদের শিক্ষাদপ্তরে উচ্চ কর্মচারী হয়ে নতুন কর্মজীবন শুরু করলেন। তিনি দশ বৎসর ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। এর পর কামরাজ পরিকল্পনাধীন হয়ে তিনি কিছু দিন তৈলমন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু দিন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়।

ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস'-এর বাংলা সংস্করণ আমরাই প্রকাশ করি শ্রীকবিরের সাহায্যে।

এ ছাড়াও শ্রীকবিরের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্বন্ধ যে কত গভীর তার প্রমাণ হল ১৯৫৭ সালে All India Writers Conference-এর কোষাধ্যক্ষের গুরুভারটিও তিনি আমার ওপর চাপিয়ে দেন। আমিও সে দায়িত্ব ভালভাবেই পালন করেছিলাম—কনফারেন্সের শেষে সব খরচ-খরচা বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত ছিল প্রায় সাত হাজার টাকা—



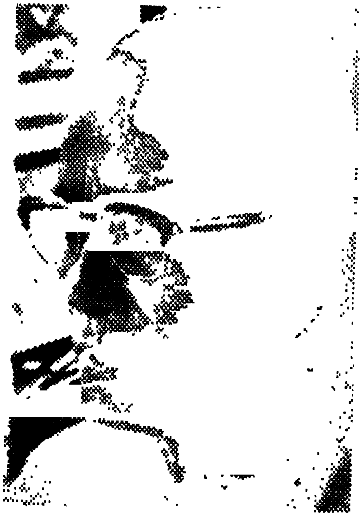
সুরেশচন্দ্র মজুমদার



আচার্য যদুনাথ সরকার



কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়



তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়,
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
[১৯১০ সালে গৃহীত ছবি]



অমল হোম



চারু রায়

এতদিন সে টাকাটা আমার কাছেই ছিল। সম্প্রতি সেই টাকাটা বাড়িয়ে প্রায় দশ হাজার টাকা করে বর্তমান কোষাধ্যক্ষ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের হাতে তুলে দিয়েছি।

শ্রীকবির একজন সত্যিকারের সাহিত্যিক। তাঁর লেখা অনেকগুলি বাংলা বই আছে। তার মধ্যে কয়েকখানি বইয়ের প্রকাশক আমরাই। বাংলা দেশের খ্যাতনামা ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'চতুরঙ্গ' সম্পাদনা করে আসছেন তিনি দীর্ঘ দিন ধরে। বর্তমানে শুনতে পাই 'নাউ' নামক ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি যে একজন নির্ভীক পুরুষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময় তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ভারতের সর্বত্র রবীন্দ্র উৎসব বিশেষভাবে পালিত হয়।

দীর্ঘদিন কংগ্রেসের সেবা করে আদর্শগত মতভেদের জন্য তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করে বর্তমানে বাংলা কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সভ্য। এরপর নানা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন।

এইখানে আমি বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক শ্রীনিরোদচন্দ্র চৌধুরীর কথা বলতে চাই। তিনি সজনীকান্ত দাস, যোগানন্দ দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি একত্রে 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশ করেন। পরে কলকাতা এবং দিল্লী বেতার কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ সম্পর্কে ভাষণ দিতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরাজদের অবস্থা যখন খুবই খারাপ সেই সময় তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে ইংরাজরা যুদ্ধে জয়ী হবে এবং তাই ঘটেছিল। Autobiography of an Unknown Indian বইটি লিখে দেশে ও বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি আজীবন সাহিত্য সেবা ও স্বদেশ সেবা করে এসেছেন তাঁর কথা আমি এখানে আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করছি। এঁর কাকা ছিলেন এস. বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি আই-সি-এস ক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। প্রভাতমোহনের বড় ভাই অবনী-মোহন আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। প্রভাতমোহন স্বদেশী আন্দোলনে যোগ

দিয়েছিলেন এবং কারাবরণও করেছিলেন। কারাগারে অবস্থান কালে তাঁর রচিত একটি কবিতার বই বিখ্যাত হয়ে আছে। এই বইটি বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। চিত্রশিল্পেও এঁর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। ছোটদের জন্যে ইনি খুব সুন্দর লিখতে পারেন এবং 'মৌচাকে' এখনও নিয়মিত লেখেন। ইনি 'বিশ্বভারতী'র সঙ্গে একসময় জড়িত ছিলেন।

কবি নরেন্দ্র দেবের নাম কে না জানে বাংলা দেশে? আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে তিনি একজন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় 'ভারতী'র আসরে ১৯১৩ সালে। সেই পরিচয় ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হতে হতে অন্তরঙ্গতায় ভরে ওঠে। আর আজ এই দীর্ঘ চুয়ান্ন বৎসরের ব্যবধানেও তা এতটুকু ম্লান হয় নি। 'মৌচাকে'র প্রথম অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর নানান ধরনের হাসির কবিতা, প্রবন্ধ, ধাঁধা ও অন্যান্য রচনা 'মৌচাকে'র পাঠক-পাঠিকাদের আনন্দ পরিবেশন করেছে। বৎসরের শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে 'মৌচাকে'র তরফ থেকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দিয়ে তাঁর প্রতিভার সম্মান করা হয়েছে।

তাঁর কৃত 'ওমর খৈয়ামে'র অনুবাদ বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট অবদান। এছাড়া 'মেঘদূত' এর অনুবাদ এবং মৌলিক গল্প-উপন্যাসও তিনি রচনা করেছেন। বহুদিন 'পাঠশালা' নামক একটি শিশু-পত্রিকা সম্পাদনা করেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী রাধারাণী দেবীও বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন দখল করে আছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে সমানে কাব্য চর্চা করার জন্য 'কবি দম্পতি' বলতে এঁদের দুজনকেই বোঝায়।

রাধারাণী দেবীর সঙ্গে নরেন্দ্রর তখনও বিবাহ হয় নি—সেই সময় তাঁদের যুগ্ম-সম্পাদনায় বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্য-সঙ্কলন 'কাব্য-দীপালী' প্রকাশিত হয়। সে সঙ্কলনটি আমি প্রকাশ করি। তার কিছুদিন পরেই তাঁদের বিবাহ হয়।

নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে রাধারাণী দেবীর বিবাহ হয় ১৯৩১ সালের

৩১শে মে। সেই বিবাহে আমি, আমার স্ত্রী সুলেখা, চারু, চারুর স্ত্রী মায়া এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিল। বিবাহ কলিকাতার কাছে লিলুয়াতে 'দেবালয়ে' অনুষ্ঠিত হয়।

রাধারাণী দেবী 'অপরাজিতা দেবী' ছদ্ম নামে প্রেমের কবিতা লিখতেন। 'আঙ্গিনায় ফুল', 'বুকের বীণা' প্রভৃতি বইগুলি অপরাজিতা দেবী নামেই প্রকাশিত হয়। রাধারাণী দেবীর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ-গুলির নাম হল 'সীথিমৌর', 'লীলাকমল' প্রভৃতি।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নানা ধরনের বই লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। শিশু-সাহিত্যেও এঁদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একমাত্র কন্যা নবনীতাকে সঙ্গে নিয়ে একবার এঁরা ইউরোপ ভ্রমণ করে এসেছেন। এঁরা মনে-প্রাণে কবি—তাই বাড়ীটির নামও দিয়েছেন 'ভালোবাসা'। এই বৃদ্ধ বয়সেও নরেন্দ্র দেবের সাহিত্যসাধনার কর্মতৎপরতা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাঁর লেখনী এখনও সমানে চলেছে।

আগেকার দিনে আমাদের দোকানের আড্ডা থেকে যে জনা-ছয়েক এক সঙ্গে বহু দেশ ভ্রমণ করেছি তার মধ্যে নরেন্দ্র দেবও একজন। সেই ভ্রমণের দলটির মধ্যে নরেন্দ্র ছাড়া থাকতেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চারু রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, অমর দেব ও আমি।

কুস্তিগীর যে শিল্পী হতে পারে এর প্রমাণ শুধু বাংলা দেশে আমরা একটি লোকের জীবনেই পেয়েছি। তিনি শুধু কুস্তিগীর নন, তিনি শিকারী, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, বংশীবাদক। হ্যাঁ, আমি বলছি দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কথা।

চিত্রশিল্পী দেবীপ্রসাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব দীর্ঘ দিনের—সেই ১৯২০ সাল থেকে। এই সাতচল্লিশ বছরের ব্যবধানেও সেই বন্ধুত্বের মধ্যে এতটুকু চিড় খায়নি। পার্ক স্ট্রীটের মুখে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তি, যা আমরা প্রতিদিন যাতায়াতের পথে দেখি, তা তাঁরই সৃষ্টি। পাটনা

শহরে শহীদদের যে মূর্তি তিনি সৃষ্টি করেছেন তাতে তিনি চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সম্প্রতি তিনি দিল্লী লালকেল্লার সম্মুখে কয়েকটি প্রতিমূর্তিসম্বলিত ভাস্কর্যের কাজে নিযুক্ত আছেন।

শুধু যে ভাস্কর্যের মাধ্যমেই তিনি বিশ্ববিশ্রুত হয়েছেন তা নয়, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। তাঁর কয়েকটি পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। মাদ্রাজে শিল্প মহাবিদ্যালয়ের তিনি অধ্যক্ষ এবং দিল্লীর ললিতকলা আকাদমীর সভাপতি ছিলেন। তাঁর এই শিল্প-প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ বৃটিশ ও বর্তমান সরকারের কাছে তিনি বহু সম্মানের অধিকারী হয়েছেন।

বহু চিত্র তিনি আমাকে এঁকে দিয়েছেন এবং তাঁর বহু লেখাও 'মৌচাকে' প্রকাশিত হয়েছে।

এরকম একজন দিলখোলা মেজাজী লোক খুব কমই দেখা যায়।

এই সঙ্গে আর একজন আবাল্য সুহৃদের কথা আমার মনে পড়ছে। তিনি হলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও চিত্র-পরিচালক চারু রায়। চারুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯১১-১২ সালে, যখন আমি রিপন কলেজে পড়ি। সেও পড়ত একই কলেজে অবশ্য অন্য শাখায়। ছোটবেলা থেকেই তার ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক। তার প্রথম ছবি প্রকাশিত হয় 'জাহ্নবী' পত্রিকায়। 'জাহ্নবী'র প্রচ্ছদপটটি ছিল তারই আঁকা। সে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং তার সব ছবিই ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা। কিন্তু তার শিল্পী হিসেবে খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে কমার্শিয়াল আর্টের মাধ্যমে।

চারু প্রথমে ভাল চাকরী করত বার্ড কোম্পানীতে। কিন্তু শিল্প-সৃষ্টির মোহ তাকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে সে অমন সুন্দর চাকরীর মায়া পরিত্যাগ করে এই চিত্রশিল্পকেই নিজের পেশা হিসাব গ্রহণ করল। পুস্তকের প্রচ্ছদপট, সিল্ক প্রিন্টিং, স্টেজ ক্র্যাফট, পোস্টার ডিজাইন প্রভৃতির চর্চাতেই নিজেকে নিয়োজিত করল এবং বলতে

বাধা নেই, আর্টের এই সব শাখায় বাংলা দেশে চারুই পথিকৃৎ। তখনকার দিনে যতীন্দ্রকুমার সেন বেঙ্গল কেমিক্যালের সমস্ত প্রচার-চিত্র আঁকতেন, তিনি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর শিল্পবিভাগের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। আর যতীন্দ্রকুমার ছাড়া চারুই ছিল অন্যতম শিল্পী যে কমার্শিয়াল আর্টের সব বিভাগেই নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল।

মাসিক পত্রিকা ও পুস্তকের প্রচ্ছদ আঁকতে চারুর জুড়ি ছিল না কেউ সে সময়। এর পর এই শিল্পকলার চর্চা ছেড়ে দিয়ে সে চলচ্চিত্রের দিকে মন সংযোগ করে। বিখ্যাত চিত্রনির্মাতা হিমাংশু রায়ের সঙ্গে চারু 'সিরাজ', 'লাইট অব এশিয়া', 'থ্রো অব এ ডাইস' প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করে এবং শিল্পনির্দেশক হিসাবেও কাজ করে। এই সব ছবির পরিচালক ছিলেন ফ্রাঞ্জ অস্টেন নামক একজন জার্মান সাহেব। হিমাংশু রায় এক দল জার্মান কলাকুশলী ও জার্মান শিল্পপতিদের অর্থ নিয়ে উপরোক্ত ছবিগুলি ভারতে নির্মাণ করেন। শিল্পীরা অবশ্য ছিলেন সবাই ভারতীয়। হিমাংশু রায় অবশ্য পরে বম্বে টকীজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এইখানেই চারুর সিনেমায় প্রথম হাতেখড়ি হয় এবং বিদেশী টেকনিসিয়ানদের অধীনে থেকে সিনেমার 'টেকনিক'টি ভালভাবেই আয়ত্ত করে। পরে সে নির্বাক ও সবাক অনেকগুলি চিত্র নির্মাণ করে খ্যাতি লাভ করে।

১৯২৯ সালে সে প্রথম চিত্র পরিচালনা করে—ছবিটির নাম হল Loves of a Moghul Prince। এটি তোলা হয় লাহোরে। এতে দেখলাম তার কি সাংঘাতিক দুঃসাহস। তার স্ত্রী মায়াকে এই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের সে সুযোগ দেয়। শ্রীমতী রায়ই হলেন প্রথম বাঙালী শিক্ষিতা অভিজাত বংশীয় মহিলা যিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন।

তারপরে চারু আরও অনেক ছবি পরিচালনা করে, যেমন

চোরকাঁটা, পথিক, সরলা, ডাকু-কা-লেড়কা, বাঙ্গালী, রাজনটী বসন্ত-সেনা প্রভৃতি। এখন অবশ্য চিত্র-পরিচালনা আর না করলেও শিল্প-নির্দেশনার কাজ সেদিন পর্যন্ত করেছে। তবে এটা ঠিক যে, চিত্র-পরিচালনার আশা সে এখনও মনে মনে পোষণ করে।

সঙ্গী হিসাবে বা আসর জমিয়ে রাখতে চারুর জুড়ি মেলা ভার। নানা ধরণের গল্প-গুজবে অর্থাৎ যাকে সাধারণ বাংলায় বলে আড্ডা দেওয়া—এই ব্যাপারে চারু হল একটি বিরাট আকর্ষণ।

এই আড্ডার কথা বলতে গিয়ে আমার কয়েকটি পুরনো আড্ডার কথা মনে পড়ছে। সেই সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

আড্ডার কথা উঠলেই যাঁরা ভাবেন তাসের আড্ডা বা গাঁজার আড্ডা বা কর্মহীন বেকার লোকদের বাড়ীর রকে বসে দুনিয়ার রাজা-উজীর মারা—আমি সে রকম আড্ডার কথা বলছি না। এই আড্ডা পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। তবে দেশভেদে রুচিভেদে আড্ডার রকমফের আছে। যেমন আধুনিক সমাজে ক্লাব, ককটেল, ডিনার পার্টি ইত্যাদি তেমনি আড্ডার মুখ্য উদ্দেশ্য একই।

সমস্ত দিন মানুষ মুখ বুজে কাজ করে যেতে পারে না—সে চায় মাঝেমাঝে প্রাণ খুলে হাসতে ও মন খুলে কথা বলতে। তাই সমবয়সী ও সমগোত্রীয় লোকেরা একত্র হলে বল্গামুক্ত অশ্বের মত তারা ছুটে যেতে চায়। সে আনন্দ থেকে যারা বঞ্চিত তারা বেঁচে থাকার আসল আনন্দই উপভোগ করতে পারে না।

সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা আগে দেখেছি, সাহিত্যিকরা সব একত্র হয়ে নানা ধরনের আলাপ-আলোচনার দ্বারা বেশ ভাল রকম আড্ডা জমাতেন। এ না হলে বোধ করি সাহিত্যের প্রসার ভাল করে হয় না—প্রকৃত সাহিত্যও প্রস্ফুটিত হতে পারে না। এই আড্ডায় যোগ দিয়ে তার রস উপভোগ করা আমার জীবনের একটা অপরিহার্য অংশ।

এই সব আড্ডাধারীরা সাহিত্যিক তো ছিলেনই, তাছাড়া ছিলেন সুরসিক, সঙ্গীত-প্রিয় আর হাসি-গল্পের প্রকৃত সমজদার। নানান দিকে নানা বিষয়ে এঁদের ঝোঁকও ছিল।

পূর্বে বাঙালীর সাধারণ জীবনে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বা বুড়ো শিবতলার অশ্বত্থ গাছের নীচে কিংবা অমুকের বৈঠকখানা বাড়ীতে সকলে সমবেত হয়ে পারস্পরিক নানা বিষয়ের চর্চা হত। এর মধ্যে পরনিন্দা, পরচর্চাই প্রধান ছিল এবং সেইটেই উপভোগ করার জন্য লোকে স্নানাহার ত্যাগ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই চণ্ডীমণ্ডপে বসে থাকত। সে-সব দিন বর্তমানে গত হয়েছে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলকাতাতেও বাঙালীদের এই ধরনের এক রকম আড্ডার প্রচলন হয়েছিল। সেটা হল বাগান-বাড়ীর আড্ডা। সেটা ছিল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সুরা আর নারী-ঘটিত ব্যাপার। ধনী বা হাতে কাঁচা পয়সা ছিল যাঁদের তাঁরাই এই ব্যাপারে সব থেকে বেশী জড়িয়ে থাকতেন তাঁদের মোসাহেবদের নিয়ে। আমি অবশ্য সে সব আড্ডার কথাও বলছি না। আমি বলব নিছক সাহিত্যিকদের আড্ডার কথা। এ সব আড্ডায় নোংরামি ছিল না, ছিল অনাবিল আনন্দ এবং জ্ঞানী ও গুণীদের সমাবেশে তৈরী হত বহু বিরাট সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা। এই ধরনের আড্ডার প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে আজকের জীবন-সংগ্রামের নিষ্পেষণে নানা ধরণের ইউনিয়ন, রাজনীতিক সংস্থা সত্ত্বেও আজও আমাদের সাহিত্যিক আড্ডা বেঁচে আছে মরা নদীর মত।

তখনকার দিনে তরুণ বয়সে আমি যে সাহিত্যিকদের আড্ডায় প্রথম যোগ দিই সেটা হল 'যমুনা' কার্যালয়ের আড্ডা। এখানে নিয়মিত আসতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্র-কুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, 'যমুনা' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, চারু রায় প্রভৃতি। প্রভাত ও চারু ছাড়া

আজ সবাই গত হয়েছেন। এখানে সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে সব রকম বিষয়েই আলোচনা হত। সেই সময় বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগ চলছে—সে আলোচনাও আমাদের বাদ পড়ত না।

বিশেষ যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আমরা প্রায়ই আলোচনা করতম তা হলো—স্বর্গীয় ডি. এল. রায়ের রবীন্দ্রনাথের উপর বিরূপ ভাব পোষণ, 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রের জন্ম ও প্রকাশ, সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়, স্টার থিয়েটারে ডি. এল. রায়ের 'আনন্দ-বিদায়ে'র অভিনয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ হওয়া, 'স্নেহলতা'র পুড়ে মরা প্রভৃতি। এ ছাড়াও ভোজশেষে চাটনীর মত নারীসংক্রান্ত আলোচনাও যে না হত, তা নয়।

এই সময় রবীন্দ্রবিরোধী একটি দল গড়ে উঠেছিল। সব সময় তাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। সে সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কাগজ 'নারায়ণ' পত্রিকাতে ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ-সমালোচনা দেখা যেত। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুরাগীরা এ বিষয়ে যথেষ্ট উষ্মা প্রকাশ করতেন। ১৯১৩ সালে তিনি যখন 'নোবেল প্রাইজ' পান তখন বিশেষ ট্রেন যোগে এক দল সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানাতে শান্তি-নিকেতনে গিয়েছিলেন।

এই দলের পুরোভাগে ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সে অভিনন্দনের উত্তরে বলে-ছিলেন: আপনাদের এই সম্মান-মদিরা গ্রহণ করলাম, কিন্তু পান করব না।

এই উক্তিতে সকলেই অপমানিতবোধ করেন।

ডি. এল. রায় বরাবরই রবীন্দ্র-বিরোধী। তিনি এক শ্লেষাত্মক নাটক লিখলেন—'আনন্দ-বিদায়', নন্দ বিদায়ের অনুকরণে। মূল

উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথকে হেয় প্রতিপন্ন করা। কিন্তু সে অভিনয় হয় মাত্র এক রজনী—প্রথম রজনীই হল শেষ রজনী। রবীন্দ্রভক্তের দল এই নাটকাভিনয়ের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই 'স্টারে'র কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করে দেন। এই আন্দোলনের একটি প্রধান ভূমিকা নেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সময় পাবনায় উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হয়। সভাপতি হন নাটোরের মহারাজা সুসাহিত্যিক জগদিন্দ্রনাথ রায়। রবীন্দ্রনাথ এলেন শিলাইদহ থেকে। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণ পাঠ করেন। আমি, মণিলাল, ফণীন্দ্র পাল, হেমেন্দ্রকুমার রায় সব এক সঙ্গে সে সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে সেই দ্বিতীয়বার দেখলাম। তাঁর কাছ থেকে ভাষণটির অনুলেখনের পর 'যমুনা'য় ছাপিয়ে দিলাম।

তারপর এল 'ভারতী'র আড্ডা ১৯১৩-১৪ সালে। একদিন আমি ও হেমেন্দ্রকুমার সুকিয়া স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় রাস্তায় দেখা হয়ে গেল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি আমাদের সুখবর দিলেন যে, তিনি ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি 'ভারতী'র সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেছেন। আমরা দুজনে যেন 'ভারতী'কে সব রকমে সাহায্য করি। সেই থেকে হেমেন্দ্রকুমার পুরোপুরি 'ভারতী'র একজন স্থায়ী লেখক হয়ে গেলেন। আমি তখনও কলেজের ছাত্র বলে পুরোপুরি সে দিকে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলাম না। ক্রমে ক্রমে আমাদের 'যমুনা' অফিসের সাহিত্যিক আড্ডাটি 'ভারতী' অফিসে স্থানান্তরিত হল এবং আমিও ছাত্রাবস্থা সত্ত্বেও 'ভারতী'র দলের একজন সভ্য বলে পরিগণিত হলাম।

সুকিয়া স্ট্রীটে 'ভারতী' অফিসের পুরনো আড্ডার সঙ্গে সে সময়ের সব সাহিত্যিকই মোটামুটি পরিচিত ছিলেন। সকাল ও সন্ধ্যা দুবেলাই এই অফিসে আড্ডা বসত। বিকাল থেকে রাত নটা দশটা পর্যন্ত আসর

সরগরম থাকত, এবং রাত্রিবেলাতেই আসর জমত বেশী। রবিবার প্রায় সমস্ত দিনই আড্ডাধারীরা নানা রকম আলাপ-আলোচনায় আসর জমিয়ে রাখতেন। অনেকদিন খাওয়া-দাওয়া ঐখানেই হত। 'ভারতী'তে নিয়মিত আসতেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, গিরিজাকুমার বসু, চারু রায়, মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী এঁরাও মধ্যে মধ্যে আসতেন। সাহিত্যরসিক আরও অনেকে আসতেন এখানে।

আমার বেশ মনে আছে—আমাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসতেন চেয়ারের ওপর আসন-পিঁড়ি হয়ে। তিনি রমা রঁলার জঁ৷ ক্রিস্তফ পড়ে সেখানে সমবেত লোকদের শোনাতেন। কখনও নিজের লেখাও পড়তেন। সকালে অবশ্য কোন দিন আমার যাওয়া সম্ভব হত না। সন্ধ্যার সময় রোজই যেতাম। এই 'ভারতী' অফিসে প্রায়ই প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হত—কখনও চপ-কাটলেট, কখনও মুড়ি ফুলুরী কখনও বা সন্দেশ-রসগোল্লা।

সাহিত্যক্ষেত্রে 'ভারতী'র আড্ডার একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। তখনকার দিনের বড় বড় সাহিত্যিকদের একটি মিলনকেন্দ্র ছিল এই আড্ডাটি। 'কল্লোল' যুগ বলার মত এ যুগকে 'ভারতী'র যুগও বলা চলে। অনেক নতুন সাহিত্যিকের আবির্ভাব এইখান থেকেই হয়েছে। সেইজন্যই আমি বলতে বাধ্য যে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে 'ভারতী'র দান মুখে বলে প্রকাশ করা যায় না। 'ভারতী'র এত উন্নতমানের আড্ডার কৃতিত্ব মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের জন্যই সম্ভব হয়েছিল।

এই সময়কার 'ভারতী' যাঁরা উল্টেপাল্টে দেখবেন তাঁরা এর রত্ন-সম্ভার দেখে অবাক হয়ে যাবেন।

'কল্লোল' সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের সঙ্গেও আমার যথেষ্ট প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন শিল্পী ও সাহিত্যিক, পরে হয়েছিলেন অভিনেতা ও চিত্র-পরিচালক। তিনি 'মৌচাকে' একসময় অনেক ছবি এঁকেছিলেন। তুলনা করলে এই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য দেখা যায়। 'ভারতী'র লেখকগোষ্ঠীও যেমন একটু গুরুগম্ভীর প্রকৃতির আড্ডাটিও ছিল সেই রকম সিরিয়াস ধরনের। আর 'কল্লোল' ছিল তরুণদের পত্রিকা। এঁরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন সাহিত্য নিয়ে। এই 'কল্লোলে'র আসরটি তাই তারুণ্যের সজীবতায় ছিল তরল, চঞ্চল, কলহাস্যমুখর। 'ভারতী' এবং 'কল্লোল' দুটি আড্ডাই ছিল তখনকার সাহিত্যিকদের মহাপীঠস্থান।

কবি গিরিজাকুমার বসুকে নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে মজা করতাম। কারণ মেয়েদের বিষয়ে তাঁর একটু দুর্বলতা ছিল। কেউ যদি কখনও তাঁকে বলত যে ঐ বাড়ীর ঐ মেয়েটি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়—তাহলে আর রক্ষে নেই। গিরিজাকুমার ওমনি ছুটলেন তার পিছু পিছু। ঐ দুর্বলতাটুকু ছাড়া মানুষ হিসেবে তিনি বড় ভাল ছিলেন। বহু কাগজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, ১৯৩৪-৩৫ সালে তদানীন্তন বিখ্যাত পত্রিকা 'দীপালি'র সম্পাদনাও করেছিলেন কিছুদিন। ছোটদের কাগজ 'যাদুঘরে' তিনি প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সঙ্গে যুক্তভাবে সম্পাদনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল।

তাঁর একটি কবিতার দুটি লাইন এখনও আমার বেশ মনে আছে।

পা দুখানি আনো কাছে মনোহারিকে,
চুম্বনে দিব তাহা কবিতা লিখে!

আমার সম্পাদিত 'মৌচাক' এই সাহিত্যিক আড্ডা থেকে এঁদের সহযোগিতাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভারতী' গোষ্ঠীর সমস্ত

লেখকই একযোগে রাতারাতি শিশু-সাহিত্যের জন্য কলম ধরলেন, এমন কি সত্যেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথও লিখতে আরম্ভ করলেন। অবনীন্দ্রনাথ তো প্রায় নিয়মিতই 'মৌচাকে' লিখতেন। অবনীন্দ্রনাথ 'মৌচাকে'র প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যা থেকেই 'বুড়ো-আংলা' উপন্যাস আরম্ভ করেন। যাঁরা এতদিন শুধু বড়দের জন্যই লিখে এসেছেন এখন তাঁরা প্রায় সবাই ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করে দিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন তো শিশু-সাহিত্যে তাঁদের স্থান প্রথম থেকেই কায়েমী করে নিলেন। তাঁরা হলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব। এর মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার তো জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শিশু-সাহিত্য নিয়েই পড়েছিলেন এবং একজন শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্য লেখক বলে সর্বজনস্বীকৃত হয়েছেন। তাঁর 'যকের ধন' বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। সুতরাং এক কথায় বলা যায় শিশু-সাহিত্যে 'ভারতী'র অবদান কিছু নগণ্য ছিল না।

১৯১৮-১৯ সালে 'ভারতী' অফিসের তিনতলায় একটি সাহিত্য-বাসর বসত প্রতি রবিবার বিকেলবেলায়। এই সাহিত্য-বাসরটির নাম ছিল 'রবিতীর্থ'। এখানে সাহিত্যিকরা নিজেদের রচনা পাঠ করতেন এবং অন্যান্য সাহিত্য আলোচনাও হত। এই 'রবিতীর্থে' মণিলালের দুই সুযোগ্য পুত্র মোহনলাল ও শোভনলাল ছোটদের গল্প পড়েন। সেগুলি সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে। অবনীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীও আসতেন এখানে। অবনীন্দ্রনাথ নিজেও এই 'রবিতীর্থে' নিজের লেখা পড়েছিলেন। পরে এ গল্পগুলি 'মৌচাকে' প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সময় তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে একটি বিচিত্র ফ্যাশান গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ বেশীর ভাগ কবি এবং সাহিত্যিকদের পোশাক-পরিচ্ছদে বেশ একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটে বেরুত। যেমন মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি পরনে গরদের ধুতি ও গেরুয়া রঙ-

এর পাঞ্জাবী। এই ধারাটা বেশ কিছুদিন স্থায়ী হয়েছিল। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই ধরনের পোষাক নিজেরাও ব্যবহার করিতেন। আজকাল অবশ্য কে সাহিত্যিক আর কে অসাহিত্যিক—তা পোশাক দেখে বোঝবার উপায় নেই। কারণ দেখবেন যিনি কবি তাঁর মুখজোড়া গোঁফ, কিংবা পাতলুন-বুশ সার্ট।

দুঃখের বিষয় 'ভারতী'র এমন সুন্দর সাহিত্যিক আড্ডাটি বেশীদিন স্থায়ী হতে পারল না। এই সময় ঝড়ের মত আমাদের আড্ডায় এসে পড়ল শিশিরকুমার ভাদুড়ীর থিয়েটারের দল। ফলে হল এই যে, এই আড্ডার পরিবেশটি ছিন্নভিন্ন হয়ে নষ্ট হয়ে গেল। শুধু যে শিশিরবাবুর দল যোগ দেওয়াতেই এই সাহিত্যিক আড্ডার ভাঙন ধরল তা নয়, এই সময় মণিলালের ব্যবসা এবং কান্তিক প্রেসের অবনতিও এর অন্যতম কারণ। এর কিছুদিন পরেই অবশ্য মণিলালের মৃত্যু হয়।

এই সময় 'ভারতী'র আড্ডার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আড্ডা গড়ে উঠেছিল—এটা হ'ল গজেনদার আড্ডা। এই আড্ডাটি বসত সন্ধ্যা-বেলায় এবং 'ভারতী' গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই এই আড্ডায় গিয়ে জমায়েত হতেন। এই গজেনদা ছিলেন নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের একজন নিকট আত্মীয়। নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে আমারও খুব জানাশোনা ছিল। গজেনদা থাকতেন বিবেকানন্দ রোডের অক্সফোর্ড মিশনের পাশে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের উপরে। এই আড্ডার বিশেষত্ব ছিল, যে যখনই যাক গজেনদার ঢালাও নির্দেশ দেওয়া ছিল যে সে গজেনদার বাড়ী থেকে এক কাপ চা পাবেই পাবে। গজেনদার অনুপস্থিতিতেও আমাদের আপ্যায়নের কোনো সময় কোনো ত্রুটি হ'ত না। এখানকার প্রধান সভ্য ছিলো প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। সে মধ্যে মধ্যে সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে নানা ধরণের হাস্যকর গল্প বলে আসর জমিয়ে রাখত। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে সেই ছিল এই আসরের প্রাণস্বরূপ।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও কাজী

নজরুল ইসলাম এখানে আসতেন। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে এইখানেই আমার আলাপ এবং এই সূত্রে তিনি 'মৌচাকে' কয়েকটি কবিতাও লিখে দিয়েছিলেন।

প্রেমাঙ্কুর সত্যিই একজন দিলখোলা রসিক ব্যক্তি। গান-বাজনার দিকে তার খুব ঝোঁক ছিল। একজন নামকরা মুসলমান ওস্তাদের কাছে সে এসরাজ শিখত। একদিন প্রেমাঙ্কুর এসে বললেঃ বাঙালীরা কি অদ্ভুত জাত।

হঠাৎ এই কথায় আমরা সকলে তাকে চেপে ধরলাম, বললামঃ হঠাৎ তোমার এই সত্যদর্শনের কারণ কি, আমাদের বলবে?

তখন প্রেমাঙ্কুর হেসে বললেঃ মানে এটা আমার কথা নয়—এটা হল আমার ওস্তাদ খাঁ সাহেবের কথা।

চারিদিক থেকে সমস্বরে প্রশ্ন বৃষ্টি হলোঃ কি রকম, কি রকম। হঠাৎ তাঁর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার কারণ?

তখন প্রেমাঙ্কুর বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলতে আরম্ভ করলেঃ বাঙালী অদ্ভুত জাত নয়তো কি? মনে করে দেখ জলের মধ্যে মাছ থাকে—শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব ঋতুতেই মাছের বাস ঐ জলের মধ্যে। ঐ দুরন্ত শীতে বরফের মত ঠাণ্ডা জলে থেকেও মাছের সর্দি বা অসুখ করে না। সুতরাং তারা জলদেশের অসুর। আর সেই মাছকে কিনা বাঙালীরা বেমালুম খেয়ে হজম করে ফেলে!! আশ্চর্য নয়!!

তার বলার কায়দায় একটা বিরাট হাসির রোল উঠল সেদিন গজেনদার বাড়ীর আড্ডায়।

সুখে দুঃখে অনেক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে এই আড্ডাটি অনেকদিন চলেছিল। শেষে একে একে সব সদস্যই এখান থেকে সরে পড়ল। শেষ পর্যন্ত যিনি ছিলেন তিনি প্রফুল্লকুমার সরকার।

এর পরে সুসাহিত্যিক মনীন্দ্রলাল বসু যিনি 'প্রবাসী'তে 'অরুণ' নামে গল্প লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন, তিনি ইউরোপ থেকে ঘুরে

এলে তাঁর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে আমাদের আড্ডা বসত। সেই আড্ডা তাঁর কংগ্রেস এগজিবিশন রোডের বাড়িতেও পরে হত। এই আড্ডায় ইঞ্জিনীয়ার ভূপতি চৌধুরী, বিখ্যাত তৈলচিত্রশিল্পী অতুল বসু, লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ললিতমোহন সেন, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, নির্মলচন্দ্র সিংহ, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য প্রভৃতি আসতেন। শচীন সেন, যিনি পাটনার ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন তিনিও এই আড্ডায় নিয়মিত আসতেন। এই সময় 'পরিকল্পনা' নামে একটি সংকলন আমি প্রকাশ করি। মনীন্দ্রলাল ছিলেন এর সম্পাদক।

শেষ আড্ডার অধিবেশন গিয়ে জমল আমার দোকান—এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স-এ। তখন আমাদের দোকান ছিল Y. M. C. A. বিল্ডিংএর নীচে হ্যারিসন রোডে। এই দোকানের আড্ডায় আসতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চারু রায়, হিতেন্দ্রমোহন বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

তারপর আমাদের দোকান প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে অ্যালবার্ট হলের নীচে উঠে এলে সেখানেও নতুন করে আড্ডার পত্তন হলো বটে, কিন্তু আগের মত আর জমাট হলো না। এখন আমাদের শেষ আড্ডা চলছে বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটের বর্তমান দোকানে। এখানে নিয়মিত আসেন মনোজ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, তুষারকান্তি ঘোষ, চারু রায়, প্রমথনাথ বিশী, বিশু মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সরকার ও আরো অনেকে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও আসতেন মাখনলাল সেন, কেদার-নাথ চট্টোপাধ্যায়, হিতেন্দ্রমোহন বসু, অবনীনাথ মিত্র। আজ এঁরা সকলেই পরলোকগমন করেছেন।

হ্যাঁ একটা আড্ডার কথা বলতে ভুলে গেছি। সেটার আমরা নাম দিয়েছিলাম 'পদচারণ আড্ডা'। আড্ডাটির নাম শুনেই

আপনারা হয়ত ভাবছেন—'পদচারণ আড্ডা' আবার কি রকম আড্ডা রে বাবা।

শুনুন তবে বলি।

আমরা তখন বেশ জমিয়ে বসে আড্ডা দেবার জায়গা না পেয়ে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট থেকে কোন বন্ধুর বাড়ী পর্যন্ত সাহিত্য আলোচনাকে কেন্দ্র করে হেঁটে গিয়ে আবার পূর্বস্থানে ফিরে আসতাম। এতে আমাদের তিন চার মাইল হাঁটা হলেও নানা গল্প ও তর্কের মধ্যে দিয়ে সময়টা কেটে যেত বলে কোন কষ্ট হত না। তারপর হাঁটার কাজ করে শ্রান্ত হয়ে শ্রীমানী বাজারের মধ্যেই চায়ের দোকানে এক কাপ চা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম।

আড্ডা দেওয়াটা একটা নেশাবিশেষ। আড্ডা দিতে বসলে সময়ের জ্ঞান থাকে না এবং সময়ে সময়ে পয়সারও নয়। এটা ভাল কি খারাপ সে বিচার আমি কোনও দিন করিনি এবং দরকারও মনে করিনি।

এতগুলি আড্ডার পরেও আর একটি আড্ডা আমাদের এখনও আছে—সেটি হল ভূপতি চৌধুরীর বাড়ীতে যতীন দাস রোডে। ভূপতি হল ইঞ্জিনীয়ার এবং সাহিত্যরসিক ও 'কল্লোল' যুগের লেখক। তার ওখানে ঘর-বাড়ী, ইট-চুন-সুরকীর বিষয়েই বেশী আলাপ-আলোচনা হয়, অবশ্য অন্যান্য আলোচনাও যে এখানে হয় না তা নয়। বহু ইঞ্জিনীয়ারের সমাগম হয় তবে সাহিত্যিকরা এবং শিল্পসংশ্লিষ্ট বহু ব্যক্তি সেখানে যান। যেমন সি. এ. বি-র সহ-সভাপতি অক্ষয়কুমার বসু, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, প্রিয় গুহ, রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর গোস্বামী, শচীন লাহা, ভারত ব্যাটারির শচীন সাহা, কালিকারঞ্জন সিংহ, আমি এবং আরো অনেকে এখানে আসে।

এখানে শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে। তিনি এখন প্রেসিডেন্সী ড়িভিসনের কমিশনার। যদিও তাঁকে বাইরে থেকে খুব কড়া মেজাজের বলে মনে হয় কিন্তু আসলে

তাঁর অন্তর কোমলতায় ভরা। লোকের বিপদ আপদের কথা শুনলে তিনি সবসময়েই সাহায্য করতে প্রস্তুত। বিভিন্ন বিচিত্রমুখী বিষয়ে তাঁর জ্ঞান দেখে আমি বিস্মিত, কারণ এই স্পেশালাইজেশনের যুগে এমনটা দেখা যায় না। অনেক ব্যাপারেই আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে জ্ঞান সঞ্চয় করেছি।

আমার আর একজন বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীপ্রিয় গুহ। কর্পোরেশনের তিনি একজন বড় কর্মচারী। প্রথম যুগে প্রিয়বাবু স্বর্গত নলিনীরঞ্জন সরকারের আওতায় কাজ করেছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে 'চৌধুরী খ্যাত গুহ' নাম দিয়ে ইঞ্জিনীয়ার ভূপতি চৌধুরীর সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সুসাহিত্যিক, বিভিন্ন কাগজে কর্পোরেশন ও শহরের সমস্যা সম্পর্কে লেখেন।

এটা হল সাপ্তাহিক আড্ডা, বসে প্রতি রবিবার সকাল এগারোটার পর। খাওয়া-দাওয়া প্রচুর পরিমাণে হয়, অবশ্য সবটাই গৃহস্বামী ভূপতিই বহন করেন। আসল কথা হল ভূপতি লোকজনদের খাওয়াতে খুব ভালবাসে।

ভূপতির সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় চল্লিশ বছরেরও বেশী। 'কল্লোল' ছাড়াও ভারতী ও অন্যান্য পত্রিকাতে তার কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। ভূপতি একজন নামকরা স্থপতি—সেই সুত্রে গৃহনির্মাণ সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ তাঁর অনেক পত্রিকায় এবং 'অমৃতে' বেরিয়েছে। নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও যে ভূপতি তার সাহিত্য অনুরাগ ও চর্চা আজও সমান উৎসাহের সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছে, এইটেই প্রশংসনীয়।

১৯৩৫ সালে বালীগঞ্জে শরৎ বসু রোডে আমার বর্তমান গৃহটি নির্মাণ করে ভূপতি। আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে এ বাড়ীর ডিজাইন ও স্থাপত্য লোকের মনে প্রচুর চমক জাগিয়েছিল। যেদিন আমি গৃহপ্রবেশ করি সেদিন চারিদিকে আলো দিয়ে এমন সাজানো হয়েছিল যে প্রথম দর্শনে লোকে ভূল করেছিল সিনেমা হাউস বলে।

এমন কি কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এ হলটার নাম কি, কি ছবি হচ্ছে—বুকিং অফিস কোনদিকে ? ইত্যাদি।

আমি আগেই বলেছি আমাদের 'ভারতী'র আড্ডায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রথম এলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তারপর থেকে তিনি প্রায়ই আসতেন তাঁর দলবল নিয়ে—নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা হত তাঁর সঙ্গে—সাহিত্য নাটক অভিনয় সম্বন্ধে। ইংরাজী সাহিত্যে, বিশেষ করে নাট্য-সাহিত্যে তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। শেক্সপীয়ারের সমস্ত নাটক ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। তার উপর তাঁর সুরেলা কণ্ঠে অপূর্ব আবৃত্তি শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। অধ্যাপকরূপেও তাঁর খ্যাতি কিছুমাত্র কম ছিল না।

তদানন্তীন মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান বিদ্যাসাগর) তিনি ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি যখন শেক্সপীয়ার পড়াতেন তখন অন্যান্য কলেজ থেকেও বহু ছাত্র বিশেষ অনুমতি নিয়ে তাঁর লেকচার শুনতে যেতো। তাঁর মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল যা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়।

আর একটা জিনিস ছিল শিশিরকুমারের মধ্যে, সেটা যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই অনুভব করেছেন। সেটা হল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি কোনো বিষয়ে যা বলতেন তার ওপরে কথা বলার ক্ষমতা কারও হত না। তাঁর সঙ্গে মতের মিল না হলেও তাঁর সামনে মুখের ওপর প্রতিবাদ করার সাহস কেউ করত না। এক-একজন লোক একটা বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে জন্মান যার ফলে তাঁরা চিরকাল শুধু হুকুম দিয়েই যান কখন কারও হুকুম তামিল করার কথা চিন্তাও করতে পারেন না। এমন কি কারও অধীনে কোন কাজ পর্যন্ত করতে পারেন না।

শিশিরকুমার ছিলেন সেই জাতের মানুষ। তা নইলে দেখুন, তিনি সেই ১৯২০ সাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মঞ্চে ও চিত্রজগতে যতগুলি নাটকে ও চিত্রে অভিনয় করেছিলেন, সবগুলিতেই সর্বা-

ধিনায়করূপে কাজ করেছেন। বহু চিত্রনির্মাতা প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে কোন কোন বিশেষ চরিত্রে তাঁকে অভিনয় করতে অনুরোধ করেছেন, কিন্তু সে সমস্তই এমনকি সরকারী উপাধিও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, শুধু একটি কারণে। তিনি কারও অধীনে কাজ করবেন না। কারণ তাঁর মতে এমন কোন পরিচালক ছিল না যে তাঁকে কোনো নির্দেশ দিতে পারে। তা ছাড়া মঞ্চের তুলনায় চিত্রজগতের অভিনেতার অভিনয়ের সুযোগ সীমিত। মঞ্চের কলাকৌশল আর চিত্রের কলাকৌশল সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু যেহেতু তিনি মঞ্চকেই ভালবাসতেন বেশী এবং মঞ্চই ছিল তাঁর তীর্থক্ষেত্র, সেইজন্য চিত্রজগতের এত বাঁধা-ধরার মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলেন না। তাই যদিও কয়েকটি মঞ্চসফল নাটকের চিত্ররূপে তাঁকে আমাদের পর্দার উপরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল কিন্তু মঞ্চের মত যেন তিনি সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। সত্যিকথা বলতে কি, রূপালী পর্দার মোহ তাঁকে বিশেষ আকর্ষণ করতেও পারেনি পাদ-প্রদীপের মায়া কাটিয়ে।

যাই হোক বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯-২০ সালে শান্তি-উৎসব (peace celebration) উপলক্ষ্যে ইডেন উদ্যানে একটি দীর্ঘকাল ধরে মেলা হয়। সেই মেলায় সরকার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রস্তাব করা হয় ওখানে নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করতে। শিশিরকুমার এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে নটনাথের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে 'সীতা'র পূর্বে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' ও গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে' অংশগ্রহণ ক'রে খুব খ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি নাটক নির্বাচন করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা'। ইডেন উদ্যানেই স্টেজ বেঁধে 'সীতা'র অভিনয় চলতে লাগল। আমি, প্রেমাঙ্কুর, মণিলাল, হেমেন্দ্র, চারু ইত্যাদি এই কয়জন প্রায়ই যেতাম শিশির-

কুমারের কাছে। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনীভূত হতে লাগল। আড্ডাকে আড্ডাও দেওয়া হোত মাঝে মাঝে অভিনয়ও দেখতাম।

কিন্তু এই ধরনের একজিবিশান তো আর চিরকাল চলতে পারে না। একদিন একজিবিশনের মেয়াদ ফুরিয়ে এল। তখন শিশির-কুমার ম্যাডান কোম্পানীতে যোগ দিলেন। কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে (বর্তমান শ্রী সিনেমা) শিশিরকুমারের 'সীতা' অভিনয় চলতে লাগল। আগেই বলেছি শিশিরকুমার ছিলেন বরাবরই একরোখা এবং স্বাধীনচেতা পুরুষ। পার্শী ম্যাডান কোম্পানীর অধীনে কাজ করা বেশীদিন তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তিনি তখন নিজে কর্ণওয়ালিস স্টেজ ভাড়া করে নিজের সম্প্রদায় নিয়ে নাট্যমন্দির নাম দিয়ে 'সীতা'র অভিনয় চালাবেন বলে স্থির করলেন।

মুস্কিল বাধলো 'সীতা' অভিনয়ের মঞ্চস্বত্ব নিয়ে। রীতিমত অভিনয় করার জন্য নাট্যকার বা তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে তাঁর অনুমতি নেওয়ার দরকার ছিল। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল তার বেশ কিছুদিন আগেই গত হয়েছেন। সুতরাং অনুমতি নিতে হবে তাঁর পুত্রের কাছ থেকে।

খবর পাওয়া গেল দিলীপকুমার রায় কলকাতা আসছেন। শিশির-কুমার তাঁর আগমন-প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন। এদিকে হল কি তাঁর আসার খবর পেয়ে তদানীন্তন আর্ট থিয়েটারের (স্টার) জনৈক ডিরেকটার হাওড়া স্টেশনে গিয়ে কলকাতায় পা দেবার আগেই ঐ স্টেশনেই অনুমতিপত্র লিখিয়ে নেন, তাঁরা দ্বিজেন্দ্রলালকৃত 'সীতা'র অভিনয় করবেন বলে।

শিশিরকুমার তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। মঞ্চ উদ্বোধনের তারিখের বেশী দেরী নেই অথচ তাঁর নাটকটাও হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু শিশিরকুমার দমবার পাত্র নন, তাঁর জিদ আরও বেড়ে

গেল। তিনি ঠিক করলেন, 'সীতা'ই তিনি মঞ্চস্থ করবেন তবে দ্বিজেন্দ্রলালের নয়।

যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে নিজে সবরকম সহযোগিতা করে 'সীতা' নাটক লেখালেন। এই নাট্যরূপে আরও অনেকে সহযোগিতা করলেন। হেমেন্দ্রকুমার লিখলেন গান, মণিলাল নৃত্য-পরিকল্পনা করলেন, চারু রায় শিল্প-নির্দেশনার ভার নিলেন। আরও বহু জিনিস গতানুগতিকতা থেকে সরে এসে এক নবযুগের সূচনা করলে। যেমন ধরুন, চারু রায় দৃশ্য-পরিকল্পনায় মঞ্চে ত্রিমাত্রিক ভাবধারা (Three dimensional effect) সৃষ্টি করলেন। জিনিসটা আর একটু পরিষ্কার করে বলি।

আগে যাঁরা দৃশ্য (scene) আঁকতেন—তাঁদের বলা হোত, একটা গ্রামের পথ, কিংবা নদী কিংবা প্রাসাদ, কিংবা রাজপথ কিংবা দরবার আঁকতে হবে। তাঁরা মঞ্চ অনুযায়ী কাপড় জুড়ে উল্লিখিত সীনগুলি এঁকে দিতেন। আঁকা হয়ে গেলে স্টেজের উপরে সেগুলি ঝুলিয়ে দেওয়া হোত। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতেন। তাতে অনেক সময় দেখা যেত শিল্পীদের সঙ্গে দৃশ্যের সামঞ্জস্য ঠিক মিলছে না। চারু প্রথম প্রবর্তন করল দৃশ্যের সঙ্গে শিল্পীদের উপযুক্ত সমতা সৃষ্টি করা। তারপর আরও হোল—পোষাকের ধারা পরিবর্তন। অবশ্য আগেও পোশাকের সামান্য ধারা পরিবর্ত্তন হয়েছিল। আগে অভিনেতারা সব চোগা-চাপকান পরতেন। 'সীতা'য় প্রথম দেখা গেল কুশীলবদের ধুতি পরতে। তারপর ছেলেমেয়ে একসঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে বসার রেওয়াজ শিশিরকুমার প্রথম চালু করেন। নাটক আরম্ভ হবার আগে দারুণ উৎসাহে কনসার্ট বাজতো। এই নাটকে তাও বন্ধ হল।

একসঙ্গে এতগুলি পরিবর্তন তো হলই, তার ওপর হল অভিনয়ের ধারার আমূল পরিবর্তন। অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দভাবে সংলাপ বলার রীতিও এই 'সীতা'য় প্রথম প্রবর্তিত হল। এরপর

শিশিরকুমার করলেন আলমগীর, ষোড়শী, রমা, শেষরক্ষা এবং প্রত্যেকটি নাটকই কি প্রযোজনার দিক থেকে, কি অভিনয়ের দিক থেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে হয়ে উঠল সমুজ্জ্বল। সত্যিই শিশিরকুমার যুগ-প্রবর্তক। নাট্যজগতে শিশিরকুমারের প্রতিভা চিরস্মরণীয়।

এই সূত্রে উল্লেখ করা যায় যে এই সেদিনও লণ্ডনের Stage পত্রিকায় কলকাতা হাইকোর্টের ইংরাজ আমলের জজ লট উইলিয়ামস লিখেছেন যে, বিলাতী বড় বড় আর্ট-ক্রিটিকরা শিশিরবাবুর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই সময়ে।

এই শিশির-সম্প্রদায়ের অন্য যে-সব শিল্পীরা ছিলেন তাঁরা শিশিরকুমারের অভিনয়-শিক্ষার গুণে পরবর্তী যুগে অবিসম্বাদী প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। যেমন প্রভা দেবী, জীবন গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী, রবি রায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি। এই নাটকে আমরা বিখ্যাত অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র সঙ্গেও পরিচিত হই।

তবে হ্যাঁ, একটা কথা এখানে না বলে পারছি না। শিশিরকুমার প্রযোজিত নাটকগুলিতে তিনিই সব—অন্যান্য শিল্পীরা নিষ্প্রভ হয়ে যেত তাঁর প্রতিভার দ্যুতিতে। শেষে লোকে শিশিরকুমারকেই দেখতে যেত, নাটকের অন্য কোন শিল্পী বা দৃশ্য নয়। লোকে বলত শিশিরকুমার দাম্ভিক। কিন্তু আমার আজও বিশ্বাস, এরকম লোকের দম্ভ শোভা পায়, কারণ তিনি একা যে-কোন নাটককে টেনে নিয়ে যাবার শক্তি রাখতেন তাঁর অভিনয়ে এবং ব্যক্তিত্বে।

যাই হোক নাট্যমন্দিরে যখন অপ্রতিহতগতিতে 'সীতা' চলছে তখন বিপুল প্রতাপে স্টারেও 'কর্ণার্জুন' চলেছে। 'কর্ণার্জুন'ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যে এবং কাহিনী মাধুর্যে বাংলার প্রতিটি নরনারীর প্রাণ আবেগাপ্লুত করে দিত। এর নাট্যকার ও নাট্যশিক্ষক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। এইখানে অভিনয় জগতে আমাদের পরিচয় হয় অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, দুর্গাদাস

বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহারবালা, তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রভৃতির সঙ্গে। পরে নাট্যজগতে এঁরাই এক-একটি উজ্জ্বল রত্ন বলে পরিগণিত হন। সত্যি কথা বলতে গেলে 'কর্ণার্জুন' যেরকম সুদূর পল্লীগ্রামের মধ্যেও সাড়া জাগিয়েছিল (পল্লীগ্রামের লোকেরা স্টেজ বেঁধে 'কর্ণার্জুন' নাট্যাভিনয় আজও করে থাকেন) সেই হিসাবে 'সীতা' কিন্তু এতখানি সাধারণ লোকের অন্তর জয় করতে পারেনি। 'সীতা'র জয়জয়কার হোত শিক্ষিত শহুরে দর্শকদের কাছে।

এইখানে শিশিরবাবুর প্রসঙ্গে আচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করছি। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় তাঁর সুকিয়া স্ট্রিটে বাস কালে। তারপরে ঘনিষ্ঠতা সুরু হয় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে যখন তিনি 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে বৈদেশিক পরিচ্ছদ পরিকল্পনা ইতিহাস ঘেঁটে করে দিয়েছিলেন।

সুনীতিবাবু ইউরোপ অনেকবার গিয়েছেন। ধ্বনিবিজ্ঞান, (Phonetics) ব্যাকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান সুধীসমাজে সুবিদিত। তিনি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভাপতি হয়েছিলেন এবং জাতীয় অধ্যাপকও হয়েছেন।

১৯৩০ সাল পর্যন্ত মহাবিক্রমে 'নাট্যমন্দির' চলল। এটা যে শুধু একটা থিয়েটার এবং একটা আড্ডাখানা ছিল তা নয়, এখানে তদানীন্তন সমস্ত গুণীজনের সমাবেশ হত। নাট্য ও সাহিত্য আলোচনা হত পুরোদমে। সেইজন্যে এমন একটি পরিবেশ ছেড়ে আসা কোন লোকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সেইজন্যে আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যাতেই হাতে কোন কাজ না থাকলেই চলে যেতাম সেখানে। কোনদিন থিয়েটার দেখতাম, কোনদিন আলোচনায় যোগ দিতাম।

১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত নাট্যমন্দির চলেছিল। তার পরই তার আয়ু ফুরিয়ে এল। ম্যাডান কোম্পানী শিশিরকুমারের কাছ থেকে

'স্টেজ'টি নিয়ে সিনেমা হাউস করলেন নাম দিলেন কর্নওয়ালিস থিয়েটার।

শিশির-সম্প্রদায় ওখান থেকে ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যাওয়া-আসা বন্ধ করলাম। এ ক'বছর থিয়েটারের সংস্পর্শে এসে বেশ একটা নেশা ধরে গিয়েছিল। তখন আমি, প্রফুল্ল রায়, প্রেমাঙ্কুর, চারু, হেমেন্দ্র সব স্টার থিয়েটারে গিয়ে জুটলুম। 'স্টারে' তখন প্রচুর ভাল ভাল বই হচ্ছিল—যেমন 'কর্ণার্জুন' তো বটেই তা ছাড়া, চাঁদ সদাগর, চিরকুমার সভা, সাজাহান ইত্যাদি।

সেখানে আলাপ হোল 'স্টারে'র কর্ণধার প্রবোধচন্দ্র গুহের সঙ্গে। অত্যন্ত অমায়িক এবং 'মাই-ডিয়ার' লোক—তিনি সে সময় নাট্য-জগতের একটি দিকপাল বিশেষ। প্রত্যেক লোকের সঙ্গে 'ফ্রেঞ্চ-কাট' দাড়িটি নেড়ে হেসে কথা বলে তাকে আপনার করে নিতে পারতেন। বাংলার নাট্যজগতে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অপর একজন শিল্পীর সঙ্গে সেখানে আমার আলাপ হয়েছিল—তিনি হলেন নীহারবালা। অভিনয়ে, নৃত্যে, গীতে এবং ভদ্র ব্যবহারে এমন একটি শিল্পী আমি আর দেখিনি। তাঁর চেহারার মধ্যে এমন কিছু আকর্ষণী শক্তি ছিল না—অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের চেহারা, কিন্তু তাঁর অনন্যসাধারণ গুণাবলী আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমার সঙ্গে শ্রীমতী নীহারের বন্ধুত্ব তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত অটুট ছিল। সত্যি কথা বলতে কি এরকম একটি প্রতিভা বাংলা রঙ্গমঞ্চের গৌরব। রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত তাঁর 'চিরকুমার সভা'র গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এই সময় ১৯৩১ সালে বাংলাদেশের চিত্রজগতে শুরু হল সবাক যুগ। এতদিন দেখে এসেছি ছবি হাত-পা নাড়ে, তাদের অন্তরের ভাব প্রকাশ করে ব্যঞ্জনার (expression) মাধ্যমে। জায়গায় জায়গায় 'টাইটেল' দিয়ে গল্পের ধারা বুঝিয়ে দেওয়া হোত। এই প্রথম দেখলাম ছবি কথা বলছে। অবশ্য এর আগে ইংরাজী সবাক চিত্র আমরা দেখেছি এবং অবাকবিস্ময়ে তা উপভোগ করেছি। এখন

এদেশে সবাক চিত্রের প্রথম প্রবর্তন করলেন ম্যাডান কোম্পানী। তারপর এল নিউ থিয়েটার্স। তারপর এক-এক করে বহু কোম্পানী এল, গেল এবং ভবিষ্যতে আসবে। স্টেজের বহু দিকপালের কীর্তি কাহিনী যেমন কালজয়ী সৃষ্টির দ্বারা অমরত্ব লাভ করেছে, চিত্রজগতেও তেমনি বহু উত্থান-পতন আমরা দেখেছি। যেমন দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, মধু বসু থেকে আরম্ভ করে আজকের সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ পর্যন্ত বহু কলাকুশলীর দানে আমাদের দেশের চিত্রশিল্প পুষ্টিলাভ করেছে। আমি মঞ্চের মত চিত্রশিল্পের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলাম এই সেদিন পর্যন্ত। সিনেমাতে আমার আগ্রহ এবং আকর্ষণের জন্য আমাদের জাতীয় সরকার আমাকে পাঁচ বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সেন্সর বোর্ডের সভ্যরূপে নিযুক্ত করেছিলেন।

মাত্র কয়েক বছর হল আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিয়মিত নাটক বা সিনেমা দেখা হয়ে ওঠে না, নইলে মঞ্চ ও চিত্র—উভয় দিকেই আমার সমান আগ্রহ। এ সম্বন্ধে আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই, মহামতি গোখলের ভাষায়—What Bengal thinks to-day the whole of India thinks to-morrow.

১৯৩১-১৯৫০ সালে বাংলাদেশে যে-সমস্ত ছবি তৈরি হয়েছে, সারা ভারতবর্ষ তারাই অনুকরণ করেছে। আর আজ তারাই এগিয়ে গেছে, আর আমরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছি জীবনের প্রতি পদক্ষেপে। শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে আমরা যতই ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাই না কেন, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চিত্রনির্মাতারা আমাদের বহুদূরে ফেলে গেছে।' বোম্বাইয়ের ছবিতে মার্কিনী ছবির অনুকরণে পাশ্চাত্য ধরনের হাল্কা রঙ্গ-কৌতুক ও চটুল গানের রেওয়াজ আছে। বাংলা ছবি কিন্তু এই দূষিত লঘুতা সর্বতোভাবে পরিহার করে সুরুচি বজায় রাখতে পেরেছে।

কলকাতার যে সমস্ত ছবিঘরে আগে বাংলা ছবি নিয়মিতভাবে দেখানো হত, এখন সেগুলিতেও হিন্দী ছবি দেখানো হচ্ছে। তা ছাড়া

বাঙালী-অধ্যুষিত অনেক স্থানেও অধুনা হিন্দী ছবির প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা দেখা যাচ্ছে।

১৯৩০ সালে আর একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। তিনি হলেন জগদ্বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর। বিলেত থেকে সবে ফিরেছেন—অ্যানা পাভলোভার নৃত্যসঙ্গী হবার দুর্লভ গৌরব অর্জন করে।

এর আগে ১৯২৭-২৮ সালে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের উদ্যোগে একটি নৃত্য-প্রদর্শনীতে প্রথম উদয়শঙ্কর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন এক নর্তকীরূপে। উদয়শঙ্কর যে কখনও নারীরূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এটা অনেকের কাছেই একটা বিস্ময়কর খবর বলে পরিগণিত হবে—এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

শঙ্করের এমনিই একটা ব্যক্তিত্ব ও আকর্ষণ ছিল যে, প্রথম জানাশোনাতেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার দোকানে শঙ্করের প্রথম নিউ এম্পায়ার ও অন্যান্য শো-র অগ্রিম টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা ইমপ্রেসারিও হরেন ঘোষের সাহায্যে করে ফেললাম।

এতদিন আমরা যে নৃত্য দেখেছি, সেগুলো সবই থিয়েটারের নর্তকীদের নাচ বা বাঈজীদের নাচ। এই প্রথম উদয়শঙ্করের নাচে দেখলুম যে, নৃত্যশিক্ষাতেও ভারতের শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়। ছন্দ, সৌন্দর্য, মুদ্রা, সাজসজ্জা, আলোক-নিয়ন্ত্রণ, আবহ-সঙ্গীত প্রভৃতির সমন্বয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তা অভিনব এবং অনবদ্য। নৃত্যজগতে একটি বিরাট আলোড়ন নিয়ে এলেন উদয়শঙ্কর।

এই সময় উদয়শঙ্করের অনুজ জগদ্বিখ্যাত সুরস্রষ্টা রবিশঙ্করের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়। তখন তিনি বয়সে বালকমাত্র। 'মৌচাকে'র গ্রাহক এবং আমাকে চিঠিপত্র লিখে আমার স্নেহ কেড়ে নিয়েছিলেন। তিনি তখন থেকেই উদয়শঙ্করের সম্প্রদায়ে সঙ্গীতস্রষ্টাদের অন্যতম ছিলেন। বিদেশ সফরকালে তিনি 'মৌচাকে' লেখা

পাঠাতেন, ছবি পাঠাতেন। ২রা এপ্রিল ১৯৩৬ সালে প্যারিস থেকে লেখা তাঁর একটা পুরনো চিঠি এখানে তুলে দিলাম।

মাননীয় সুধীরবাবু,

আপনাকে already যে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছি, আশা করি তা' আপনি পেয়েছেন। আর তু'দিন পরে Egypt এর বিষয় পাঠাব। তারপর, গ্রীস, তারপরে Europe এর বেশীর ভাগ জায়গা যার উপর কেউ বেশী লেখেনি। আমাদের South America যাওয়ার কথা হচ্ছে, তা' যদি ঠিক হয়ে যায়, তাহ'লে আশা করি নতুনত্বের খোরাক আপনাকে কিছু পাঠাতে পারব। আমি লেখক নই, সেইজন্যেই যা' লিখি সেটা হয়ে পড়ে খুব কাঁচা, আপনি দয়া করে সেগুলোতে আমার বক্তব্য আর ভাব বজায় রেখে শুধরে নেবেন।

আমাদের এবারকার টুরটা হচ্ছে মন্দ নয়। আমরা প্যারিসে দিন দশেক আছি শো'টো নেই—ছুটি। আপনারা ভাল আশা করি। কলকাতার খবর কেমন দয়া করে লিখবেন। আমরা আছি, ভাল। আপনি আমার প্রবন্ধ যদি দয়া করে ছাপান, পাঠাবেন তা'হলে ঠিকানায়।

C/o. Uday Shankar Coy
C/o. Thos Cook
Place de la Madeleine
Paris

আর কি লিখব। আমরা সব ভাল। নমস্কার জানবেন।

ইতি

রবীন্দ্রশঙ্কর

বাংলার নাট্যজগতের কর্মতৎপরতা যখন ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত পূর্ণোদ্যমে চলেছে—অর্থাৎ নাট্যমন্দিরে শিশির সম্প্রদায়ের সীতা, আলমগীর, ষোড়শী, দিগ্বিজয়ী, শেষরক্ষা প্রভৃতি, আর্ট থিয়েটারের পরিচালনাধীনে স্টারে কর্ণার্জুন, সাজাহান, চাঁদসদাগর, চণ্ডীদাস, মন্ত্রশক্তি, মিনার্ভায় কিন্নরী, আত্মদর্শন, ব্যাপিকা বিদায় প্রভৃতি—তখন রঙ্গালয় সম্বন্ধে কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় থিয়েটারের খবর ফলাও করে প্রকাশিত হতে শুরু করে। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা আর্ট থিয়েটারের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। তাতে শিশির সম্প্রদায়কে নানারকম কুৎসা করতে শুরু করে। শিশিরকুমারের সঙ্গে আমাদের দলের হৃদ্যতা ছিল অত্যন্ত বেশী। আমিও তখন একটি পত্রিকা প্রকাশ করি—নাম 'নাচঘর'। এতে শিশির সম্প্রদায়কে সমর্থন করে যাবতীয় খবর, নানারকম বিবরণ, নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের লেখা প্রভৃতি থাকত। সে-পত্রিকার আমিই ছিলাম প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী। কিছুদিন পত্রিকা চালানোর পর আমি সে-পত্রিকা ছেড়ে দিই এবং পরে অন্য লোকে সে কাগজখানি চালায় দীর্ঘদিন ধরে।

এই সময় আরও কয়েকখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে—যেমন ভগ্নদূত, শিশির, বিজলী, আত্মশক্তি, বায়োস্কোপ, দীপালী, খেয়ালী প্রভৃতি। কিন্তু একমাত্র মঞ্চ ও চিত্র সংক্রান্ত পত্রিকা বলতে ছিল মাত্র কয়েকখানি, যেমন নাচঘর, বায়োস্কোপ, দীপালী ও খেয়ালী। অবশ্য অন্যান্য পত্রিকাতেও রঙ্গালয় সম্বন্ধে কয়েকটি করে পৃষ্ঠা থাকত। তারপর এখন তো বহু পত্রিকাই হয়েছে, অনাবশ্যক বোধে সেগুলির আর উল্লেখ করলাম না।

'কর্ণার্জুন' ও 'সীতা'র যুগ চলে গেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে বিশেষত কলকাতায় নবনাট্যের যুগ প্লাবিত করছে। ক্লাব, স্কুল এবং প্রায় প্রত্যেক অফিসের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মীরা বিদেশী অনুকরণে ছোট-ছোট নাটক অভিনয় ক'রে থাকেন। স্ত্রী ভূমিকাগুলি মেয়েরাই

জীবিকা হিসাবে করে থাকেন। তাতে ভালো বা মন্দ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে কিছু মন্তব্য করতে চাই না।

এই সময় পত্রিকা-জগতে একটা জিনিস বেশ উপভোগ্য বিষয় ছিল—সেটা হচ্ছে মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির লড়াই। এই প্রসঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'র কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস। তাঁর শ্লেষ ও ব্যঙ্গাত্মক রচনা সাহিত্যক্ষেত্রে একটা পরম উপভোগ্য জিনিস ছিল। সাহিত্যিক বা অন্য কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে আক্রমণ করে ঘায়েল করবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। মধ্যে মধ্যে এই আক্রমণ এত তীক্ষ্ণ ও ব্যক্তিগত হয়ে পড়ত যে মর্মান্তিকভাবে লোককে আঘাত করত। আক্রমণটা বেশীর ভাগই হত লেখকদের ওপর। রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়তেন না। আমার যতদূর জানা আছে 'শনিবারের চিঠি'র শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মোহিতলাল মজুমদার, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, যোগানন্দ দাস, সজনীকান্ত দাস প্রভৃতি। এই 'শনিবারের চিঠি'র পাল্টা জবাব হিসেবে আমরাও 'হসন্তিকা' নামে একটি পত্রিকা বের করি। তবে মাত্র কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হবার পরেই 'হসন্তিকা'র আয়ু শেষ হয়ে অকালে প্রাণত্যাগ করল। এই 'হসন্তিকা'র প্রধান কর্ণধার ছিলেন সুসাহিত্যিক 'কুন্তলীন'-এর এইচ. বসুর পুত্র হিতেন্দ্রমোহন বসু।

এই সময় আর একটা পত্রিকা প্রকাশের আড্ডাও আমাদের প্রতিষ্ঠানে ছিল—সেটা হল শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) মশায়ের 'বিদূষক'। তিনি কাগজগুলি ছেপে আমাদের প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্সের হ্যারিসন রোডের দোকানে জমা করতেন, তারপর রাস্তায় নিজেই সুর দিয়ে ফেরি করে বিক্রি করতেন।

পত্রিকা-পরিচালনা ব্যাপারে তখন আমার জ্ঞান বেশ ভালই হয়েছে। নিজে দু-খানি পত্রিকা বার করা ছাড়াও ইতিপূর্বে ছাত্র

জীবনে সুধাকৃষ্ণ বাগচী পরিচালিত 'জাহ্নবী' পত্রিকার সম্পাদনা করেছি। তারপর তো 'যমুনা' ও 'ভারতী'র কথা এর আগে বলেছি। এবারে খেয়াল হল একটা ছোটদের পত্রিকা প্রকাশের। এর আগে অবশ্য দু-একখানি ছোটদের কাগজ বেরিয়েছিল, যেমন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'সন্দেশ'। আমি প্রকাশ করি 'মৌচাক'।

'ভারতী'র সাহিত্যিকগোষ্ঠীর আনুকূল্য না থাকলে হয়ত এত সুন্দরভাবে 'মৌচাক' প্রকাশ করতে পারতাম না। 'মৌচাকে'র প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে (ইংরেজী ১৯২০ সাল)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্র দেব, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রভৃতি সকলেই 'মৌচাকে' নিয়মিত লিখতে আরম্ভ করেন। তখন 'সন্দেশ' গত হয়েছে। 'মৌচাক' অল্পসময়ের মধ্যে ছোটদের মহলে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠল।

একবার মনে আছে পূজার সময় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে 'মৌচাকে'র জন্য কয়েকটি কবিতা লেখার অনুরোধ করে পত্র দিয়েছিলেন। কবি সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন একসঙ্গে আটটি কবিতা পাঠিয়ে দিয়ে। আর সবগুলি কবিতাই একটি পূজা সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে কবি গিরিজাকুমার বসু রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকটি কবিতা মৌচাকের জন্য সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের বহু লেখা 'মৌচাকে' প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে 'বুড়ো আংলা'। হেমেন্দ্রকুমার রায় ছেলেদের রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাস 'যকের ধন' লিখে শিশু-সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করলেন। হেমেন্দ্রকুমারের আরও কয়েকটি উপন্যাস 'মৌচাকে' প্রকাশিত হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' ধারাবাহিকভাবে 'মৌচাকে' প্রকাশিত হয়েছিল।

তারপর 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর কয়েকজন রথী 'মৌচাকে' যোগদান

করেন—যেমন বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। এঁরা সকলেই গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা লিখে 'মৌচাক'কে পুষ্ট করেন। এখানে বুদ্ধদেব বসু সম্বন্ধে এক মজার ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। বুদ্ধদেব তখন ছাত্র—ঢাকায় স্কুলে পড়েন। সেসময় তিনি একটি লেখা পাঠান। কোন কারণে লেখাটি আমাদের মনোনীত না হওয়ায় সেটি ফেরৎ পাঠিয়ে দিই। তাতে তিনি এত মনমরা হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর দিদিমা আমাদের একখানি পত্রে জানিয়েছিলেন যে, বুদ্ধদেব কালে একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক হবেন বলে তাঁদের ধারণা। সুতরাং তাকে এরকম মনোকষ্ট দেওয়ায় তাঁরা সকলেই খুব দুঃখিত।

অবশ্য পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের দিদিমার সে আশা ফলবতী হয়েছে। সত্যই গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতায় বুদ্ধদেব সাহিত্য-গগনে একটি অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে নিজেকে প্রমাণিত করেছেন। এবং সেদিনকার সে অপ্রিয় ঘটনাকে মন থেকে মুছে ফেলে তিনি মৌচাকে বহু লেখা লিখেছেন। সম্প্রতি তিনি আকাদমি পুরস্কার পেয়েছেন যদিও এই পুরস্কার তাঁকে অনেকদিন পূর্বেই দেওয়া উচিত ছিল। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকের ওপর তিনি এই পুরস্কার পান।

'মৌচাক'কে যদি আমরা শুধু একটা সামান্য মাসিক পত্রিকা হিসাবে দেখি, তাহলে তার ওপর অবিচার করা হবে। এতদিনের 'মৌচাকে'র খোপে খোপে যে মধু সঞ্চিত হয়েছে, তা বাংলার সমগ্র শিশু-সাহিত্যের মধু বলেই আমার মনে হয়।

'মৌচাকে'র সম্পাদক হিসাবে সকলের কাছে আমার ঋণের বোঝা এত বড় এবং ভারী যে তার বিবরণ দিলে একটা ছোট পুঁথি হয়ে যায় —সেইজন্যে সে প্রচেষ্টা থেকে বিরত রইলাম। 'মৌচাক' সম্পাদনায় এক সময়ে 'মাসপয়লা' সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য আমায় প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। বর্তমানে 'মৌচাক'পরিচালনার সব ভার সুপরিচিত সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত আছে। তবু আমি

কয়েকজনের নাম উল্লেখ করব, যাঁরা নানাবিধ শিক্ষণীয় ও সুখপাঠ্য লেখা দিয়ে 'মৌচাক'কে একটি শ্রেষ্ঠ শিশু-পত্রিকারূপে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছেন। এই সম্পর্কে এই সাহিত্যিকদের নাম আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে—এঁরা হলেন, প্রিয়ম্বদা দেবী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, শিবরাম চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিমল মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, ভবানী ভট্টাচার্য, মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, জসিমউদ্দীন, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী, নরেন্দ্র দেব, কাজী নজরুল ইসলাম, রাজশেখর বসু, সুনির্মল বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, গিরীন্দ্রশেখর বসু, রামপদ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু, ধীরেন্দ্রলাল ধর, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, হুমায়ুন কবির, সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিমল দত্ত, মহাশ্বেতা দেবী, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, কুলদারঞ্জন রায় প্রভৃতি।

পঁচিশ বছর পুর্ণ হলে ১৩৫১ সালে জয়ন্তী-সংখ্যা 'মৌচাক' প্রকাশিত হল। 'ভারতী' যুগ থেকে 'কল্লোল' যুগের সকলেই তাঁতে মৌচাকের প্রশস্তি করেন। পঁচিশ বছরের 'মৌচাকে'র শ্রেষ্ঠ গল্প, কবিতা ও অন্যান্য রচনা নিয়ে একটি বৃহৎ সংকলন প্রকাশিত হয়।

এই মৌচাক-জয়ন্তী উপলক্ষে আশুতোষ কলেজে একটি সভা হয়—তাতে পৌরোহিত্য করেন আচার্য যতুনাথ সরকার মহাশয়। 'মৌচাকে'র প্রত্যেক গ্রাহক-গ্রাহিকাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রচুর সংখ্যায় তাঁরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন

সস্ত্রীক সৌরীন্দ্রমোহন। এতে গান গেয়েছিলেন সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, শান্তিদেব ঘোষ প্রভৃতি এবং যাদুসম্রাট পি সি সরকার তাঁর ইন্দ্রজালের খেলা দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিলেন। চারু রায়, সৌম্যেন্দ্র মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত রুচি-সম্মতভাবে অনুষ্ঠানের আসরটিকে সাজিয়েছিলেন। বাংলাদেশের অন্য কোনো মাসিকপত্রের ইতিহাসে এ-ধরনের জয়ন্তী উৎসব পালিত এবং বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এই উপলক্ষে আমি যেসব চিঠি ও শুভেচ্ছাবাণী পাই, তার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ঃ

> ছোট-বড় লেখক আমরা কোমর বাঁধলাম মাসিক 'মৌচাকে'র ডাকে—ঘরে ঘরে যাতে মধু পৌঁছে দেয় সেজন্য। সেই 'মৌচাকে'র প্রথম অবস্থার উৎসাহ কত ছিল আমাদের। তারপর ছোট-বড় মৌমাছির দল এখন আমরা বড় হয়ে গেছি, তবু 'মৌচাকে'র সঙ্গে মধুর সম্পর্ক ভুলতেই পারিনি। ছাড়তেও পারিনি।

বিখ্যাত সুরসিক সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তেরও মৌচাকের লেখা অবিস্মরণীয়। তিনি নিয়মিতভাবে মৌচাকে বিবেকানন্দের জীবনী লিখেছেন। তিনি 'বিচিত্রা' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। 'কল্লোল' পত্রিকার তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। 'কল্লোল' সম্পর্কে বই লিখেছেন এবং জীবনী-সাহিত্যে বর্তমানকালে অনন্য-সাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছেন। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ, গৌরীমা, কবি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি তাঁর রচনা। সাহিত্যের সর্ববিভাগে এঁর নিপুণ স্বাক্ষর আছে। ইনি দীর্ঘদিন বিচার বিভাগে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছিলেন ঃ

> হ্যারিসন রোডে তখন 'মৌচাকে'র অফিস। ফুটপাথ দিয়ে ঘোরাঘুরি করি। কখনো ভিতরে ঢুকে একখানা

'মৌচাক' চেয়ে নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টাই। কাঠের বেড়ার ওদিকে, আরো ভিতরে অন্ধকার অন্ধকার অফিস। সত্যি অন্ধকার কিনা জানি না, খোঁজ নেবারও দরকার মনে করিনি। সেই সংস্কারটা হয়ত নিজের মনেই সৃষ্টি করেছিলুম—রহস্যের অন্ধকার। বিখ্যাত সব সাহিত্যিকেরা রোজ সেখানে জমায়েৎ হন, সেই তাঁদের পরিবেশের ধূসরতা। না-জানা না-শোনার কল্পলোক। যেন কতদূরের রাজ্য। স্বপ্নের আবছায়া।

সেই গণ্ডির মাঝে কোনোদিন গিয়ে বসতে পাবো এ সেদিন রাজা হওয়ার মতই দুরাশা ছিল। কিন্তু 'মৌচাক' এমনি জিনিস, কোথায় কোন্ ফুলে কি মধু আছে, সব এনে সঞ্চিত করবে তার চক্রপুটে। এ-ব্যাপারে 'মৌচাকে'র কৃতিত্ব অসামান্য, অনন্যসাধারণ। বাংলাদেশে এমন কোনো কৃতী সাহিত্যিক নেই যাঁর সঙ্গে না 'মৌচাক' সম্পর্ক রেখেছে, সে যে-দলেরই হোক বা যে বয়সের। একমাত্র 'প্রবাসী'ই কিছু পরিমাণে এ-জাতীয় সর্বজনীনতার দাবী করতে পারে। কিন্তু যেখানে সামান্যতম প্রতিশ্রুতি নিয়েও লেখকের আবির্ভাব, সেখানেই 'মৌচাক' পাঠিয়েছে তার নিমন্ত্রণ।

...আমি তখন 'বিচিত্রা' অফিসে সাব-এডিটারী করি, যখন 'মৌচাকে' আমার প্রথম লেখা ছাপা হয়।

তারপর প্রায় কুড়ি বছর 'মৌচাকে'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'মৌচাকে'র দৃষ্টিভঙ্গীও যে নিয়ত অগ্রসর, এটাই তার সবচেয়ে বড় কীর্তি। 'মৌচাক'ই একমাত্র কাগজ যে ছেলেমেয়েদের সবসময় নবীন ও অগ্রসন্ধানী রাখবার ব্রত নিয়েছে। তাদের ভাবতে শিখিয়েছে, বুঝতে শিখিয়েছে,

> নিজেদের তৈরী করবার নির্ভুল ইঙ্গিত দিয়েছে।……
> বাংলার জাতীয় ইতিহাসে 'মৌচাকে'র এ দান, এ কৃতজ্ঞতা অবিনশ্বর হয়ে থাকবে।

আমার বেশ মনে আছে আমি ও অচিন্ত্যবাবু দু'জনে মিলে কয়েকবার বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। একবার অন্নদাশঙ্কর রায়ের আমেরিকাবাসিনী বাগদত্তা পত্নীকে এই মঠ দেখাতে এবং আর একবার গিয়েছিলাম আমেরিকাবাসী ইংরাজী ভাষার বিখ্যাত লেখক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাংলা সরকারের বিচার বিভাগে যোগ দেওয়ায় তাঁর সঙ্গে আমার যোগসূত্র একরকম ছিন্ন হয়ে যায় কারণ তিনি প্রায় সব সময়ই বাইরে-বাইরে ঘুরতেন। তবে, 'মৌচাকে'র সঙ্গে যোগসূত্র তিনি নিয়মিত বজায় রেখেছিলেন। ক্রিকেট ও ফুটবল সম্পর্কে নানারকম সরস রচনা লিখে কিশোর কিশোরীদের আনন্দ দিতেন।

আমাদের এই প্রকাশন-সংস্থা থেকেই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বেদে' প্রকাশিত হয়। এছাড়াও আমরা তাঁর অনিমিত্তা, আজন্ম সুরভি ইত্যাদি বই ছেপেছি।

এই জয়ন্তী-মৌচাকে শিবরাম চক্রবর্তী লিখেছিলেন ঃ

> মৌচাক সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার তাঁর কাগজের জন্যে লিখতে বললেন আমায় এবং বলার সঙ্গে সঙ্গে গল্পের দক্ষিণা দিয়ে দিলেন—নগদ আর আগাম। অ্যাঁ, একী। অ্যাতো লিখেও একটা পয়সা পাইনি, আর এই না-লিখেই টাকা পেতে সেই যে আমার হাসি পেলো, সেই হাসিই প্রকাশ পেলো আমার প্রথম ছোটদের লেখায়। তারপর সেই হাসিটি ছড়িয়ে গেলো আমার আরো-আরো গল্পে। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমার সেই হাসিরই সুর।

তাঁর প্রথম গল্প 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ' মৌচাকে প্রকাশিত হয়। পরে এই নামেই আমরা একটি পুস্তক প্রকাশ করি।

শিবরাম চক্রবর্তী এখন 'শিব্রাম' নামে খ্যাত। 'মৌচাকে'র দৌলতেই তাঁর ছোটদের লেখার হাতেখড়ি হয়। তিনি প্রায় তিরিশ বৎসর চিরকুমার অবস্থায় একই মেসে কাটিয়ে দিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের দু'টি কবিতার বই 'মানুষ' ও 'চুম্বন' আমরাই ছেপেছিলাম এবং এই দুটি কবিতার বই সাহিত্যজগতে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল। 'আনন্দবাজারে'র তিনি এখন নিয়মিত ফিচার লেখক। 'অল্প-বিস্তর' ও 'বিসম্বাদ' নামে কৌতুক মিশ্রিত বিদ্রূপের লেখা সকলকেই আনন্দ দেয়।

অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন ঃ

> আমার বয়সে তখন পনেরো কি ষোল। 'শিশু' ও নই, 'সন্দেশ' খাবার সাধও ক্রমে মিটে আসছে। এমন সময় দেখলুম প্রথম সংখ্যা 'মৌচাক'। প্রথম থেকেই মধুর আস্বাদনে আকৃষ্ট হলুম। সুরুতেই ছিল সত্যেন্দ্র-নাথের কবিতা 'সবজান খোলোয়াড় সব জানি খেলতে।' আর শেষের দিকে ছিল নরেন্দ্র দেবের 'ধাঁধা'। তার উত্তর মনে আছে 'বেগম'।
>
> ······পরবর্তীকালে 'মৌচাকে'র জন্য আমিও কলম ধরেছি—ধরতে শিখেছি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ছেলেদের জন্যে লেখা বড়দের জন্যে লেখার চেয়েও শক্ত। তারা ভালো জিনিসটিই চায়। না পেলে ছাড়বে না, অথচ তাদের জন্যে বিশেষ করে ভাবতে হয়। আজকাল আমি অত সময় পাইনে বলে 'মৌচাক'-এর দাবী মেটাতে পারিনে। কিন্তু 'মৌচাক' চিরদিনই আমার প্রিয়। ইতিমধ্যে আমার ছেলেমেয়েদের প্রিয় হয়েছে।

আমাদের দু'পুরুষের কাগজ। আশা করি তিন পুরুষের হবে। সম্পাদক দীর্ঘায়ু হোন।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী লিখেছিলেন ঃ

গত চব্বিশ বছরের মধ্যে জগতে, বিশেষ করে আমাদের দেশে রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য ও জীবনের নানাদিকে যে দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে ইতিহাসে তার তুলনা নেই বল্লেই চলে।

তারপরে কভু উঠিয়াছে মেঘ
কখনো রবি
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো
শান্ত ছবি।

এই সুদিন-দুর্দিনের তোলপাড়ের মধ্যে 'মৌচাক'-সম্পাদক সুদক্ষ কর্ণধারের মতো 'মৌচাক'কে লক্ষ্যের উদ্দেশে নিয়ে চলেছেন এজন্য তাঁকে আজ আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার সি. ভি. রমন পাঠালেন ঃ

My heartiest Bijaya greetings to all the readers of this magazine. Let us all think to-day of our beloved country with her great rivers and wide plains, crowned with the snow-white Himalayas, which to us is the most beautiful in the world. She claims our love and life-long devotion.

বিখ্যাত লেখক বুদ্ধদেব বসু বহুদিন থেকেই 'মৌচাকে' লিখে আসছেন। ঢাকা থেকে তিনি তাঁর বন্ধু কবি অজিত দত্তের সহযোগে 'প্রগতি' পত্রিকা বের করেছিলেন। পরে ১৯৩১ সালে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। তিনি ত্রৈমাসিক

কবিতার পত্রিকা 'কবিতা' প্রকাশ করেন। অল্প দামে বিভিন্ন লেখকের গল্পের সিরিজ ইনি 'কবিতা-ভবন' থেকে প্রকাশ করেন। অধ্যাপনার বৃত্তি নিয়ে তিনি কয়েকবার বিদেশ ঘুরে এসেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন কয়েক বৎসর। তিনি লিখেছিলেন :

মৌচাক পঁচিশ বছরে পড়লো। কয়েক মাস আগে আমি পঁয়তিরিশ পেরিয়েছি। মৌচাকের যখন জন্ম, আমার বয়স তখন এগারো। তার আগে পর্যন্ত বাংলা দেশের কিশোর চিত্তের একচ্ছত্র অধীশ্বর ছিলেন সন্দেশ। যে-বছর সুকুমার রায়ের মৃত্যু হলো, সেই বছরেরই চৈত্র-সংখ্যায় এই হৃদয়বিদারক খবরটি বেরুলো যে সন্দেশ আর বেরুবে না। বালক ছিলুম, সুকুমার রায়ের মৃত্যু-সংবাদে কতটা মর্মাহত হয়েছিলুম মনে নেই কিন্তু মাসে মাসে আর সন্দেশ পাবো না একথা ভেবে মনটা অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছিলো। কিন্তু সেই চৈত্র মাসেরই মাসিকপত্রে বিজ্ঞাপন দেখলুম যে মৌচাক নামে ছোটদের একটি নতুন মাসিকপত্র বেরুচ্ছে। সন্দেশের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই মৌচাকের আবির্ভাব—ঘটনাটি যেন বানানো গল্পের মত সাজানো। তক্ষুনি আমার সমবয়সি একটি আত্মীয়ের নামে ফরমাশ গেলো কলকাতায় মৌচাক আপিশে। তারপর বৈশাখ মাসে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ নির্লজ্জের মতো এতকালের বন্ধু সন্দেশের শোক ভুলে গিয়ে মৌচাক নিয়ে মেতে উঠলুম।

প্রথম সংখ্যার মৌচাকের দুটি জিনিষ আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। প্রথমেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা—

ঝরছে রে মৌচাকের মধু
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ায়—

আর সর্বশেষে একটি ধাঁধা

তিনটি হরফে নাম, শক্ত জবাব,
চিনতো তাদের শুধু বাদশা নবাব
গোড়ার হরফটিকে দাও যদি ছুটি
হতে পারে তাতে বেশ লুচি আর রুটি।

ধাঁধা হিসেবে এটি নিশ্চয়ই অনন্য সাধারণ নয়, কিন্তু এর মধ্যে পদ্যের যে পদলালিত্য আছে, সেইটেই আমার ভালো লেগেছিলো। আরো একটি জিনিস পাওয়া গেল মৌচাকে, যেটি সে-যুগে অত্যন্ত অভিনব। সেটি সম্পাদকের চিঠি। 'ওগো আমার ছোট্ট ভাইবোনেরা, মৌচাকের প্রিয় গ্রাহক-গ্রাহিকা' এই বলে আরম্ভ করে একটি সরস সুস্নিগ্ধ চিঠি লিখে সম্পাদক মশাই আমার, এবং নিশ্চয়ই অনেকের হৃদয় মুহূর্তে জয় ক'রে নিলেন। এখানে ব'লে রাখি যে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের উদ্দেশে সম্পাদকীয় পত্ররচনায় মৌচাকই প্রবর্তক। কয়েক বছর পরে মৌচাকের এই অংশটা ঝরে পড়ে; তারপর সম্প্রতি আমাদের শিশু-পত্রিকাগুলিতে এই চিঠি লেখা ব্যাপারটার প্রবল পুনরভ্যুত্থান দেখা যাচ্ছে—তার আকৃতি প্রকৃতি কিছুই প্রথম মৌচাকের চিঠির মতো নয়। আজকালকার চিঠিপত্র আগাগোড়াই রেডিওর অনুকরণ; সে যুগে রেডিও ছিলো না, চিঠিটা চিঠির মতো করেই লেখা হতো।

মৌচাকের প্রথম সংখ্যা আমাকে এমন অভিভূত ক'রে ফেললো যে দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই সেই আত্মীয়টিকে নিরুদ্বেগে সরিয়ে দিয়ে আমি গ্রাহক হয়ে বসলুম। সম্পাদক মশাইর প্রিয় ভাইবোনদের মধ্যে আমিও একজন হবো না, এ আমার প্রাণে কিছুতেই সইলো না। গ্রাহক

শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে নিয়েই সম্পাদকের উদ্দেশে আমি পাণ্ডুলিপির শিলাবর্ষণ করতে লাগলুম। যদিও বয়স মাত্র এগারো, আমি তখন তিন-চারখানা বড়ো-বড়ো রুল-টানা খাতা কবিতা লিখে ভরিয়ে ফেলেছি, তার উপর প্রতি মাসে স্ব-সম্পাদিত হাতে লেখা পত্রিকায় গল্পপত্ত রচনার খরস্রোত ব'য়ে চলেছে। যখন যে লেখা ভালো লাগতো তক্ষুনি তার অনুকরণে কিছু লিখে ফেলতে না পারলে আমি টিকতেই পারতুম না। মৌচাকের দ্বিতীয় সংখ্যায় গ্রীষ্ম-বিষয়ক একটি পদ্য বেরুলো—খুব সম্ভব হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা, আমি চটপট তার একটি নকল খাড়া করে মৌচাকে পাঠিয়ে দিলুম, এবং চটপট সেটি ফেরৎ এলো। দুঃখিত হলুম, কিন্তু দমে গেলুম না। আমার রচনানীড় থেকে আরো কয়েকটি বাছা বাছা শাবককে মৌচাকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলুম, নির্বিঘ্নে সব কটিই ঘরে ফিরে এলো। ভারি মন খারাপ হয়ে গেলো। মন খারাপ হবার বিশেষ একটু কারণও ছিল। মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় নামে দুটি বালক লেখকের গল্প মৌচাকে বেরুচ্ছিল—জনশ্রুতি শুনেছিলুম তারা আমারই সমবয়সী—তাদের আশ্চর্য রচনাশক্তি দেখে তারিফ করতুম যত, ঈর্ষা করতুম ঠিক ততখানি। হায়রে, তাদের পাশে আমারও কি একটুখানি স্থান হতে পারে না? সে রকম কোন লক্ষণই তো দেখা যাচ্ছে না। কিছুটা আমার মনের অসংবরণীয় উত্তেজনায়, এবং কিছুটা স্নেহান্ধ গুরুজনের প্ররোচনায় মৌচাক-সম্পাদককে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেললুম। সে চিঠি যেমন মূঢ়, তেমনি দুর্বিনীত যেমন উদ্ধত তেমনি কর্কশ। পরের সংখ্যার মৌচাকে সম্পাদকীয় চিঠিতে ছাপার অক্ষরে তার

জবাব পেলুম। সম্পাদক মশাই দয়া ক'রে আমার নামটা যে উল্লেখ করেননি আজও সে-কথা ভেবে তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা হয়।

অমন তীব্র ভৎর্সনা কখনো আমাকে কেউ করেন নি। ব্যথিত হলুম, কিন্তু রাগ করলুম না। ভৎর্সনার ফল ভালো হ'লো, কেননা ওটা যথার্থই আমার প্রাপ্য ছিল। তারপরে মৌচাকে আর কখনো লেখা পাঠাইনি। মোহন-শোভনের সমকক্ষ হবার দুরাশা মন থেকে মুছে গেলো। আমি নম্র হতে শিখলুম। অথচ মৌচাকের পাতায় ছাপার অক্ষরে আমার নামটা দেখবো এ ইচ্ছেটাকে কিছুতেই চাপা দিতে পারছিলুম না।

উদারচিত্ত সম্পাদক মশাই আমার মতো অক্ষমের জন্যও ব্যবস্থা রেখেছিলেন। আমার নাম ছাপা হতো ধাঁধার উত্তরদাতাদের মধ্যে; শ'খানেক নামের মধ্যে আমার নামটি খুঁজে বের করে নিয়ে তারই দিকে মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে থাকতুম। সেখানেও আমার নাম থাকতো শেষের দিকে, অন্তত পঞ্চাশটি নামের পরে। লক্ষ্য করতুম, প্রথম নামটা প্রায় প্রত্যেক মাসেই থাকতো নীলিমা সরকার, তারপর মৃত্যুঞ্জয় বরাট ও পরিমল রায়কে কাছাকাছি পাওয়া যেতো। একবার দেখলুম সর্বপ্রথম নাম পরিমল রায়, তাও আবার তারকা-চিহ্নিত, তলায় ছোটো অক্ষরে লেখা, 'ইনি টেলিগ্রামে ধাঁধার জবাব দিয়াছেন।'

পরবর্তী জীবনে ওই পরিমল রায় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠেন। তাঁর মুখে শুনেছিলুম মৌচাকের ধাঁধার উত্তরদাতাদের মধ্যে তাঁর নাম সর্বপ্রথম ছাপা হোক, এটি তাঁর গভীর আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিলো,

অথচ নীলিমা সরকারের কাছে মাসের পর মাস ক্রমান্বয়ে পরাস্ত হচ্ছিলেন। মরীয়া হয়ে একবার করলেন কী, যেদিন মৌচাক এলো, সেদিনই ধাঁধার জবাব টেলিগ্রাফ করে পাঠিয়ে ছিলেন, যাতে মৌচাক-আপিসে সকলের আগে পৌঁছায়। কিন্তু আমার মাথায় এমন কোনো চমৎকার বুদ্ধি কখনো খেলেনি, বুদ্ধিটা স্বভাবতই কিছু ভোঁতা ছিলো বলে ধাঁধার জবাব বের করতেও আমার বিস্তর সময় লেগে যেতো—তাই লাস্ট বেঞ্চি থেকে আমি আর প্রোমোশন পেলুম না। তবে গ্রাহক-গ্রাহিকার চিঠির মধ্যে আমারও হু'চারখানা চিঠির ভগ্নাংশ যখন ছাপা হলো, তখন আমার মৌচাক-সাধনার একটি সিদ্ধির সোপানে আমি যেন এসে পৌঁছলুম। লেখা ছাপা না-হয় হয়ইনি—চিঠি তো ছাপা হয়েছে।

ইতিমধ্যে একবার কলিকাতায় এসে গুরুজনের সঙ্গে ৯০।২এ হ্যারিসন রোডে, মৌচাক আপিস দেখে গিয়েছিলুম। সম্পাদক মশাইকে চোখে দেখলুম, বইয়ের ভরা ঘরটির সৌগন্ধ্য নিঃশ্বাসে গ্রহণ করলুম—কোনো কথা নিশ্চয়ই বলিনি, কেননা আজকালকার ছেলেদের মতো স্মার্ট আমি ছিলুম না। একটি মূল্যবান স্মৃতি বহন করে নিয়ে ফিরে গেলুম আমার পাড়াগেঁয়ে শহরে।

এরই অল্পকাল পরে আমি বড়ো হয়ে উঠলুম, বড়ো শহরে এলুম, অদূরে কলেজ দেখা যাচ্ছে। মৌচাকের গ্রাহক কথাটা আর যেন আত্মসম্মানের অনুকূল মনে হ'লো না। তারপর কলেজ জীবনের প্রথম পর্যায় ফরাশি, রুশ এবং স্ক্যাণ্ডিনেভীয় সাহিত্যের মধ্যে এমনভাবে মগ্ন হলুম যে মৌচাকের কথা আর মনেই রইলো না। স্বরচিত খান হু'তিন বইও প্রকাশিত হলো, নিজের সম্পাদনায়

মাসিকপত্র বেরুলো—এবার আর হাতে লেখা নয়, একেবারে ছাপার অক্ষরে।

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতায় এসেছি। বন্ধু অচিন্ত্যকুমার বললেন, 'সুধীরবাবু তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান, চলো তোমাকে নিয়ে যাই।' একদিন ছুপুরবেলা ১৫নং কলেজ স্কোয়ারের খসখস্-এর পর্দা-ঢাকা ঘরে অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে প্রবেশ করলুম। সুধীরবাবু আমার কাছে মৌচাকের জন্য লেখা চাইলেন। আমি বললুম, 'ছোটদের জন্য তো কখনো লিখি নি।' সুধীরবাবু বললেন, 'লিখুন না।' মনে-মনে ভাবলুম, দেখি না চেষ্টা করে, হয়তো পারবো। ঢাকা ফিরে গিয়েই একটি কবিতা লিখে পাঠালুম, পরের সংখ্যার প্রথমেই সেটি ছাপা হলো। মৌচাকে সেই আমার প্রথম লেখা, তারপর গদ্য-পদ্য অজস্র লেখা মৌচাকে লিখেছি তা সকলেই জানেন।

মৌচাক-সম্পাদক উশকিয়ে না দিলে ছোটদের লেখায় আমি কখনোই হয়তো হাত দিতুম না। আমার সমসাময়িক অনেক লেখকের সম্বন্ধেই এই কথা বলা যায়। সন্দেশ ছিল একটি প্রতিভাবন পরিবারের মুখপাত্র, আর মৌচাকে বাংলার সমগ্র সাহিত্যজগৎ প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যিনিই কিছু-না-কিছু কৃতী হয়েছেন, তাঁকেই সুধীরবাবু মৌচাকের লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন—এটি তাঁর সম্পাদনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যিনিই বড়োদের জন্য ভালো লিখেছেন, তাঁকে দিয়েই তিনি ছোটদের জন্য লিখিয়ে নিয়েছেন—ফল প্রতি ক্ষেত্রেই ভালো হয়েছে। মৌচাকের লেখক-তালিকার মধ্যে ভারতী-যুগ থেকে কল্লোল-যুগ পর্যন্ত সকল নামজাদাকে পাওয়া যাবে।

এক সময়ে আমাকে ছোটদের লেখার একটা নেশায় পেয়েছিলো, বলেই লিখতে পারতুম। তার পিছনে ছিলো মৌচাক সম্পাদকেরই দরাজ দাক্ষিণ্য। মনে আছে একবার রাত জেগে মৌচাকের জন্য লিখছিলুম, একটি গল্প শেষ ক'রে মনে হ'ল আর একটা লিখি, তক্ষুনি আরম্ভ করলুম এবং শেষ ক'রে শুতে গেলুম। আজ আর ছোটদের জন্য লিখতে মনের মধ্যে সে রকম উৎসাহ পাই না। মৌচাকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা কমে গেছে, লেখক-সংখ্যা বেড়েছে, এবং তরুণ লেখকদের জায়গা ছেড়ে দেয়া বড় লেখকদের সামাজিক কর্তব্য।

একটা মজার গল্প বলে এ-লেখা শেষ করি। আমার বয়স তখন বাইশ কি তেইশ। একদিন সন্ধ্যাবেলা বাস্‌-এ করে ভবানীপুরে বাড়ি ফিরছি। হাতে সদ্য-প্রকাশিত একখানা মৌচাক, তক্ষুনি মৌচাক-আপিস থেকে নিয়েছি। বাস-এ বসেই একটি সিগারেট ধরিয়ে খুব আগ্রহ সহকারে মৌচাক খুলে পড়ছি, পাশের একটি ছোকরা-মতো ভদ্রলোক আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'Subscriber?' আমি নেতিসূচক মাথা নেড়ে আবার মৌচাকে মন দিলুম, কিন্তু বুঝতে পারলুম এই লোকটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ। তিনি জানতে চেয়েছিলেন আমি মৌচাকের গ্রাহক কি না, এবং ঐটুকু বয়সেই সিগারেট ধরেছি কি না। আপনি বলবেন না তুমি বলবেন স্থির করতে না পেরে প্রশ্নটা অস্পষ্টভাবে করেছিলেন, জবাব যেটা পেলেন সেটাও সুস্পষ্ট নয়। হয়তো আমার চেহারা এবং মৌচাক পাঠে আমার গভীর আগ্রহ—দুটোই তাঁকে প্রতারিত করেছিলো। হয়তো অনেকক্ষণ মনে মনে এ নিয়ে তিনি

যন্ত্রণা ভোগ করেছেন—সত্যি মৌচাকের একজন গ্রাহক বাস-এ বসে সিগারেট খাচ্ছে, এ দৃশ্য কি সহ্য করা যায়!

বুদ্ধদেব বসুর সমগ্র রচনাটিই উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারলুম না—কারণ মৌচাকের বিষয় বলতে বসে তিনি তাঁর নিজের কিশোর-জীবনের একটা দিক সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছেন।

'পথের পাচালী', 'অপরাজিত', 'দেবযান' প্রভৃতির বিখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'জয়ন্তী-মৌচাকে' লেখেন:

১৯২৫ সালের কথা। ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম সুধীরবাবুদের দোকানে যাই। সেখানে তখন প্রতি বিকালে একটি সাহিত্যিক আড্ডা হোত। আমি তখন নবীন সাহিত্যিক, 'প্রবাসী'তে কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছি মাত্র। এবং 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের খসড়া করেছি। এঁদের এই বৈকালিক আড্ডাটি আমার বড় ভালো লাগতো। কাজ কর্মের অবসরে মাঝে মাঝে 'মৌচাক' অফিসে এসে এই আড্ডাতে যোগ দিতাম। ১৯২৯ সালে আমি আবার কলিকাতায় ফিরে আসি কয়েক বছর বিহার প্রবাসের পর। ঐ বৎসরই 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হয়। ঐ সাল থেকে 'মৌচাক' অফিসে আমার যাওয়া আসা বাঁধা নিয়মে সুরু হয়ে গেল।

অনেক সাহিত্যিক, শিল্পী, মজলিশী ও রসিক ব্যক্তির সমাগমে 'মৌচাক'-এর আড্ডা গমগম করতো। এইখানেই বন্ধুবর হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণীন্দ্রলাল বসু ও ৺সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। সুধীরবাবুর আদর আপ্যায়নে কত বর্ষার বৈকাল ও শীতের সন্ধ্যার চায়ের মজলিস এখানে সরস ও আনন্দময় হয়ে উঠেছে, কত ঠোঙা ঠোঙা 'অবাক জলপান'

ফেরিওয়ালার ঝুলির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বাদল দিনে অতিথি সৎকারে সহযোগিতা করেছে ; 'মৌচাক'-এর ইতিহাসের সঙ্গে সে সবের ইতিহাসও জড়ানো।

একদিন সুধীরবাবু বলেন : বিভূতিবাবু 'মৌচাকে'র জন্য লিখবেন ?

আমি একপায়ে খাড়া। বল্লুম—নিশ্চয়ই।

—কি লিখবেন বলুন।

—কি ধরনের লিখি আপনিই বলুন।

—ছেলেদের উপন্যাস দিন। কি বলেন ?

এভাবে ছেলেদের জন্যে লেখা উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়ে'র সূত্রপাত। সুধীরবাবুর উৎসাহ না পেলে হয়তো এ বই লেখাই হোত না।

আজকাল কলকাতা থেকে দূরে বাস করি। কিন্তু 'মৌচাক'-এর বৈকালিক আড্ডার আকর্ষণ এমনই মোহ বিস্তার করেছে মনে যে কলকাতায় এলে ওখানে না গিয়ে পারি না, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও যাওয়া চাইই।

বন্ধুবর সরোজ রায়চৌধুরী আসে, সুধীরবাবু ও অপূর্ববাবু তো থাকেনই—অতীত দিনের আনন্দমুহূর্তগুলি আবার যেন সজীব হয়ে ওঠে। সেসব দিনের হারানো অনুভূতিগুলো আবার যেন ফিরে পাই। সেজন্যই 'মৌচাক' কাগজের ওপর আমার কেমন একটা ব্যক্তিগত টান আছে—এর ভালমন্দ ব্যক্তিগত লাভক্ষতির দৃষ্টি নিয়েই দেখি।

আমি জানি 'মৌচাক' শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দবর্ধন করে না, তাদের পিতামাতারও অবসর বিনোদনে যথেষ্ট সাহায্য করে।

চাইবাসায় একটি বন্ধু গভর্ণমেণ্টের এঞ্জিনীয়ার ও

বিদ্বান ব্যক্তি। আমায় বললেন—এবার 'মৌচাক'-এ হেম বাগচীর 'গররমেটো' কবিতা পড়েছেন?

আমি বল্লুম—এখনও পড়িনি।

—পড়ে দেখবেন। চমৎকার রস আছে ওর মধ্যে। আজ দুপুরে মশগুল হয়েছিলাম মৌচাক খানা নিয়ে। এ রকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। একটা মাত্র মনে হোল।

'মৌচাক'-এর লেখা যখন লিখতে বসি, তখন কল্পনা-নেত্রে দেখি বহু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও তাদের কর্মক্লান্ত পিতাঠাকুরদের উৎসুক দৃষ্টি, সবাই যেন লেখার দিকে চেয়ে রয়েছে এক দৃষ্টে—তবে অক্ষমতার জন্যে তাদের সে ঔৎসুক্য চরিতার্থ হয়তো সবসময় করে উঠতে পারি না—সে কথা আলাদা।

'জয়ন্তী-মৌচাকে'র প্রতি পৃষ্ঠা এই রকম প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের স্মৃতিকথায় ভরপুর। এঁদের মধ্যে বহু সাহিত্যিককে আমিই অনুপ্রাণিত করেছি শিশুসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাঁদের প্রতিভার বীজ বপন করতে। এবং আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, যে সব সাহিত্যিক তাঁদের শিশু-সাহিত্য-প্রতিভার প্রথম বীজ 'মৌচাক'-এ বপন করেন, পরে তাঁদের সেই অঙ্কুর মহীরূহে পরিণত হয়। এই-খানেই আমার তৃপ্তি।

এই দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর ধরে 'মৌচাক' যে আবালবৃদ্ধবনিতাকে আনন্দদান করে এসেছে তার জন্যে সম্পাদক হিসেবে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই। 'মৌচাক' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখনকার যেসব কিশোর পাঠক-পাঠিকা ছিল—আজ তারা আর কিশোর নেই, কিন্তু তাঁদের উৎসাহ ও আগ্রহ আজকের কিশোর-কিশোরীদের থেকে কিছুমাত্র কম নয়।

'মৌচাকে'র মধু যে সহজে ফুরোবার নয়, তার বহু প্রমাণ আছে। এমন কয়েকজন গ্রাহক আছেন যাঁরা, এই দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর ধরেই

'মৌচাকে'র গ্রাহক—তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম হল ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, যিনি বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ব্যবহারজীবী অতুলচন্দ্র গুপ্তের পুত্র। তিনি এই দীর্ঘকালের মধ্যে একটি দিনের জন্যও 'মৌচাকে'র সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেননি।

আমি শুধু এইটুকুই ভাবি আর আনন্দ পাই যে 'মৌচাক' তার মধুভাণ্ড থেকে অকৃপণভাবে মধু বিতরণ করে যাচ্ছে সারা ভারতের কিশোর-কিশোরীদের কিন্তু ভাণ্ডের মধু একবিন্দুও কমছে না। একটি শিশু-পত্রিকার দিক থেকে এতবড় গৌরব আমি একাই দাবী করতে চাই না—এর অংশীদার হচ্ছেন বাংলার সমস্ত কিশোর-কিশোরী ও সাহিত্যিকবৃন্দ।

পুস্তক প্রকাশন ব্যবসার সংস্পর্শে এসে এবং কলকাতার একটি পুরাতন ও নামকরা প্রকাশন-সংস্থার কর্ণধাররূপে থাকার দরুণ আমাকে নানারকম সাহিত্যিক প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়েছে। তাই কয়েকটি প্রচেষ্টার বিষয় এখানে উল্লেখ করছি।

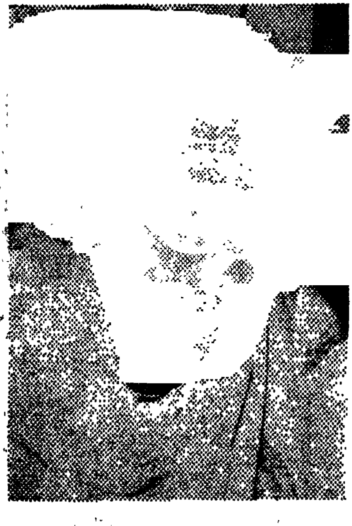
পুস্তক ব্যবসায় বহুদিন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার পর আমার মনে হল যে, বহু পুস্তক প্রকাশ করে এবং বিক্রয় করে অর্থ উপার্জনই কেবল হচ্ছে কিন্তু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা সরাসরিভাবে কিছু হচ্ছে না কিংবা সাহিত্যিকদের সঙ্গে সত্যকার অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হচ্ছে না। সেইজন্য বছর বারো-তেরো আগে প্রতি বৈশাখ মাসে একটি সাহিত্য-আসরের অনুষ্ঠান সুরু করলাম। এই অনুষ্ঠানে বাংলার সমস্ত সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানাতাম বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে নিছক মেলামেশার জন্য। এই আসরে প্রতি বৎসর রাজশেখর বসু মহাশয় একটি করে সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করতেন। তাছাড়া সভাপতি থাকতেন বিমলচন্দ্র সিংহ, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, আচার্য যদুনাথ সরকার প্রভৃতি।



অন্নদাশঙ্কর রায়



বুদ্ধদেব বসু



অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত



প্রেমেন্দ্র মিত্র



গজেন্দ্রকুমার মিত্র



প্রবোধকুমার সান্যাল



মনোজ বসু



বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে আছে, একবার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় বললেন যে, প্রকৃত সাহিত্যিকদের উৎসাহ দেবার জন্যে আমাদের দেশের ধনী-ব্যক্তিরা কোনো অর্থানুকূল্য করেন না। এই অনুযোগ শোনবার পরেই সেই সভাতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার বাৎসরিক দু'হাজার টাকা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ দু'হাজার টাকা এবং 'মৌচাকে'র পক্ষ থেকে আমি শিশু-সাহিত্যিকদের জন্য বার্ষিক পাঁচশো টাকা, এবং 'উল্টোরথ' পত্রিকার কর্ণধাররা কবিতার জন্য বার্ষিক পাঁচশো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করি। সেই থেকে এই পুরস্কারগুলি প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে বৎসরের শ্রেষ্ঠ লেখকদের দেওয়া হয়ে আসছে।

এর পর আমি দেখলাম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের তবু যাহোক একটা সম্মান-দক্ষিণার ব্যবস্থা হোল, কিন্তু দুঃস্থ ও মৃত সাহিত্যিকদের পরিবারের জন্য কোনই ব্যবস্থা নেই। পরের বছর এই দুঃস্থ সাহিত্যিকদের পরিবারের সাহায্যের জন্য সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে পাঁচ-ছয় হাজার টাকা সংগ্রহ করে ফেললাম এবং বেশ কয়েক বছর কয়েকজন দুঃস্থ সাহিত্যিক পরিবারকে মাসিক অর্থ সাহায্য করা হোল। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থ সংগ্রহে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেন। কয়েকজন পরলোকগত বিশিষ্ট লেখকদের বিধবা পত্নীগণ এই ভাণ্ডার থেকে বৃত্তি লাভ করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে কলকাতায় হুমায়ুন কবিরের প্রচেষ্টায় যে All-India Writers' Conference হয় তাতে আমি কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলাম এবং সেই সুবাদে সবশুদ্ধ আঠারো হাজার টাকা উঠেছিল। এই সম্মেলনে মনোজ বসু ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। এঁরা দু'জনেই এতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ ও

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল উপস্থিত ছিলেন। এঁরা ছাড়াও কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, মুলকরাজ আনন্দ, মামা ওয়ারেরকার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও আমার অন্যান্য কাজকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: বঙ্গীয় পুস্তক-প্রকাশক সভার কয়েক বৎসর সভাপতি, বোম্বাইয়ে স্থাপিত সর্বভারতীয় পুস্তক বিক্রেতাদের সভাপতি, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের পাটনা অধিবেশনে ও নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের কটক অধিবেশনে শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতি হওয়া। এছাড়া পি. ই. এন সংস্থার কলকাতা শাখার আমি সম্পাদক ছিলাম চার বছর। মণীন্দ্রলাল বসু ছিলেন কোষাধ্যক্ষ, তিনি এখনও কোষাধ্যক্ষ আছেন। আমার বাড়ীতেই পি. ই. এন-এর কয়েকটি অধিবেশন হয়েছিল এবং কয়েকজন বিদেশী সাহিত্যিকও এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪২ সালে বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারত সরকার কর্তৃক কাগজ-নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হয়। তাতে সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকাগুলির কাগজ ব্যবহার সরকার আইন দ্বারা বেঁধে দিলেন। এতে সমস্ত পত্রিকারই ক্ষতি হয়। পঞ্জিকা ইত্যাদি ধরনের বই একেবারে বাতিল করে দেওয়া হয়। বেশী কাগজের জন্য আমি সরকারের কাছে দরবার করি। এই সময় কয়েকজন শিশু-সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক মিলে একটি শিশু-সাহিত্য পরিষদ গঠন করি। এঁদের মধ্যে ছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, কামাক্ষী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও আমি। এই পরিষদই পরে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ শিশু-সাহিত্যের প্রসার আন্দোলনে বিস্তৃতি লাভ করে। এই সমিতির আমি একবার সভাপতি হয়েছিলাম।

এ সব প্রচেষ্টা ছাড়াও সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রেও আমার ঝোঁক ছিল ছেলেবয়স থেকেই। এই সূত্রে আমি কয়েকটি বই সঙ্কলন ও সম্পাদনা করেছি, অনেক সাময়িক পত্র-পত্রিকাও প্রকাশ

করেছি। আমার সঙ্কলিত ও সম্পাদিত পুস্তকগুলির নাম এখানে দিলাম :

Hindustan Year-Book, Notable Indian Trials, Book of General Knowledge, General Knowledge Geography, Summary of the Indian Constitution, পৌরাণিক অভিধান, জীবনী অভিধান, বিবিধার্থ অভিধান, বাংলা এনসাইক্লোপিডিয়া প্রভৃতি। শেষোক্ত বইটি প্রকাশের অপেক্ষায়।

আমার জীবনের সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় যে সমস্ত মনীষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ হয়েছে তার কিছু কিছু বিবরণ এই জীবনীর মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। এবার এমন একজন বিশ্ববিশ্রুত মনীষীর কথা বলব যাঁর সঙ্গে কোনো রকম চাক্ষুষ পরিচয়ের সৌভাগ্য না ঘটলেও তাঁর ঐতিহ্যমণ্ডিত অবস্থানস্থলে গিয়ে তাঁর স্মৃতিপূজা করে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। তিনি হলেন এক এবং অদ্বিতীয় জর্জ বার্নার্ড শ।

১৯৬৪ সালে আমি যখন ইউরোপ ভ্রমণে যাই তখনই বার্নার্ড শ যেখানে থাকতেন সেই পুণ্য তীর্থক্ষেত্রটি দেখবার জন্যে আমার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। একদিন সে সুযোগ এসে গেল।

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে জর্জ বার্নার্ড শ একটি স্মরণীয় ও বরণীয় নাম। নাট্যকার ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী আত্মজিজ্ঞাসা, আধুনিক যুগ ও জীবনের মনীষাদীপ্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, সর্বোপরি ব্যঙ্গাত্মক বক্রোক্তি, মন্তব্যের গভীরতা তাঁকে সাহিত্যজগতে অমর করে রেখেছে। যে সব বিদেশী বন্ধু পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার দাবী পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করেছিলেন জর্জ বার্নার্ড শ তাঁদের অন্যতম। শ ছিলেন খাঁটি আইরিশম্যান, তিনি স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলেও একান্তভাবে স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি

একজন খাঁটি সমাজতন্ত্রী এবং সেই সূত্রে 'ফেবিয়ান' দলভুক্ত ছিলেন।

লণ্ডন শহর হ'তে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে হার্ট ফোর্ডসায়ারের একটি ছোট গ্রাম এ্যাওট সেণ্ট লরেন্সে ইনি জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করেন। ১৯০৬ সালে এই গ্রামে এসে একটি সামান্য কুটির বেঁধে বসবাস করেন এবং ১৯৫০ সালে চুরানব্বই বৎসর বয়সে এই গ্রামেই ইনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এ্যাওট সেণ্ট লরেন্সে ঐ অংশটি 'শ-জ কর্ণার' নামে খ্যাত। মৃত্যুর পর শ-র সম্পত্তি এসেছে এখন 'ন্যাশন্যাল ট্রাস্টে'র হাতে। তাই এই কুটিরটিও এখন জাতীয় সম্পত্তিরূপে রক্ষিত হয়েছে। এই কুটিরটির ঐতিহ্য, এখানে রক্ষিত প্রতিটি জিনিস অদ্ভুত একটি মনীষার প্রতিভাদীপ্ত স্পর্শে যেন সমুজ্জ্বল। এই কুটিরটি সম্বন্ধে তাই একটু বিশদভাবে বলবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

বার্নার্ড শ-র এই গ্রামে এসে বসবাস শুরু করার একটি রহস্যময় ইতিহাস আছে। সেটি হলো: এখানে মেরী এ্যান সাউথ নামে এক মহিলার সমাধি রয়েছে। এই সমাধির স্মৃতিফলকে লেখা আছে তাঁর জন্ম ১৮২৫ সাল থেকে মৃত্যু ১৮৯৫ অর্থাৎ তিনি সত্তর বৎসর বেঁচে-ছিলেন। এই ফলকে আরও একটি কথা উৎকীর্ণ আছে— **Her time was short**। কথিত আছে—এই মহিলার মত দীর্ঘায়ু হবার ইচ্ছাতেই তিনি এই সমাধি-সংলগ্ন জমি কিনে কুটির তৈরী করে এখানেই বসবাস শুরু করে দেন। বলা বাহুল্য শ-র সে আশা মিটেছিল। ঐ মহিলাটির চেয়েও বেশী পরমায়ু পেয়েছিলেন তিনি।

প্রায় বিঘে বিশেক জমির ওপর তৈরী দোতলা হলেও কুটিরটি ছোট্ট। একতলায় মোট চার খানা ঘর—ঘরগুলি অবশ্য বেশ প্রশস্ত। এই ঘরগুলিতে শ-র ব্যবহৃত জিনিসগুলি সযত্নে রাখা রয়েছে।

১৯০৬ সালে এখানে এসেই শ-এর **The Doctor's Dilemma** প্রথম অভিনীত হয়। এর আগে **Arms and the Man, Caesar**

and Cleopatra, John Bull's other Island ও Candida লিখে শ-র খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কুটিরে ঢুকবার মুখে দরজায় আছে একটি অদ্ভুত ধরনের পিতলের তৈরী শ-র প্রতিকৃতি সম্বলিত হাতল—এটি কোন বন্ধুর উপহার। সেই হাতলের ওপর লেখা রয়েছে Man and Superman। শ-র ব্যবহৃত কতকগুলি জিনিস রাখা রয়েছে ডান দিকের একটি ঘরে—এতে আছে অনেক রকমের টুপি, দস্তানার বাক্স এবং ছড়ি। এদের মধ্যে একটি বেশ জমকালো টুপির ওপর সহজেই চোখ পড়ে, যেটি তিনি দীর্ঘ ষাট বছর ধরে ব্যবহার করেছিলেন। শ যে সৌখীন মানুষ ছিলেন এসব দেখে তা বেশ বোঝা যায়। ছাতা রয়েছে প্রায় পনেরোটি—সব বিভিন্ন ধরনের। কাছেই একটি বাস্কেট চেয়ার পাতা আছে। শুনলাম এই চেয়ারে বসে জুতো মোজা পরতেন, তারপর সেজেগুজে তিনি রোজ গ্রামে বেড়াতে যেতেন।

দেওয়ালের কাছে রয়েছে তাঁর প্রিয় পিয়ানোটি। নাট্যকার বার্নার্ড শ যে খ্যাতিমান সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন এ হয়ত অনেকেরই জানা নেই। শুধু তাই নয় তিনি একজন বিখ্যাত সঙ্গীত সমালোচকও ছিলেন। ছদ্মনামে নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি সঙ্গীত-সমালোচনা করতেন। পিয়ানোর ধারেই তাঁর অনেক গানের বই ও স্বরলিপি রাখা রয়েছে।

শ-এর পড়ার ঘরটিতে ঢুকলে থমকে দাঁড়াতে হয় দর্শকদের। ডেস্কের উপর কাগজ, কালি, কলম, পেন্সিল—বহু বইপত্র-অভিধান সব এমনভাবে ছড়ানো রয়েছে মনে হয় এইমাত্র এখানে তিনি বসে লিখছিলেন। এই ঘরে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব ও কয়েকজন খ্যাতনামা লেখক-লেখিকার ছবিও টাঙানো। অপর একটি ডেস্কে সাজানো আছে নোবেল পুরস্কারের সনদসহ আইরিশ আকাদেমী অব লেটার্স হতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের পদক ও অন্য অনেক উপহার। এখানে একটি ছোট গ্রন্থাগারও রয়েছে। তার দেয়ালে পৃথিবীর বিখ্যাত

মনীষীদের প্রতিকৃতি টাঙানো। শ কুশলী চিত্রশিল্পীও ছিলেন, পাকা ফটোগ্রাফার হিসাবেও তাঁর নাম ছিল। জীবনের পঞ্চাশ বৎসরকাল ক্যামেরা ছিল তাঁর নিত্যসহচর। তিনি যে দু'টি ক্যামেরা ব্যবহার করতেন সেগুলিও এখানে আছে।

চিন্তাবিদ বার্নার্ড শ অনেক সময় কৌচে হেলান দিয়ে চিন্তা করতেন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে। কখনও কখনও এই কৌচে স্রেফ বিশ্রাম নিতেন। সেই কৌচটির পাশে ছিল শ সম্পর্কে প্রকাশিত কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্র। আর আছে আইরিস কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস্, লেডী গ্রেগরী, উইলিয়ম আর্চার, সিডনী ওয়েব, ব্যারী ও চেস্টারটনের ছবি। একের পর এক ছবি দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ দুটি প্রতিকৃতির উপর চোখ পড়তে অত্যন্ত বিচলিত ও বিস্মিত বোধ করলাম। সেই সঙ্গে এই মহামনীষীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা নত হয়ে এলো—প্রতিকৃতি একখানি বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের, অন্যটি মহামানব মহাত্মা গান্ধীর।

পড়ার ঘরটির পাশেই ড্রইং-রুম, এটি মিসেস্ শ-র বলা চলে এখানে বিয়ের আরো আগের শ-র পত্নীর একখানি বিরাট প্রতিকৃতি রয়েছে। ১৯৪৩ সালে পত্নীর মৃত্যুর পর শ এই ঘরে বড় একটা আসতেন না। এখানে চিমনী পিসের উপর কারুকার্য খচিত জোয়ান অব আর্কের প্রতিমূর্তি বসানো হয়েছে। অনেকের মতে এই 'জোয়ান অব আর্ক'ই তাঁর শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তি। ১৯৩৮ সালে সর্বশ্রেষ্ঠ ছায়াচিত্রের জন্য শ এই মূর্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন। শেক্সপীয়ারের মূর্তিও এখানে দেখলাম। এ ছাড়া আর যে সব মূর্তি রয়েছে তাদের মধ্যে প্রখ্যাত ভাস্কর রোঁদার খোদাই করা শ-এর মূর্তিসহ অন্যান্যদের তৈরী শ-এর দু-তিনটি মূর্তিই প্রধান।

এরপর আমরা এলাম ডাইনিং-রুমে। এখানে শ অনেকক্ষণ কাটাতেন।

নিরামিষাশী শ দুপুরে পড়তে পড়তে খেতেন। অনেক সময় তাঁর

ছু-ঘণ্টারও বেশী লেগে যেত এইভাবে খাওয়া শেষ করতে। সন্ধ্যায় কিন্তু সকাল-সকাল সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আগুনের সামনে বই পড়তেন। কখনও বা রেডিও শুনতেন। শেষবয়সে শ মধ্যরাত্র পর্যন্ত এইভাবে কাটিয়ে দিতেন।

ড্রইং-রুমের সামনে খোলা বারান্দা, এই বারান্দা পার হলেই নরম সবুজ ঘাসে-ঢাকা প্রশস্ত মাঠ। আমরা যেদিন সেখানে যাই সেই সময়ে সেই মাঠের মুক্তাঙ্গন মঞ্চে শ-র Back to Methuselah আবৃত্তি ও অভিনয় হয়েছিল। এটি পুরোপুরি নাট্যাভিনয় ছিল না। অত্যন্ত অনাড়ম্বর সহজ সরল পদ্ধতিতে এই অভিনয় করা হয়। মাত্র তিনটি চরিত্র—আদম, ইভ ও সারপেন্ট। প্রায় ছু'ঘণ্টা ধরে আমরা তিন শো জনেরও অধিক দর্শক এই অভিনয় দেখলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

এই মাঠের পরে আরণ্যক পরিবেশ প্রাচীন ভারতের তপোবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্যামল তরুবীথিকায় ঘেরা এই বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে সর্পিল পথ। অন্ধকার পথের বাঁকে হঠাৎ এক শ্বেতবসনা নারীমূর্তি দেখে গা ছম-ছম করায় আমি থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি এটি সেণ্ট জোয়ানের সাদা পাথরের মূর্তি। কোন এক গুণমুগ্ধ ভাস্কর শ-কে এই মূর্তি উপহার দেন। এই নির্জন বনভূমি শ-র মনকে টানতো। তাই প্রাকৃতিক ছুর্যোগের দিনগুলি ছাড়া শ এখানে না এসে পারতেন না। হাজারো কাজ ফেলে তিনি হাজির হতেন ঠিক সন্ধ্যা পাঁচটার পর। এই ঘন বনের মধ্যে তাঁর একটি কাঠের ঘুরন্ত গ্রীষ্মাবাস ছিল। অগণিত বন্ধু-বান্ধব, গুণগ্রাহী ও গুণমুগ্ধদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য শ অনেক সময় গোপনে এখানে পালিয়ে আসতেন। ছোট ঘরের মধ্যে কোনমতে ঢুকে পড়ে বাঁচতেন। এখানে একটি ছোট্ট টেবিল রয়েছে। এই টেবিলের সামনে বসে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখে যেতেন কখনও বা এই টেবিলের উপর শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নিতেন। এখনও

সেই টেবিল এবং টেবিলের উপর কালি, কলম, দোয়াত, পেন্সিল, ছুরি ইত্যাদি সবই ছড়ানো রয়েছে। এমন কি ফুলস্কেপ কাগজ পর্যন্ত চাপা দেওয়া রয়েছে, যেন নাট্যকার শ তাঁর কোন বিখ্যাত নাটকের যবনিকাপাত ঘটিয়ে এইমাত্র উঠে গেলেন। সূর্য-প্রেমিক শ বরাবরই আলোর পিয়াসী ছিলেন। তাই সূর্যরশ্মির দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাঁর ছোট কাঠের ঘরটিকে ঘুরিয়ে দিতেন এবং সূর্যের মুখোমুখি বসে কলম চালিয়ে যেতেন।

সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক জ্ঞান-তপস্বী বার্নার্ড শ-র অর্ধশতাব্দীর মহনীয় জীবনের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যতীর্থে সেদিন তিনঘণ্টাকাল অতিবাহিত করে আমরা আবার লণ্ডনের পথে রওনা হয়ে এলাম তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়ে।

দেশভ্রমণের নেশা আমার ছেলেবেলা থেকেই। সময় পেলেই এখান-ওখান-সেখান ঘুরে বেড়িয়েছি। নতুন নতুন দেশ দেখে সেখানকার লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। আর আমার নিজের মনে হয় দেশভ্রমণ করতে গেলে একা-একা ভাল লাগে না। মনের মত সঙ্গী-সাথী যদি না থাকে তবে ভ্রমণের আনন্দটা যেন পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না।

১৯১৮ সালে যখন আমি 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, তখন কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম যে কয়েকদিনের জন্যে বাইরে ঘুরে আসা যাক। ঠিক হল ভুবনেশ্বর যাওয়া হবে। যদিও তখন ভুবনেশ্বর উড়িষ্যার রাজধানী হয়নি, কিন্তু ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মহিমা ও স্থানমাহাত্ম্য বরাবরই আমাদের মনে গাঁথা ছিল। আমাদের এই ছোট্ট দলটির মধ্যে ছিল প্রেমাঙ্কুর, চারু, নরেন, হেমেন্দ্র, অমর দেব এবং আমি। প্রথমে আমরা যাই কটক—কটক থেকে যাই ভুবনেশ্বর। ভুবনেশ্বরে তখন সবেমাত্র রামকৃষ্ণ মিশন একটা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন—সেইখানে আমরা আশ্রয়লাভ করি। সেখানে তখন

রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা গিয়ে পৌঁছনোমাত্রই তাঁর দর্শনলাভ হয় এবং তাঁর পদধুলি গ্রহণ করে নিজেদের ধন্য মনে করলাম।

ভুবনেশ্বরে বহু মন্দির আছে—সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লিঙ্গরাজ, মুক্তেশ্বর, রাজারাণী, ভিতল দেউল, ব্রহ্মেশ্বর, পরশুরামেশ্বর প্রভৃতি। এছাড়া প্রায় ছ-মাইল দূরে হল উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি। শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে মন্দিরগুলি অবস্থিত। জৈন সন্ন্যাসীরা এই মন্দিরের গুহায় বাস করতেন। মন্দিরগুলির কারুকার্য অদ্ভুত ধরনের এবং এর সূচনা হয় যীশুখৃস্টের জন্মেরও পূর্বে।

মন্দিরগুলি আমরা সবাই বেশ ভালো করে দেখলাম। চারু আমাদের সঙ্গে থাকায় মন্দিরগুলির স্থাপত্য ও শিল্পধারা সম্বন্ধে আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় নি। শোনা যায় এখানে নাকি সাত হাজার মন্দির ছিল, এখন তার মধ্যে মাত্র একশো পঞ্চাশটি অবশিষ্ট আছে। এই সমস্ত মন্দিরই ৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল।

এখান থেকে আমরা গেলাম পুরী। পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দির তো দেখলামই—আর শুধু দেখলাম না অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম এখানকার সমুদ্রের অপূর্ব রূপ দেখে। এই আমার প্রথম সমুদ্র দেখাই বলব, কারণ খুব বাল্যকালে যে সমুদ্র দেখে-ছিলাম, তার কোন ছাপই আমার মনে ছিল না। এখানে উত্তাল তরঙ্গময়ী সুনীল জলধির সঙ্গে নীল আকাশের মিতালি দেখতে দেখতে মন যে কোন অতলে ডুব দেয়, কেমন একটা অনির্বচনীয় পুলকে সারা মন ও দেহ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তা বলে বোঝানো যায় না। প্রথমবার যাওয়ার পর পুরী আমাদের এমন অভিভূত করে দিল যে আমরা বেশ কয়েকদিন থেকে গেলাম ওখানে। রোজ সমুদ্রে স্নান দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু একদিন এমনই একটা দুর্ঘটনা

ঘটে গেল যে আমরা প্রায় একটি বন্ধুকে হারিয়ে ফেলেছিলাম আর কি !

বন্ধুটি আর কেউ নন, তিনি হলেন কবি নরেন্দ্র দেব। সমুদ্রে স্নানের সময় অসতর্ক হলেই বিরাট বিরাট ঢেউ এসে কোনসময় যে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার ঠিক নেই—এও ঠিক তাই হয়েছিল। একে নরেন সাঁতার জানত না, তার ওপর জলে লাফালাফি করার সময় অসাবধানতাবশতঃ সে একেবারে ডুবে যায় আর কি ! শেষে অনেক কষ্টে তাকে উদ্ধার করা হয়।

এর পর আরো কয়েকবার পুরীতে গেছি। দ্বিতীয়বার যখন যাই তখন ওখান থেকে গরুর গাড়ী করে কোনার্ক মন্দির দেখতে যাই। কোনার্ক যাবার পথে নেয়াখেয়া নামে একটা নদী পার হতে হয়। নৌকার উপর গরুর গাড়ীটা চড়িয়ে আমাদের নদী পার হতে হয়েছিল। এখন অবশ্য যাতায়াতের অনেক সুবিধা হয়েছে। কটক ও অন্যান্য স্থান থেকে বাস বা নিজের গাড়ী করে যেতে পারেন। কারণ নদীটির উপর এখন সেতু তৈরী হয়ে গেছে। কোনার্কের বিখ্যাত সূর্য মন্দিরটিকে বলা হয় 'ব্ল্যাক প্যাগোডা'। পুরীর সাদা মন্দির থেকে পৃথক করার জন্যই এই মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল।

ভারতীয় স্থাপত্যের একটি বিস্ময়কর নিদর্শন হলো এই কোনার্কের মন্দির। উড়িষ্যার রাজা প্রথম নরসিংহদেব এটি তৈরী করেন ১২৩৪-১২৬৪ খৃস্টাব্দে। নরসিংহদেব ছিলেন সূর্য উপাসক, তাই মন্দিরটি সূর্য-দেবের নামে উৎসর্গীকৃত। বহু মন্দিরের মধ্যে এখন জগমোহন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষই অবশিষ্ট আছে।

মন্দিরের ভাস্কর্য যদিও শিল্পী বা শিল্পীমন যাদের তাদের যথেষ্ট আকর্ষণ করে, কিন্তু যারা যায় সবাই তো আর শিল্পী নয়। তাই আমার মনে হয় এখানে যে লোকের এত ভীড় হয় তার আরও একটা কারণ আছে। ভগ্নাবশেষ মন্দির-গাত্রে বহু খোদাই-করা অশ্লীল চিত্র খোদিত আছে। মূর্ত্তিগুলি এতদূর অশ্লীল যে পিতাপুত্র

একসঙ্গে দাঁড়িয়ে তা দেখতে পারে না। পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরগাত্রেও এই ধরনের চিত্র ছিল উপরের দিকে, এখন সেগুলি অনেকাংশে লোপ করে দেওয়া হয়েছে। ভারতের আরও একটি মন্দিরে (খাজুরাহোতে) এই ধরনের অশ্লীল চিত্র মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। আশ্চর্যের কথা এই যে এখনও কটকের বাজারে এই খোদায়ের রেপ্লিকা দেখা যায়। আমার মনে বহুবার এই প্রশ্ন জেগেছে যে এই ধরনের অশ্লীল চিত্র—যা মানুষের মনে যৌন-চেতনাকে উত্তেজিত করে—সেগুলি এইরকম পৃথিবী-বিখ্যাত মন্দিরের গায়ে খোদাই করা কেন? এর কি কারণ থাকতে পারে?

এর কারণ কি এই যে, সমস্ত জাগতিক প্রলোভন পরিত্যাগ করে দেবদর্শনে আসতে হয় কিংবা নরনারীর যৌনমিলন দর্শনের যে অদম্য কৌতূহল সে কৌতূহল নিবৃত্তি করে মনকে কে অশুচিতার হাতে থেকে বাঁচাতে পারে, সেই দেবদর্শনের পুণ্যফল লাভ করবার অধিকারী? বহু মনীষী এবং ঐতিহাসিকরা বহুরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিন্তু কোনটাই আমরা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারিনি।

যাই হোক, কোনার্ক গিয়ে আমরা রাত্রে ডাক-বাংলোয় আশ্রয় নিলাম। আমরা সবাই তখন কলকাতার নবীন যুবক, মশারী নেওয়ার কোনো দরকার মনে করিনি। কিন্তু মশারী না নেওয়ার অনিবার্য্য ফল পেলাম সেই রাত্রে। সেখানে এত অসম্ভব মশা যে আমরা কেউ দু চোখের পাতা এক করতে পারি নি। যদিও দূর থেকে সন্‌সন্‌ করে সমুদ্রের আওয়াজ ও হাওয়া আসছিল। পরদিন সকালে ডাকবাংলোর মালী বললে যে তদানীন্তন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সার জন উডরফ গতকাল সমস্ত রাত ধরে পায়চারি করেছেন। স্যর জন উডরফ ওখানে কি একটা লেখা নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর লিখিত বইগুলি হলো ভারতীয় তন্ত্র সম্বন্ধে —সেগুলি 'আর্থার অ্যাভেলন' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হতো। এই

তন্ত্র সম্বন্ধে তাঁকে উৎসাহিত করেন অ[illegible] ঘোষ—যাঁর ছেলের সঙ্গে পরে প্রেমাঙ্কুরের এক মেয়ের বিবাহ হয়। কোনার্কে একদিন থেকেই আমরা পরদিন চলে আসি। এর পর আরো দুবার যখন সেখানে যাই—তা'র প্রথমবারে আমার সঙ্গে মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিল। আমার বাড়ির কেউ-কেউও সেবারে ছিলেন। কটকে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে সাহিত্য সম্মেলনে শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসাবে যোগদানের সময় শেষবার কোনার্ক দর্শন করি। এবারে আমার সঙ্গে ছিলেন বিশু মুখোপাধ্যায় ও ভবানী মুখোপাধ্যায়।

এর পর আমি বলব বর্মা ভ্রমণের কথা। সে ১৯২০-২১ সালের কথা হবে। একদিন কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করা হলো যে কয়েকদিনের জন্য জাহাজে করে বর্মা ভ্রমণ করে আসা যাক। তখন শরৎবাবু রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় চলে এসেছেন। তাছাড়া তখন বর্মামুল্লুকে বহু বাঙালী পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন—কেউ চাকরী নিয়ে, কেউ ব্যবসা নিয়ে। আমি, চারু রায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুধীর চৌধুরী—এ ক'জন যাব ঠিক হ'লো।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধীর চৌধুরী এঁরা দুজনে প্রথম শ্রেণীর টিকিট পূর্বেই কিনেছিলেন—আমি ও চারু রায় ইউরোপীয়ান থার্ড ক্লাশের টিকিট কিনি কারণ সেই সময়ে প্রথম শ্রেণীর টিকিট আর পাওয়া যায় নি। জাহাজে সুধীর চৌধুরী ও সুধীর সরকার নাম নিয়ে বেশ একটু কৌতুককর ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল। আমি আর চারু ইউরোপীয়ান থার্ড ক্লাশের যাত্রী বলে প্রথম শ্রেণীর কেবিনে স্নান করা কিংবা শোওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এই নামদুটি উল্টো-পাল্টা করে আমরা সব কাজই নির্বিঘ্নে সারতে পারতাম।

সুধীরবাবুর ভগ্নিপতি রেঙ্গুনে চাকরী করতেন এবং ওখানকার একজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন বললেই হয়। তাঁর বাড়ীতেই আমরা

প্রথম গিয়ে উঠি। সেখানে স্থানাভাব হওয়ায় আমাদের অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন সুধীরবাবুর ভগ্নিপতি।

এই বাড়ীটির যিনি কর্ত্রী, তিনি হলেন একজন বর্মী মহিলা, তাঁর স্বামী বাঙালী, কিন্তু তিনি তখন অন্যত্র ছিলেন। তাঁর দুটি মেয়ে ছিল—একটির বয়স আঠারো, আর ছোটটির বয়স প্রায় ষোলো। মেয়ে দুটিই দেখতে ভালই ছিল, ছোটটি একটু বেশী চঞ্চলা এবং আরও বেশী সুন্দরী। দুইজনেই বাঙালীদের মতো শাড়ী পরায় আরও ভাল দেখাত। কি জানি কেন খালি কারণে-অকারণে সে আমার কাছেই বেশী করে ঘুরঘুর করত। মাঝে মাঝে আমার মনটাও যে চন্‌মন্ না করত তা নয় তবে আমি সবেমাত্র বিবাহ করেছি, সেই নববধূর প্রেমেই তখন হাবুডুবু খাচ্ছি—এসব দিকে নজর দেবার অবকাশ কোথায়? মেয়েটি কেন জানি না আমার সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করত এবং তার মাও আমাকে যেন একটু বেশী সুনজরে দেখতে শুরু করলেন। চারু রায় আমাকে এই নিয়ে প্রায়ই ঠাট্টা করত। ও বলত, দেখ সুধীর, বেশী কাছে এগোস না, তাহলেই বিপদ। ওরা তোমাকে গাঁথতে চেষ্টা করছে—খবরদার টোপ গিলো না। টোপ গিললে আর তোমাকে মগের মুল্লুক থেকে বাংলা মুল্লুকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না।···তার চেয়ে চল আজকে এক জায়গায় বর্মী মেয়েদের 'পোয়ে' নাচ দেখে আসি।···চমৎকার নাচে তারা।

আমি বললাম: চারুদা আছেন যে।

চারুদা মানে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আমাদের থেকে বয়সে বড় ছিলেন, কাজেই তাঁকে আমরা এই ব্যাপারে সব সময় এড়িয়ে এড়িয়েই চলতাম।

চারু বললে: আরে চারুদা তো সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েন। উনি ঘুমুলেই আমরা যাব।

সেই মতই প্ল্যান হয়েছে। সেদিন তাড়াতাড়ি অর্থাৎ রাত্রি দশটার মধ্যে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করলুম।

এগারোটা নাগাৎ আমি আর চারু সবে শুয়ে পড়বার তাল করছি এমন সময় চারুদা হঠাৎ জেগে উঠে বলে বসলেন ঃ কোথায় যাচ্ছ হে তোমরা ?

চারু একটু আমতা-আমতা করে বললে ঃ না, মানে ঘুম আসছে না, তাই ভাবছি একটু বাগানে বেড়িয়ে আসি।

আমি তাতে একটু ফোড়ন কেটে বললুম ঃ আজ আবার গরমটাও একটু বেশী মনে হচ্ছে।

চারুদা এই শুনে বললেন ঃ হঁ্যা যা বলেছ, চল আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।

যাঃ! নাচ দেখা আর হল না। কাছে-পিঠে এক প্যাগোডার ধার দিয়ে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

বর্মার সোয়েডেগন প্যাগোডা অত্যন্ত বিখ্যাত। এতবড় বৌদ্ধমন্দির পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। এর সিঁড়ি চওড়ায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ ফুট। লম্বাতেও ততোধিক দীর্ঘ। এই সিঁড়ির দুধারে ফুলওয়ালীরা প্রচুর ফুল বিক্রি করত, এবং লোকেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে এই ফুল, মোমবাতি আর ধূপকাঠি কিনে বুদ্ধদেবকে নিবেদন করত। এখানে ঘটল এক ভারী মজার ব্যাপার, এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না সে সময় বর্মায় মেয়েরাই ছিল সংসারের কর্তৃত্বের ভার নিয়ে। পুরুষদের দেখা যেত সিল্কের লুঙ্গি পরে ঘুরে বেড়াতে।

আমরা বাংলা দেশ থেকে গেছি—বাঙালী, সুতরাং ধুতি-পাঞ্জাবি পরেই বর্মার রাস্তায় চলাফেরা করছি। স্থানীয় যুবকরা মাঝে মাঝে নানা মন্তব্য করে। বর্মাতে আমরা বেশীদিন ছিলামও না—সুতরাং বর্মী ভাষাও আমাদের জানা ছিল না। যে কয়দিন ছিলাম তাতে দু-চারটে কথা শিখেছিলাম মাত্র। এই সোয়েডেগন প্যাগোডায় বুদ্ধমূর্তি দর্শন করে আমরা ফিরে আসছি—এমন সময় একটি ফুলওয়ালী এসে অনেক অনুনয়-বিনয় করতে লাগল কিছু ফুল কেনার জন্য। আমি তাকে যত বলি যে আমরা এখন বাড়ী যাচ্ছি—আর

আমাদের ফুলের দরকার নেই—কিন্তু বর্মী ভাষায় কি যে বলে ঠিক মতো বোঝাতে পারছি না। পাশেই এক তরুণ বর্মী যুবক দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে ইংরাজীতে আমার সমস্যা বলতেই সে বলল : তুমি এই কথাটা বল। বলে আমায় একটু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে কয়েকটা বর্মী ভাষার কথা শিখিয়ে দিল। আমি এসে বেশ ভারিক্কীচালে সেই কথাগুলো বলতেই পাশের লোকজনেরা হেসে উঠল হো-হো করে—আর মেয়েটি তার কটিদেশ থেকে একটা ছোট্ট ছোরা বের করে তেড়ে এল মারতে। আমি ব্যাপারটা কিছু না বুঝতে পেরে হকচকিয়ে গেছি, এমন সময় চারু আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে বলে—পালিয়ে আয়, আর দাঁড়াস নি।

কিছুদূর ছুটে এসে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি লোকগুলো খুব হাসছে, বিশেষ করে সেই যুবকটি। আর ফুলওয়ালী মেয়েটি ছোরা উঁচিয়ে তখনও কোপ প্রকাশ করছে। আসল ব্যাপারটা কি হল তখনও বুঝতে পারিনি। পরে জেনেছিলাম, আমি যে বর্মী কথাগুলো মেয়েটিকে বলেছিলাম, তার মানে হল 'আমি তোমায় ভালবাসি।'

রেঙ্গুনে তখন প্রচুর বাঙালীর বাস। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁরা একদিন সম্বর্ধনা জানালেন বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে। আমি এবং চারুও সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সম্বর্ধনাসভায় গিয়ে চারু বললে : দেখ সুধীর, এই সুযোগ। আজ নাচ দেখতে যেতেই হবে।

আমি বললাম : মিটিং শেষ না হলে যাবে কি করে? আর মিটিং শেষ হতে রাত্রি হয়ে যাবে যে। শেষকালে চারুদা আবার বলবেন ওহে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নাও।

চারু বললে : কিচ্ছু ঘাবড়াসনি—তুই সব ভার আমার ওপর ছেড়ে দে।

সম্বর্ধনা সভার কাজ শুরু হল—স্থানীয় বাঙালী ভদ্রলোকরা

বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। শেষে চারুদার ভাষণ দেবার সময় যেই হয়েছে—চারু একটা 'স্লিপ' পাঠিয়ে দিল চারুদার কাছে যে আমরা যাচ্ছি। চারুদা সেই স্লিপের ওপরই লিখে পাঠালেনঃ 'তোমার অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।'

কিন্তু আমরা জানি চারুদার অভিভাষণ শুরু হলে চট্ করে থামবে না—সুতরাং তিনি যেই অভিভাষণ শুরু করলেন আমারও অমনি ওঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এলাম।

ওখান থেকে সটান চলে এলাম বর্মী নাচ দেখতে। বেশ ভালই লাগল দেখতে।

আমার বেশ মনে আছে, আমরা তিনজনে মিলে একদিন গেলাম ট্রেনে করে পেগু শহরে। রেঙ্গুন থেকে পেগু প্রায় চল্লিশ মাইল। ওখানে এক বৌদ্ধমন্দিরে বুদ্ধদেবের এক বিরাট মূর্তি আছে। মন্দিরটির নাম হল 'সোঁয়েতালিয়'। মূর্তিটি দৈর্ঘে প্রায় পঞ্চাশ ফুট হবে—তবে রয়েছে শায়িত অবস্থার।

এই পেগু শহরে যেতে যেতে ট্রেনে আমরা এক অদ্ভুত খাবারের কথা শুনি। খাবারটার নাম হল 'নাপ্পি'। নোনা মাছ এবং তরকারী ও ভাত পচিয়ে এরা মাটির নীচে সাত-আট দিন রেখে এমন একটা খাবার তৈরী করে যার উৎকট দুর্গন্ধে আমাদের অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত উঠে আসার উপক্রম হয়েছিল।

রেঙ্গুনে আমরা বেশ কয়েকদিন ছিলাম। এবং ওখানকার দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি মহানন্দে দেখে আবার জাহাজে করে কলকাতায় ফিরে এলাম।

এরপর আমি, প্রেমাঙ্কুর ও চারু একবার গেলাম ভূপাল বেড়াতে। ভূপালের কাছেই আছে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির সাঁচীস্তূপ। ট্রেনে করে আমরা সাঁচীর দিকে রওনা হচ্ছি এমন সময় হঠাৎ আমাদের খেয়াল

হল পরের স্টেশনেই নামতে হবে। যেই ভাবা ওমনি নামা। বীণা জংশন আসতেই আমরা তিনজনেই নেমে পড়লুম। নেমেই সোজা চলে গেলুম ডাক-বাংলোয়।

একটা ঘর নিয়ে বিশ্রাম করছি আমরা, এমন সময় একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে এসে ঘরদোর বেশ ভাল করে ঝাঁট দিয়ে গেল। ঐরকম অপরূপ এক সুন্দরী যাকে কোনও নবাবের বেগম বলে ভুল করা মোটেই বিচিত্র নয়—এরকম যার রূপ সে যে পরিচারিকার কাজ করে একথা বিশ্বাস করতেই মন চায় না। আমাদের কৌতূহল চরমে উঠল।

প্রেমাঙ্কুর বরাবরই একটু ডানপিটে স্বভাবের। সে আর থাকতে না পেরে তার সঙ্গে আলাপ জমাবার তাল খুঁজতে লাগল। কিন্তু মেয়েটি সেই যে একবার বিজলীর ঝলকের মত দেখা দিয়েই লুকিয়ে পড়ল, আর তার দেখা পাওয়া গেল না। শেষে প্রেমাঙ্কুর ডাক-বাংলোর বুড়ো মালীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো মেয়েটির কি নাম, এত সুন্দর চেহারা সে কেন চাকরাণীর কাজ করে? তার সঙ্গে একটু আলাপ করা যায় কিনা ইত্যাদি।

বুড়ো মালী তার সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে উঠল: তওবা, তওবা। ওদিকে যাবেন না বাবুজী। ও বড় সাংঘাতিক মেয়ে। এই ডাক-বাংলোরই এক মেথরের মেয়ে ও। ওর নাম জোহরা।

আমরা সবিস্ময়ে সকলে বলে উঠলাম: মানে মেথরাণী?

—হ্যাঁ বাবুজী। ওকে নিয়ে তো এই কিছুদিন আগে খুব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।

আমি বললাম: কি গোলমাল?

বুড়ো বলতে লাগল: মাসখানেক আগে কয়েকজন গোরা সিপাহী এখানে ছিল। ওই জোহরার জন্যে তাদের মধ্যে মারামারি—শেষে একজন গোরা সিপাহী খুন পর্যন্ত হয়ে গেল।

চারু বললে: বল কি? তবে সুধীর, আর এখানে এক মিনিটও নয় স্টেশনে চল। আজই চলে যাওয়া যাক।

আমি বললাম ঃ সেই ভাল। যত মারামারি খুনোখুনি রক্তারক্তির মূল কারণই হল এই নারী। শেষে কি আমাদের মধ্যেও বন্ধুবিচ্ছেদ হবে?

প্রেমাঙ্কুরের ইচ্ছে ছিল না এই রাত্রেই আবার রওনা হবার। আমি আর চারু একরকম জোর করেই স্টেশনে ফিরে গেলাম এবং পরের ট্রেনেই সাঁচীর দিকে রওনা হলাম।

বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়ই আমি দেশভ্রমণে বেরুতাম। এক জায়গায় বেশীদিন চুপ করে বসে থাকতে পারতুম না—তাই প্রায়ই ছুটিছাটা হলে দু-তিন জন বন্ধুকে সঙ্গী করে এখান-ওখান ঘুরে বেড়াতাম। অবশ্য বেশীর ভাগ ভ্রমণ পূজোর ছুটির সময়েই হত। একদিন ঠিক হল আগ্রা শহর দেখে আসা যাক। লোকে বলে অমর প্রেমের অক্ষয় প্রতীক তাজমহল যে না দেখেছে তার জীবনই বৃথা। আমি প্রেমাঙ্কুর আর চারু—এই তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম তাজমহল দর্শনের ইচ্ছায়। কিন্তু এত দেশ ঘুরেছি প্রথমবার আগ্রা যাওয়ার মত এমন করুণ স্মৃতি আর কোন সময়ই আমাদের জীবনে হয়নি।

আগ্রা স্টেশনে নামার আগে পর্যন্ত মনে ছিল অফুরন্ত উৎসাহ। কিন্তু স্টেশনে নেমেই শুনলাম যে যমুনায় প্রবল বন্যার ফলে ওখানে দারুণ কলেরা ও নানারকম ব্যাধি দেখা দিয়েছে। শহরের কোথাও খাবার জল পাওয়া যাচ্ছে না। বহু লোক মারা যাচ্ছে প্রতিদিন, রাস্তায়-ঘাটে বহু লোক আর মহিষ, গরু, ছাগল ইত্যাদি জীবজন্তু মরে পড়ে রয়েছে ও নদী দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। এই সব শুনেই তো আমাদের মন-মেজাজ একেবারে বিগড়ে গেল।

বেশ মনে আছে যে, আমরা যখন স্টেশনে নেমেছিলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তখন ঠিক করা হলো যে রাত্রিটা কাটাবার জন্যে তো একটা আস্তানা চাই। এক টাঙ্গাওয়ালাকে ডেকে বললাম কোন হোটেলে নিয়ে যেতে।

তখন আগ্রায় ভাল হোটেল বেশী ছিল না, যা দুই-একটা ছিল সেখানে একেবারেই স্থান ছিল না। আমাদের হাতে অর্থও ছিল কম। কতকগুলি হোটেল বন্ধ করে দিয়ে মালিক পালিয়ে গেছে দেশে। টাঙ্গাওয়ালা অনেক ঘুরে শেষে যখন দেখল আর কোথাও জায়গা পাওয়া যাবে না, তখন নিয়ে এল একটা বাড়ীর দরজায়।

প্রেমাঙ্কুর জিজ্ঞেস করলে : এ ক্যায়সা হোটেল ?

টাঙ্গাওয়ালার বয়স হয়েছে, একটু হেসে বললে : নেহি বাবুজী, ইয়ে হোটেল নেহি, ইয়ে ঘর হ্যায়। হিঁয়া অপলোগ্‌কা রাতকা লিয়ে জাগা মিল সেকতি হ্যায়। আপ চলিয়ে মেরা সাথ।

আমরা ভাবলুম, অনেকে তো 'পেয়িং গেস্ট' রাখে, এও হয়ত সেইরকম গোছের একটা কিছু হবে।

টাঙ্গাওয়ালা ভেতরে চলে গেল, আমরা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

গজগজ করতে করতে এক বৃদ্ধা মহিলা বেরিয়ে এসে বললেন : মাফ করনা বাবুজী, লেড়কী কা তবিয়ৎ আজ ঠিক নেহি হ্যায় !

লেড়কা ?

আমরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতেই প্রেমাঙ্কুর ওকে বুঝিয়ে বলল যে আমরা রাত্রিবেলায় একটু আশ্রয় চেয়েছিলাম —লেড়কীর প্রয়োজন নেই। টাঙ্গাওয়ালা হয়ত আমাদের কথা ঠিক বুঝতে পারেনি, তাই এখানে এনে ফেলেছে। মাপ করবেন বুড়ি মা।

বৃদ্ধা আর কোন কথা না বলে মুখের ওপরেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

চারু টাঙ্গাওয়ালাকে ধমকে উঠে বলল : তোমাকে বাইজীর বাড়ীতে নিয়ে আসতে কে বলেছে ? এমন একটা জায়গায় নিয়ে চল যেখানে রাতটা কাটানো যায় আর কিছু খেতে পাওয়া যায়। এর জন্যে টাকা-পয়সা যা লাগে সব দেব।

এরপর টাঙ্গাওয়ালা নিয়ে গেল এক মেমসাহেবের বাড়ী। মেম-

সাহেবের বয়স হয়েছে, মেমসাহেব মিশনারী বলে মনে হল। তিনি বেরিয়ে এসে বললেন: থাকতে তোমাদের দিতে পারি। খেতেও অবশ্য পাবে। কিন্তু জল নেই এক ফোঁটা।

আমার তখন খিদেয় পেটের নাড়ী পর্যন্ত শুকিয়ে যাবার উপক্রম। আমি বললুম: ঠিক আছে, পেটটা তো ভরুক, জল না হয় ষ্টেশনে ফিরে গিয়ে খেলেই চলবে।

তাই ঠিক হল। আমরা ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করেই চলে এলাম স্টেশনে। সে যাত্রায় আর তাজমহল দেখা হয়ে উঠল না। রাত্রের ট্রেনেই চলে গেলাম মথুরা।

মথুরাতে আবার আর এক বিপদ। প্রচণ্ড বাঁদরের উৎপাত।

ওখানে একদিন থেকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে, আমরা দিল্লী ঘুরে আবার যখন কয়েকদিন পরে ফিরে আসি, তখন আবার আমরা ঠিক করলাম যে মনের অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করে তবে দেশে ফিরব। অর্থাৎ তাজমহল দেখে যাব।

ফিরতি পথে আবার আগ্রায় নামলুম। তখন বন্যার তাণ্ডব শান্ত হয়েছে, এবং শহরের অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। সে সময় ভাগ্যক্রমে চাঁদনি রাতও পেয়েছিলাম এবং জ্যোৎস্নালোকে তাজমহল দেখার আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয়েছিল।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রেমিক শাজাহানের এই অমর কীর্তি দেখলে মনটা সত্যিই উদাস হয়ে যায়। 'তাজ' দেখার সময় রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন কেবলই মনের মধ্যে ঝঙ্কার দিয়ে ফিরছিল—

'কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল—'

ঐ সময় আমরা 'সেকেন্দ্রা' দেখলাম—যেখানে রয়েছে সম্রাট আকবরের সমাধি। তারপর গেলাম আগ্রা ফোর্ট, ফতেপুরসিক্রি, সেখানে দেখলাম 'বুলান্দ দরওয়াজা'।

বুলান্দ দরওয়াজা হল একটি বিরাট ফটক—দুর্গের প্রবেশপথ।

মোগল সাম্রাজ্য যে কত বিরাট এবং ঐশ্বর্যশালী ছিল, কালের সীমানা অতিক্রম করেও এইসব স্থাপত্য তার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

এবার বেশ কিছুদিন পরে আবার আমরা কয় বন্ধু মিলে ঠিক করলাম ভারতের আর একটি বিশেষ ঐতিহ্যময় স্থানে ঘুরে আসব। সেটি হল অজন্তা ও ইলোরা দর্শন। এবারের দলে ছিল চারু, প্রেমাঙ্কুর ও নরেন্দ্র দেব।

অজন্তা, ইলোরা যেতে গেলে জলগাঁও নামক একটা ষ্টেশনে নামতে হয়, এখান থেকে বাসে করে যেতে হয়। এইখানে একটি ঘটনা ঘটল।

ট্রেনে আমাদের কামরায় একটি মধ্যপ্রদেশীয় মহিলা এবং তাঁর সঙ্গে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। ভদ্রমহিলা খুব পান খান। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তরই পান সেজে খাচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গীকেও দিচ্ছিলেন। ভদ্রমহিলা এমনি দেখতে বেশ সুশ্রী—এককালে হয়ত বেশ সুন্দরী ছিলেন। এখন যেন মনে হয় সে লালিত্যটা চলে গিয়ে একটা বিষণ্ণ ভাব সর্বদা মুখে লেগে রয়েছে। এঁর পান খাওয়া দেখে প্রেমাঙ্কুরকে আমি বললাম: ভদ্রমহিলার কাছ থেকে কয়েকটা পান চেয়ে নিয়ে আয় না।

চারু বললে, কেন, সুন্দরী মেয়ের হাতের পান ছাড়া বুঝি তোমার চলছে না?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, না, মানে জানই তো ভাই অনেকদিন গৃহছাড়া।

নরেন বললে: ওদের হাতের পান খেয়েছ কি মরেছ—একেবারে স্বখত-সলিলে।

—মানে? তুকতাক করে দেবে বলছিস? আমি হেসে বললাম।

নরেন বললে: বিশ্বাস কি বন্ধু? যদি সেইরকম কিছু হয় তাহলে তোমার গৃহিণীকে গিয়ে আমরা কি জবাব দেব?

আমি বললাম: সে বিষয়ে তোমার কোনো ভয় নেই বন্ধু।

একটা পান খেয়ে আমি প্রাণ দেব না, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক কবি। যা প্রেমাঙ্কুর, নিয়ে আয় দেখি।

প্রেমাঙ্কুর বরাবরই ডানপিটে ধরনের। সে সঙ্গে সঙ্গেই গিয়ে ভদ্রমহিলাকে বলল, বহিনজী, একটা পান দেবেন মেহেরবাণী করে?

ভদ্রমহিলা স্মিত হেসে বললেন, নিশ্চয়ই দেব। আপনারা তো চারজন আছেন না? বলে আটটি পান সঙ্গে সঙ্গেই সেজে দিলেন—তার সঙ্গে দিলেন অতি উৎকৃষ্ট জরদা।

আমি তো খুব আনন্দ করে পান দুটি খেলাম, এবং যাঁরা আমাকে ঠাট্টা করেছিলেন, তাঁরাও খেলেন।

এদিকে প্রেমাঙ্কুর ভদ্রমহিলার সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেলল। এই আলাপ জমানোর ব্যাপারটা তাঁর সঙ্গী-ভদ্রলোক খুব সুনজরে দেখছিলেন না। তিনি মাঝে মাঝে বেশ কটমট করে তাকাচ্ছিলেন, কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না।

আমরা জলগাঁও ষ্টেশনে নামলে পরে দেখলাম যে, তাঁরাও নেমেছেন। আমরা একই ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করতে লাগলুম। ভদ্রমহিলার সঙ্গী ভদ্রলোক ওঁকে ওখানে বসিয়ে রেখে বলে গেলেন, বাসের সময় তো এখনও হয়নি, আমি একটু ঘুরে আসছি। তারপর খুব নিম্নস্বরে আরও কি সব বলে চলে গেলেন।

মনে হল যেন ভদ্রলোক এই মেয়েটিকে বেশ একটু শাসন করে গেলেন। মেয়েটিও দু'চার কথা যা বললেন, তাতে মনে হল যে এঁদের দুজনের মনটা যেন একসুরে বাঁধা নেই। কোথাও যেন একটা গণ্ডগোল আছে।

ভদ্রলোক চলে যেতেই আমরা চারজনে আবার এই অপরিচিতার সঙ্গে আলাপ জমাবো কিনা ভাবছি, এমন সময় সেই ভদ্রমহিলা নিজেই এসে বললেন, 'বাবুজী, পান খাবেন?'

এতখানি সৌভাগ্যের জন্য আবার আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

চারু বললেঃ আপনি দিলে আমরা নিশ্চয় খাব। তবে মিছিমিছি আপনি আমাদের জন্য কষ্ট করবেন।

—না, না, কোনো কষ্ট হবে না আমার। বলে পান তৈরী করতে বসলেন।

আমি হঠাৎ বলে বসলামঃ আচ্ছা, আপনার স্বামী বোধহয় পছন্দ করছেন না আমাদের সঙ্গে কথা বলাটা? মনে হল উনি যেন বকাবকি করে গেলেন।

—ওর কথা ছেড়ে দিন, ও আবার একটা মানুষ নাকি?

আমরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম। নরেন বললঃ মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলার জীবনে একটি বিরাট দুঃখের ইতিহাস আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলামঃ আপনার দেশ কোথায়?

—গোয়ালিয়র বাবুজী। আপনারা তো বাঙাল থেকে আসছেন, না?

আমি বললাম, হ্যাঁ। গেছেন কখনও ও-দেশে?

—হ্যাঁ, ছোটবেলায় একবার গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে কলকাতায়। খুব ভাল জায়গা। আবার যেতে ইচ্ছে করে। নিয়ে যাবেন বাবুজী? মনে হল ভদ্রমহিলা যেন মন থেকেই এ কথাটা বলছেন।

—আমি হাসতে হাসতে বললাম, বেশ তো। আপনার স্বামীকে বলুন নিয়ে যেতে। তারপর তো আমরা আছি।

মহিলাটি হাসলেন—বড় করুণ সে হাসি। মনে হল তার অন্তরের সমস্ত বেদনা বোধহয় একসঙ্গে ঝরে পড়ছে। বললেন, ও আমার স্বামী নয় বাবুজী।

যে-রকম বেদনার্ত কণ্ঠে কথাগুলি বললেন তিনি তাতে অবাক হওয়ার চেয়ে দুঃখিত হলাম বেশী।

ঠিক সেই সময় আমাদের বাস এসে পড়ল। ভদ্রমহিলার সঙ্গীটি হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন। আমরাও ভদ্রমহিলার কাছে বিদায় নিয়ে বাসে উঠে পড়লাম।

ভদ্রমহিলার ঐ ব্যথাকরুণ মুখখানি ক্রমাগত আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। আমি চুপ করেই ছিলাম। প্রেমাঙ্কুর বলে উঠল, কি বন্ধু, হঠাৎ চুপ মেরে গেলে কেন ?

আমি বললাম ঃ ভদ্রমহিলার জীবনের ট্র্যাজেডীর কথাটা ভাবছি।

চারু বললে ঃ ট্র্যাজেডী নয়, বল ডিসইলিউশনমেণ্ট। বোধহয় চারুর কথাই ঠিক—মোহভঙ্গ।

অজন্তা যেতে গেলে বাস থেকে নামতে হয় ফর্দাপুর নামক একটা জায়গায়। জলগাঁও থেকে অজন্তা হল প্রায় আটত্রিশ মাইল। ফর্দাপুর থেকে অজন্তা তিন চার মাইল। সেখান পর্যন্ত আর বাস যায় না— প্রায় মাইল দুয়েক রাস্তা হেঁটে বা রিক্সা করে বা ট্যাক্সি করে যেতে হতো। অজন্তার পুরনো ডাক-বাংলোয় গিয়ে আমরা আশ্রয় নিলাম। ফর্দাপুরে তখন নিজামের নূতন ডাক-বাংলো তৈরী হচ্ছে। এই নূতন ডাক-বাংলোর কিউরেটর ছিলেন সৈয়দ আমেদ, যাঁর চিত্রশিল্পের নমুনা ছাপা পোষ্টকার্ড আমরা অনেক দেখেছি যেগুলো সেখানে বিক্রয় হচ্ছিল। চারুর সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আমাদের সেই সঙ্গিনীটি ফর্দাপুর পর্যন্ত একই বাসে গেলেন। বাসে আর তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ পাইনি—যদিও মাঝে মাঝে মহিলাটির দৃষ্টিবাণ আমাদের বিদ্ধ করছিল। ফর্দাপুরে নামতেই তাঁর সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। মহিলাটির অবশ্য ইচ্ছা ছিল ডাক-বাংলোয় থেকে আমাদের সঙ্গে অজন্তা দেখবেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোক তাঁকে ডাক-বাংলোয় আমাদের সঙ্গে রাখা হয়ত নিরাপদ মনে করলেন না—তাঁকে নিয়ে কোথায় চলে গেলেন জানি না। তারপর আর তাঁর সঙ্গে কোনোদিন আমাদের দেখা হয়নি বটে, তবে আজও সেই করুণ মুখখানি মাঝে মাঝে মনের আকাশে ভেসে উঠে মনটাকে উদাস করে দেয়।

যাই হোক, অজন্তায় আমরা দুদিন ধরে ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য

ও চিত্রকলার নিদর্শনগুলি বেশ মনোযোগ সহকারে দেখলাম। অজন্তা গুহাগুলি সংখ্যায় প্রায় ত্রিশটি এবং কিছু কিছু গুহা প্রায় দু'হাজার বৎসরের পুরানো। ওখান থেকে গেলাম ইলোরায়। ইলোরাতে তিন রকমের মন্দির আছে—হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন। এর মধ্যে সবচেয়ে দর্শনীয় হচ্ছে হিন্দুদের কৈলাস মন্দির। একটি প্রকাণ্ড পাহাড় কেটে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। এই স্থাপত্যের তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। দেশ-ভ্রমণ যাদের নেশা, কৈলাস-মন্দির না দেখলে তাদের দেশ-ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলেই আমার ধারণা। ইলোরায় আমরা একদিন ছিলাম। তারপর ঔরঙ্গাবাদ হয়ে আমরা বোম্বাইয়ে ফিরে যাই এবং সেখান থেকে পুণা হয়ে আমরা বাংলাদেশে ফিরে আসি।

এই সময়, বম্বে থেকে যখন কলকাতায় ফিরছিলাম, তখন ট্রেনে এক মজার ব্যাপার ঘটে। সে সময় ট্রেনে ইউরোপায়ান থার্ডক্লাস বলে একটা ক্লাস চালু ছিল। এটা আর কিছু নয়, প্যাণ্ট-কোট পরা থাকলে কালা-আদমীও এই থার্ড ক্লাসে ভ্রমণ করতে পারত। এতে তদানীন্তন সেকেণ্ড ক্লাসের মত অনেক সুবিধা পাওয়া যেত, অথচ ভাড়া ছিল কম। চারু ও প্রেমাঙ্কুর প্যাণ্ট পরেছিল, আমি ও নরেন ছিলাম ধুতি-পরা অবস্থায়। আমরা এই পোষাকেই কামরায় ঢুকে পড়লাম। কিন্তু কিছুদূর আসতে না আসতেই বাধলো গণ্ডগোল। এই ট্রেনের মধ্যে ছিলেন এক পার্শী-ভদ্রলোক। তিনি 'বাঙ্গালী বাবু'দের এই কামরায় থাকা নিয়ে প্রবল আপত্তি তুললেন এবং আমাদের নেমে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু আমার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। আমি বললাম:

Just wait, I am becoming European. বলেই সুটকেস খুলে প্যাণ্ট বার করে নিজেও পরলাম, আর চারুর একটা প্যাণ্ট নিয়ে নরেনকে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে আমরা ভারতীয় থেকে

'সাহেব' বনে গেলাম। পার্শী ভদ্রলোক আর কোন উচ্চবাচ্য করবার অবকাশ পেলেন না।

গাড়ীশুদ্ধ লোক আমার এই উপস্থিত বুদ্ধিতে হেসে উঠল। এখানে বলা ভাল, সেই সময় ভারতবর্ষে কোনো হাইকোর্টে বিচারের ফলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, যিনি ইউরোপায় পোষাক পরবেন, তিনিই ইউরোপায় বলে গণ্য হয়ে 'ইউরোপীয়ন থার্ড ক্লাসে' ইউরোপীয় রূপে ভ্রমণ করতে পারবেন। রঙের পার্থক্যের জন্য কিছু যাবে আসবে না। এই হাস্যকর ব্যাপারে আমি প্রেমাঙ্কুরকে ছাড়িয়ে গেছি বলে বন্ধুরা সকলেই আমার সাধুবাদ করলেন।

শুধু ট্রেনেই নয়, বহু ক্ষেত্রেই এই পোষাক-মাহাত্ম্যের জন্য গণ্যমান্য ভারতীয়দের তখন বিব্রত ও অপমানিত হতে হোত। যেমন ঘোড়দৌড়ের মাঠে গ্র্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডে, বড় বড় হোটেলের ডাইনিং হল প্রভৃতি জায়গায়। এমন কি কলকাতার ইডেন গার্ডেনস-এও একটি অদৃশ্য লাইন ছিল।

যাই হোক, ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত স্থানই আমার ঘোরা হয়েছে এবং যেখানে যা কিছু দ্রষ্টব্য-বস্তু সবই দেখা হয়েছে। একবার ভূপালে গিয়েছিলাম। মধ্যপ্রদেশের বর্তমান রাজধানী ভূপাল এক অতি মনোরম স্থান। চারিদিকে পাহাড় এবং অদ্ভুত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এই শহরটি অবস্থিত। বিখ্যাত হিন্দু রাজা ভোজের স্মৃতিমণ্ডিত এই স্থান। বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবেও এককালে এই স্থানটির খ্যাতি ছিল। দুটি ছবির মত সুন্দর হ্রদ ভূপালের বৈশিষ্ট্য। হ্রদে সূর্যাস্ত এবং শহরের আলোকসজ্জা ভ্রমণকারীদের পক্ষে পরম আকর্ষণের বস্তু। এরই তিন মাইল আগে বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির সাঁচীস্তূপ। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এই পবিত্র স্থানটি দেখতে আসেন। এই সময় ভূপালের রাজ্যশাসন করেন এক বেগম-সাহেবা। আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখন সাইকেলে করে নবাবপুত্রীদের হকি খেলতে দেখেছি।

এরপর গেছি জয়পুর, কাশ্মীর, মাদ্রাজ, মাত্থরাই, রামেশ্বরম্, ওয়ালটেয়ার, মহাবলীপুরম্, কাঞ্চিপুরম্, জব্বলপুর, চিদাম্বরম্, হরিদ্বার, দেরাছুন, রাজগীর, পাটনা, গয়া, লক্ষ্ণৌ, গৌহাটী, শিলং এবং আরও বহু জায়গা। আসলে ভারতবর্ষের প্রতিটি শহর দেখার পর মনের মধ্যে একটা সুপ্ত বাসনা প্রায়ই উঁকি দিত যে, এ জীবনে কি ইউরোপ ভ্রমণের ইচ্ছাটা স্বপ্নই থেকে যাবে? কত বন্ধু-বান্ধব বিলেত ঘুরে এসে কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলেন। তাতে মনে হয় ওদেশটা যেন স্বপ্নপুরী—ওদেশ যে না দেখেছে তার জীবনই বৃথা। কিন্তু সে সুযোগও একদিন এসে গেল, অবশ্য জীবনের সায়াহ্নবেলায়।

১৯৬৪ সালে আমার ন'দার (সুবোধচন্দ্র সরকার) চোখ অপারেশন হবে ঠিক হল লণ্ডনের এক বিশেষজ্ঞের কাছে। সেই ফাঁকে আমিও তাঁর সঙ্গী হয়ে পড়লুম।

আগেকার দিনে অর্থাৎ বৃটিশ রাজত্বকালে বিলেত যাওয়া যত সহজ ছিল, এখন আর তেমন নেই। এখন বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের ব্যাপার আছে। আপনার অজস্র টাকা থাকলেও আপনি ইচ্ছামত টাকা নিয়ে গিয়ে সেখানে খরচ করতে পারবেন না—ভারত সরকারের তরফ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যতটুকু অনুমতি দেবে তার বেশী আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না।

এসব ব্যাপারের ঝামেলা মিটিয়ে ২৬শে জুন, ১৯৬৪ সালে লুফট্‌হানসা বিমানযোগে আমি ইউরোপের পথে রওনা হই। রাত সাড়ে এগার বারোটায় পৌঁছাই করাচীতে এবং রাত্রি দেড়টার সময় আসি কুয়েত বন্দরে। তারপর রাত্রি তিনটে নাগাদ কায়রো তারপর পরদিন ভোরে পৌঁছালাম রোম বিমানবন্দরে—আর বেলা সাড়ে আটটায় জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে। এখানে বিমানবন্দরে প্রায় আড়াই ঘণ্টা থেকে লণ্ডন রওনা হই এবং বেলা দেড়টার সময় লণ্ডন বিমানবন্দরে পৌঁছাই। দমদম থেকে যে-প্লেনে আমরা গিয়েছিলাম, সেটি হল 'জেট' বিমান—তার গতি হল ঘণ্টায় প্রায় সাতশো

মাইল, আর চলেছে তিরিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে। প্লেনটি শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত হওয়ায় কোনো অসুবিধাই ছিল না।

প্লেনের মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা একেবারে রাজকীয়। কতবার আর কতরকম যে খাবার দেয় ওরা তা বলে শেষ করা যায় না। এরোপ্লেনে দুটি শ্রেণী আছে—একটি হল প্রথম শ্রেণী এবং অপরটি হল পর্যটক শ্রেণী। তাকে ইকনমী ক্লাশও বলে। তফাৎ মাত্র খাদ্য ও পানীয়ের বেলায়, আর কোন তফাৎ নেই। এই ইকনমী ক্লাসে আমরা প্রায় সত্তরজন যাত্রীছিলাম। টোকিও থেকে এই বিমান ছাড়ে, ফ্রাঙ্কফুর্টে এর যাত্রা শেষ। এখান থেকে লণ্ডন যেতে হয় অন্য প্লেনে।

২৭শে জুন আমরা লণ্ডন পৌঁছে আশ্রয় নিলাম সিভিয়ট পল্লীতে, বিখ্যাত সাংবাদিক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। এই পল্লীটি হল লণ্ডন শহরের উওর-পশ্চিম প্রান্তে, কিন্তু গ্রামখানি যেন ছবির মত আঁকা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তা-ঘাট, বাড়িগুলো সব এক ধরনের। প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে ও পিছনে খানিকটা করে জায়গা রয়েছে বাগানের জন্যে। তাতে ফুটে রয়েছে অজস্র ফুল। ফুলগুলি প্রকাণ্ড দেখতে সুন্দর, কিন্তু গন্ধহীন। চারিদিকে অজস্র সবুজের মেলা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এখানকার কচি ঘাসে-ঢাকা সবুজবর্ণ পার্কে বেড়াতে গেলে উঠে আসতে ইচ্ছে করবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে এই পার্কের শোভা নিরীক্ষণ করুন, কোন ক্লান্তি আসবে না।

বহু পার্ক আছে এই লণ্ডন শহরে। এর মধ্যে কুইন মেরীর রোজ গার্ডেনস্ সত্যিই দেখার মত। রাশি রাশি গোলাপ ফুটে রয়েছে, তা দেখলে অতিবড় অরসিকের মনেও কাব্যরস সঞ্চার হবে। তারপর রয়েছে হাইড পার্ক। যেমনি বিরাট, তেমনি সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত। বিরাটত্বের দিক থেকে আমাদের গড়ের মাঠের থেকেও বড়, এবং সজ্জার দিক থেকেও অতুলনীয়।

এখানকার বাসই বলুন আর ট্যাক্সিই বলুন, অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ট্যাক্সি আবার এখানে দুরকমের—বড় ও ছোট। ছোটগুলিকে বলে মিনি ক্যাব। ট্যাক্সির সঙ্গেই বেতার সংযোগ আছে। গাড়ির চালক তার গাড়ির সঙ্গে নিজের ট্রান্সপোর্ট অপিসে সবরকম খবর আদান-প্রদান করতে পারে। জার্মানিতেও এই একই ধরনের সুযোগ সুবিধা দেখেছি। তবে এদের ভাড়ার হার অত্যন্ত বেশী। নেহাৎ প্রয়োজন না হলে বা অবস্থা স্বচ্ছল না হলে সাধারণত কেউ ট্যাক্সি চড়ে না। বাসের টিকিট এদেশে কেউ এখানে-সেখানে ফেলে না, পাছে রাস্তা ময়লা হয়। প্রত্যেক বাসেই একটা ঝোলানো ব্যাগ আছে, যাত্রীরা নামবার সময় সেখানে ব্যবহৃত টিকিট ফেলে দিয়ে যায়। বাসগুলি সবই লাল রঙের। একটি সংস্থা থেকেই বাসগুলি পরিচালিত হয়—তার নাম হল : লণ্ডন ট্রান্সপোর্ট কোং।

লণ্ডনের আইন ও শৃঙ্খলা যে-কোনো দেশের অনুকরণীয়। নাগরিক অধিকার এবং নাগরিক দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে লণ্ডনের অধিবাসীরা যেমন সচেতন, তার অর্ধেকও যদি আমাদের দেশের লোকেরা হোত, তাহলে আমরা অনেক দুর্গতির হাত থেকে রেহাই পেতাম। যেমন ধরুন, লণ্ডনের বাড়ী বাড়ী প্রতিদিন সকালে দুগ্ধ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে দুধ ও পাঁউরুটি ডিম ইত্যাদি অন্যান্য খাবার দিয়ে যায়। তারা দুধের বোতলগুলি দরজার সামনে নামিয়ে রেখে চলে যায়, কিন্তু সেগুলি অন্য কোন লোকই উঠিয়ে নিয়ে যায় না। অনেক খবরের কাগজের স্টলে বিক্রেতা থাকে না—ক্রেতা কাগজের দামটি ঠিক যথাস্থানে রেখে দিয়ে নিজের কাগজখানি নিয়ে চলে যায়। অর্থাৎ কেউ সামান্য ছোটখাট ব্যাপারে ফাঁকি দেবার তাল খোঁজে না।

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে লণ্ডনের পুলিশের আচরণ সত্যিই প্রশংসনীয়। এদের বলা হয় 'ববি'। যেমন লম্বাচওড়া

চেহারা, তেমনি সুন্দর ঝক্‌ঝকে পোষাক। লম্বায় এরা কেউই ছ'ফুটের কম নয়। লণ্ডনের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্যার রবার্ট পীল নিয়ম করেন যে, ছ'ফুটের কম লম্বা হলে পুলিশ হওয়া চলবে না। তাঁর সময় থেকেই এই 'ববি'র প্রচলন শুরু হয়। লণ্ডনে যারা নবাগত, তারা পথ হারিয়ে ফেললে, স্থানীয় পুলিশ তাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। জনগণের যেমন তারা বন্ধু, তেমনি দুষ্কৃতকারীদের দমনে কঠোর।

টিউব রেল অর্থাৎ মাটির নীচের রেল এখানে খুব জনপ্রিয়। টিউবে বহু জায়গায় এস্‌কালেটার বা চলন্ত সিঁড়ি আছে। এর ভাড়া বেশ সস্তা। এই 'টিউবে' করে লণ্ডনের এক অঞ্চল থেকে অপর এক অঞ্চলে তাড়াতাড়ি যাওয়ার খুব সুবিধা।

এখানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিবাসী নিগ্রোদের সংখ্যা খুব বেশী। ভারতীয়দের সংখ্যাও আজকাল কম নেই এখানে। বাসের কণ্ডাক্‌টর, টিউবের কণ্ডাক্‌টর প্রভৃতি কাজে এদের সংখ্যা এত বেশী যে, এরা যদি একদিন ধর্মঘট করে, তাহলে হয়ত লণ্ডন পরিবহন-ব্যবস্থাই অচল হয়ে যাবে। এর কারণ হোল, প্রথমত লণ্ডনে ইংরাজ পুরুষদের সংখ্যাল্পতার জন্য অন্য দেশীয়দের নিয়োগ করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত বিদেশীরা কম মাহিনায় কাজ করে, ইংরাজরা যে-মাহিনা দাবী করে, তার থেকে এরা কম টাকা পায়। এদের জীবনযাত্রার নিম্নমানই হল এর জন্যে দায়ী।

এখানকার গাড়ীগুলো চলে খুব গতিতে। বেশীর ভাগই একমুখো রাস্তা বা ওয়ান-ওয়ে ট্র্যাফিক। রাস্তা পার হতে গেলে আলোর নির্দেশ না মানলেই বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

সিনেমা-গৃহগুলির টিকিটের হার আমাদের তুলনায় খুব বেশী। প্রথম শ্রেণীর সিনেমাগুলির টিকিটের হার হল দশ শিলিং থেকে কুড়ি শিলিং। নিউ বণ্ড স্ট্রীট ও অক্সফোর্ড স্ট্রীটের সম্ভ্রান্ত মহলে যখন সিনেমা দেখানো হয় তখন এই দাম কিন্তু সাধারণ সিনেমা-হলগুলিতে এই ছবিগুলিই যখন আবার দেখানো হয় তখন টিকিটের

হার কম অর্থাৎ দু'শিলিং থেকে পাঁচ শিলিং। প্রথম শ্রেণীর সিনেমাগুলিতে প্রদর্শনীর সময় বাঁধা আছে—প্রায় আমাদেরই মত। কিন্তু কতকগুলি সাধারণ শ্রেণীর সিনেমায় 'শো' ক্রমাগত হয়েই চলেছে। আপনি হয়ত টিকিট কেটে দেখলেন কোন একটা ছবির অর্ধেকটা হয়ে গেছে, তখন আপনি প্রেক্ষাগৃহে ঢুকে এই অর্ধেকটুকু দেখে আবার পরের 'শো'র সময় বাকি অর্ধেকটুকু দেখে আসতে পারেন। দর্শকরা ঠিক সময়মতো যার যতটুকু দেখবার কথা, তাই দেখে চলে আসেন, এর জন্যে সিনেমার কোন লোককে গিয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না।

এখানে আজকাল টেলিভিশনের জনপ্রিয়তা খুব বেড়ে গেছে। বেশীর ভাগ ডিটেকটিভ, মারামারির এবং নানারকম ঘটনার ছবিই টেলিভিশানে দেখানো হয়। এর জন্যে সিনেমা প্রদর্শনীগুলি অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টেলিভিশান সর্বত্র চালু হওয়ায় সিনেমার জনপ্রিয়তা বেশ কমে যাচ্ছে। কারণ ঘরে বসেই ছবি দেখার আনন্দ লোকে টেলিভিশানেই পাচ্ছে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলিও টেলিভিশানে দেখানো হয়। যেমন লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা আমি নিজে টেলিভিশানের মারফতে লণ্ডনের ঘরে বসে দেখেছি। তাছাড়া উইম্বলডনে লেডিজ সিঙ্গলস্ টেনিস খেলার ফাইনালও দেখেছি টেলিভিশানে।

এখানে আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিসের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না। সেটা হল ম্যাডাম টুসোর মোমের মূর্তি প্রদর্শনাগার (Wax Museum)। ম্যাডাম টুসো ছিলেন একজন ফরাসী মহিলা, প্রায় একশো বছর আগে তিনি লণ্ডনে আসেন এবং মোমের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। এখন অবশ্য ম্যাড্যাম টুসো আর জীবিত নেই, কিন্তু তাঁর বিখ্যাত মিউজিয়ামটি এখনও আছে। এখানে পৃথিবীর বিখ্যাত মনীষীদের প্রতিমূর্তি ও কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনাকে মোমের ওপর ধরে রাখা হয়েছে। যেমন

নেপোলিয়নের মৃত্যু, নেলসনের মৃত্যু, ভারতের স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি। এই মূর্তিগুলি সময়ানুসারে বিশেষ-ভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়। একদিকে যেমন এইসব মহাপুরুষদের প্রতিমূর্তি, অন্যদিকে আছে আবার তেমনি খুনে ডাকাত ও বদমাইসদের মূর্তি। এই বিভাগটিকে বলা হয় Chamber of Horrors। এই মিউজিয়ামে আরও আছে ফাঁসি দেওয়ার যন্ত্র, গিলোটিন, হাতকড়া, পায়ের বেড়ি ইত্যাদি।

এখানকার সাধারণ লোকের সততার বিষয় আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। সেটা আমার নজরে পড়ল যেদিন একটা থিয়েটার দেখতে যাই। প্রত্যেক সিটের সঙ্গে 'অপেরা গ্লাস' লাগানো আছে। অর্থাৎ আপনার প্রয়োজন হলে সিট থেকে খুলে নিয়ে দেখে আবার সেখানে রেখে দিয়ে যাবেন। এই দেখার জন্যে একটা খুব সামান্য মূল্য আড়াই শিলিং ভাড়া বাবদ সংলগ্ন বাক্সে ফেলে দিতে হয়। অপেরা গ্লাসটিও কেউ খুলে নিয়ে যায় না, বা পয়সা না দিয়েও কেউ চলে যায় না।

এখানকার কয়েকটি থিয়েটারে শ্লীলতা-অশ্লীলতার বালাই নেই। যেমন আমি 'আফ্রিক্যান ব্যালে' নামক একটি নৃত্য প্রদর্শনী দেখলাম একটি থিয়েটারে। সেখানে নর্তকীদের বক্ষ-আবরণী বলে কিছু ছিল না এবং সম্পূর্ণ নগ্ন বক্ষে নৃত্য করাতেও সরকার পক্ষ থেকে বা অন্য পক্ষ থেকেই কোন প্রতিবাদ বা আপত্তি দেখিনি। এই দেখে মনীষী বার্নার্ড শ-র একটি কথা আমার মনে পড়ে গেল—Morality varies according to Geography.

লণ্ডনে গিয়ে আমি আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম—সেটি হল এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণীদের বীটল্‌-প্রীতি। এই বীটল্‌ দল হল চার জনকে নিয়ে একটি গায়ক দল। এদের নাম হল রিঙ্গো ষ্টার, পল মাককার্টনি, জন লিনন ও জর্জ হ্যারিসন। এদের হাবভাব পোষাক-পরিচ্ছদ, চুল রাখার ধরন এবং গান-বাজনা ও নাচ অত্যন্ত অদ্ভুত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথম দর্শনে মনে হয়, একদল অতি বখাটে ছোকরার



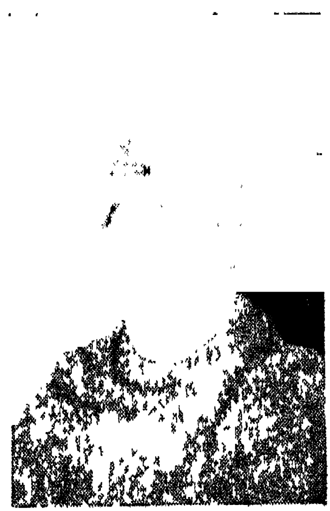
সুবোধচন্দ্র সরকার



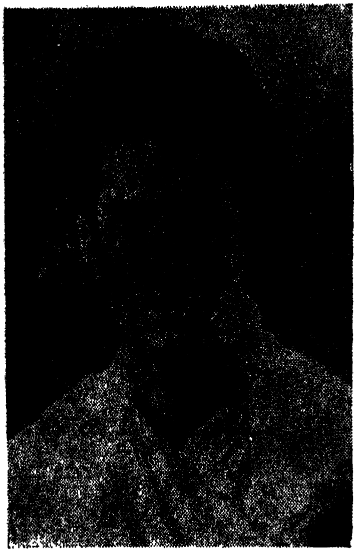
তুষারকান্তি ঘোষ



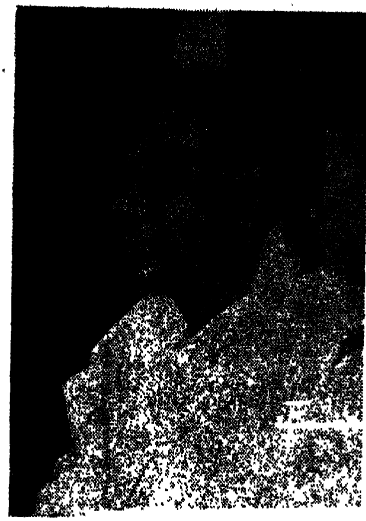
প্রফুল্লকুমার সরকার



অমর পাল্লিত



বিশু মুখোপাধ্যায়



ভবানী মুখোপাধ্যায়



শিবরাম চক্রবর্তী



বিমল মিত্র

দল। কিন্তু যখন যেটা ধুয়া ওঠে, তখন সেইদিকেই তো লোকে ছোটে—বিশেষ করে তরুণ-তরুণীর দল। ওরা সেই সময় একটা ফিল্মে নেমেছিল, সেটার নাম হল 'A Hard Days Night'। এই ছবিটার উদ্বোধনের দিন রাজকুমারী মার্গারেট উপস্থিত ছিলেন, আর এদের শুধু একবার দেখার জন্য সিনেমার বাইরে সে কি অসম্ভব ভিড়, প্রায় দশ হাজার তরুণ-তরুণীর দল অপেক্ষা করছিল। শুধু তাদের একবার চোখের দেখা দেখার জন্যে।

যাই হোক, কিছুদিন লণ্ডনে থাকবার পর আমি যাই পশ্চিম জার্মানী। সেখানে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে ওদের নির্মাণকার্য। বিগত মহাযুদ্ধের পর সমস্ত দেশটাই ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপর থেকে কুড়ি একুশ বছরের মধ্যে আবার তারা কেমন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, তা দেখলে অবাক হতে হয়। জার্মানীর অনেক শহর এমন নতুন ক'রে গড়ে তুলেছে যে কল্পনাই করা যায় না যে এই সব শহর যুদ্ধে একেবারে ধূলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। আমরা দেশ বিভাগের পর থেকে আজ পর্যন্ত কি বা করতে পেরেছি। তবে এটা ভাববার বিষয় এদেশের জনসংখ্যা আমাদের তুলনায় অনেক কম। শিল্পাঞ্চলগুলি আবার যুদ্ধপূর্ব সময়ের মতই পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই কারখানাগুলি নিজেদের দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে পৃথিবীর বহু দেশে আবার পণ্য রপ্তানির বাজার কায়েম করে নিয়েছে। এইসব দেখে মনে হয় শিল্পক্ষেত্রে জার্মান জাতি কত উন্নত, দেশপ্রীতি তাদের কত প্রবল।

জার্মানীর মধ্যেও দুটো ভাগ—পূর্ব ও পশ্চিম। পূর্ব জার্মানী হল রাশিয়া প্রভাবিত এবং পশ্চিম জার্মানী হল আমেরিকা ও ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স প্রভাবিত। পূর্ব জার্মানীর লোক পশ্চিম জার্মানীতে আসতে পারে না। তবে আজকাল বড়দিনের সময় দুই দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কয়েকদিনের জন্য দেখা করতে দেওয়া হয়। আমি পূর্ব ও পশ্চিম দুই জার্মানী দেখার সুযোগ

পেয়েছিলাম। অবশ্য তুই জার্মানীর মধ্যে খুব একটা পার্থক্য আমার নজরে পড়ে নি। মনে হল উভয় দেশের লোকই ভালোভাবে আছে।

এই পশ্চিম জার্মানীর অন্তর্গত ব্যাভেরিয়া প্রদেশে ওবেরামার্গাঁও নামে একটি পল্লীগ্রাম আছে। এটি হল মিউনিক শহর থেকে ষাট মাইল দূরে। চারশো বছর আগে এই গ্রামটি ছিল অত্যন্ত নগণ্য ও ক্ষুদ্র। প্রথম এর নাম শোনা যায় ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে। সেই সময় এক বিরাট মহামারীতে এর পল্লীবাসীরা প্রায় সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য স্থানীয় অধিবাসীরা ভগবান যীশুখৃষ্টের প্রার্থনা শুরু করেন। সেই সময় অধিবাসীরা খৃষ্টের সমগ্র জীবনী অভিনয় করেন—নাম দেওয়া হয় 'প্যাশান প্লে'। খৃষ্টের জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এই নাটকে দেখানো হয়। এর পর থেকে মহামারী শান্ত হয়, আর সে-দেশে কোনদিন মহামারী হয়নি। আমার যদিও 'প্যাশান প্লে' দেখবার সৌভাগ্য হয়নি, কারণ দশ বছর অন্তর এর অভিনয় হয়। শেষ অভিনয় হয়েছে ১৯৬০ সালে, আবার হবে ১৯৭০ সালে। কিন্তু যেখানে এই নাটকটি অভিনীত হয়, সেই ওবেরামার্গাঁও স্থানটি দেখবার সুযোগ হয়েছিল। এই স্থানটি এবং 'প্যাশান প্লে' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

এই 'প্যাশান প্লে' নাটকটি যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁরা সকলেই ব্যাভেরিয়াবাসী এবং এই গ্রামেরই কৃষক-সম্প্রদায়। এঁদের মধ্যে একটি নির্বাচকমণ্ডলী আছেন তাঁরা অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন করেন। যেখানে অভিনয় হয়, সেখানে একসঙ্গে পাঁচ হাজার দর্শক বসে অভিনয় দেখতে পারেন। নাটকটি সম্পূর্ণ অভিনয় হতে সময় লাগে প্রায় আট ঘণ্টা, আর তা প্রায় সত্তর থেকে নব্বুই দিন ধরে অভিনীত হয়। এই প্রেক্ষাগৃহে এই বিশেষ নাটকটি ছাড়া আর কোন নাটকের অভিনয় হয় না। অভিনয়ের সময় ছাড়া অডিটোরিয়াম সব সময় ঢাকা থাকে। চোদ্দ পনেরোটি ঘরে সমস্ত অভিনেতা

অভিনেত্রীর সাজ-পোষাক রক্ষিত আছে—যীশুখৃস্টের পোষাক এমনকি, তাঁর কাঁটার মুকুটটি পর্যন্ত, মাতা মেরীর পোষাক এবং অন্যান্য সকলের পোষাক, আট মার্ক থেকে পঁচিশ মার্ক হল এর দর্শনীয় হার।

১৯৫০ ও ১৯৬০ সালে যে অভিনেতাটি (তাঁর নামটি আমি ভুলে গেছি) যীশুর ভূমিকাটি অভিনয় করেন, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। এই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সারা জীবন অত্যন্ত পবিত্র ভাবে যাপন করতে হয়। তাঁরা কোনোরকম মাদক দ্রব্য ব্যবহার করতে বা অসংযমী জীবন যাপন করতে পারবেন না। পাছে গ্রামের পবিত্রতা নষ্ট হয়, এজন্য এখানে কোনো রকম আমোদ-প্রমোদের পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই। ১৯০৬-০৭ সালে যে অভিনেতাটি যীশুর ভূমিকায় অভিনয় করেন, তাঁর নাম হল অ্যান্টন লং—তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। যীশুর ভূমিকায় এ পর্যন্ত যাঁরা অবতীর্ণ রয়েছেন তাঁদের মধ্যে এঁর অভিনয়ই এ পর্য্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ।

'প্যাশান প্লে'-র মধ্যে সঙ্গীতের উচ্ছলতা নেই, কোন বাজনার ধ্বনি পর্যন্ত নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু দুঃখ-কষ্ট ও অবিচারের একটানা ঘটনাপ্রবাহ।

হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—'প্যাশান প্লে'-তে যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁদের কেউ-ই এর আগে কোথাও অভিনয় করেননি এবং ভবিষ্যতেও করতে পারবেন না।

এরকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাট্যভিনয় শুধু ওবেরামার্গাওতেই হয়। অন্য কোনো-জায়গায় ঠিক এইভাবে নাটক অভিনীত হতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

ইউরোপ ভ্রমণের সময় ওখানে দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি সব দেখা তো হল, সেই সঙ্গে ওখানকার পুস্তক-প্রকাশনের রীতিনীতিগুলিও কিছু জানবার অবকাশ হল। এ-দেশের সঙ্গে পুস্তক-প্রকাশন ও বিক্রয় ব্যাপারে তফাৎটা কোথায়, এটা জানবার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল।

এই সুযোগে সে ইচ্ছাটাও খানিকটা পূরণ হল অর্থাৎ ইউরোপের পুস্তক-ব্যবসায় সম্বন্ধে বেশ খানিকটা ওয়াকিবহাল হওয়া গেল। কিন্তু তার আগে বাংলা দেশের তথা ভারতের পুস্তক-ব্যবসায় সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার বলে মনে করি বিশেষ করে আমি যখন এই ব্যবসাতেই লিপ্ত আছি যৌবনের প্রথম উন্মেষ থেকেই।

আমাদের দেশের পুস্তক-প্রকাশন ব্যবসা প্রথম কবে সুরু তার সঠিক কাল নির্ণয় করা সহজসাধ্য না হলেও এটুকু বলা যায় যে যখন থেকে আমাদের দেশে মুদ্রণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে তখন থেকেই পুস্তক-প্রকাশ ও বিক্রয় সুরু হয়েছে। সে আজ প্রায় আড়াইশো বছর হবে। তবে তখন পুস্তকমুদ্রণ ও প্রকাশন হতো বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ বিক্রেতাদের খেয়াল-খুশী মত। একজোট হয়ে কাজ করা অর্থাৎ কোন অ্যাসোসিয়েশন বা সমিতি গঠিত হয় নি। পুস্তক-প্রকাশকদের অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় ১৯০৫ সালে। তখন পাঠকের সংখ্যাও যেমন কম ছিল, পুস্তকের সংখ্যাও ছিল আরও কম। দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের সংখ্যা ও পুস্তকের সংখ্যা সমান তালে বৃদ্ধি হতে থাকে।

সেই সময় সমস্ত প্রকাশন সংস্থাগুলিকে একত্রিত করে কতকগুলি নিয়ম-কানুন গঠন করে একটি সমিতি বা অ্যাসোসিয়েশনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করেন। এর আগে কলকাতার চিৎপুর অঞ্চলের বটতলা পল্লীতে এলোমেলোভাবে নানা ধরনের বাংলা বই প্রকাশিত হত। বটতলার এই সমস্ত প্রকাশকদের কোনো অ্যাসোসিয়েশন ছিল না। বাংলাদেশেই এই সমিতি প্রথম গঠিত হয় ১৯০৫ সালে, এবং এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন বিখ্যাত বাংলা পুস্তক-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক হন এস. কে. লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোম্পানীর কর্ণধার শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়। পরে তাঁর পুত্র সন্তোষকুমার লাহিড়ী হন এর সম্পাদক এবং সভাপতি হন গুরুদাসবাবুর পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

কিন্তু এই অ্যাসোসিয়েশন ছিল কেবল নামেই। কাজকর্ম বিশেষ কিছুই হয়নি। নিয়ম ছিল কোন প্রকাশকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ হলে সেই অভিযুক্ত প্রকাশক টাকা জমা রেখে অ্যাসোসিয়েশনের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করতে পারবে। এই নিয়ম বোধহয় এখনো আছে। হরিদাসবাবু অনেকদিন সভাপতি ছিলেন, কিন্তু সমিতির অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যেতে লাগল। এই সময় সন্তোষকুমার লাহিড়ীর পরিবর্তে এর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন কমলা বুক ডিপোর কর্মকর্তা শচীন্দ্রলাল মিত্র। কি একটি কারণে এই সমিতি ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। এই সময় কয়েক মাসের জন্য আমি সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু তাতেও বিশেষ কোনো উন্নতি দেখা গেল না। এই অবস্থায় হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির পদ পরিত্যাগ করলেন এবং তাঁর জায়গায় এলেন বিশ্বভারতীর সেক্রেটারী অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সম্পাদকের গুরুদায়িত্বের ভার গ্রহণ করলেন সুবিখ্যাত গণিতজ্ঞ কালীপদ বসুর পুত্র ত্রিদিবেশ বসু। এই পরিবর্তনের সুফল শীগ্‌গিরই দেখা গেল। এরপর থেকে সমিতির ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হল, আর সেই সঙ্গে অর্থাগমও হতে লাগল প্রচুর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অ্যাসোসিয়েশনের কাজকর্ম মোটামুটি একই ভাবে চলে। তারপর আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই শিক্ষা-জগতেও প্রচণ্ড একটা আলোড়ন দেখা দিল। পুরনো প্রথার ক্রমাগত রদবদল হতে লাগল। পাবলিশার্স ও বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের নিয়ম-কানুন বদলে গিয়ে এই সময় নতুন নিয়ম-কানুন প্রচলিত হল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী বোর্ডের হাতে চলে গেল। এবং স্কুলের পুস্তক নির্বাচনের ভারটিও চলে গেল টেক্সট-বুক কমিটির হাত থেকে। এর কর্তা হলেন এডুকেশন বোর্ডের সিলেবাস কমিটি। এই সিলেবাস কমিটি প্রত্যেক বিষয়ের নির্দেশ ও নির্বাচন করলেও কোনো পুস্তকের

নাম উল্লেখ করলেন না। এতে পুস্তক ব্যবসায়ীদের কোনই অসুবিধা হল না বরং সুবিধাই হল। সিলেবাস কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী পুস্তক-প্রকাশকেরা নানা ধরনের পুস্তক প্রকাশ করতে লাগলেন। কিন্তু যে বইগুলিতে প্রচুর অর্থাগম হওয়ার সুযোগ ছিল সেগুলি প্রকাশের ভার বোর্ড তাঁদের নিজের হাতেই রাখলেন, যেমন ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত।

আমাদের স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত এই পদ্ধতিতেই পুস্তক প্রকাশন ব্যবসা চলতে লাগল। তারপর ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর যে নতুন সংবিধান রচিত হোল তাতে এই কথাই লেখা ছিল যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের সর্বত্র বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সংবিধান রচনার পর বিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে অথচ সংবিধানের মুদ্রিত প্রস্তাব এখনও কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি—এক-মাত্র কাশ্মীর ও দুই-একটি প্রদেশ ছাড়া। অবশ্য এটা ঠিক যে, কয়েকটি প্রদেশ বিদেশ থেকে কাগজ ও মুদ্রণ ব্যাপারে বেশ খানিকটা সাহায্য পেয়েছে।

প্রাথমিক পুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের ভার এখন সরকার নিজের হাতেই নিয়েছেন। তার ফলে বেশ কিছুটা গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষত বাংলাদেশে। এই সকল সরকারী মুদ্রিত পুস্তকগুলি বিতরণ ব্যবস্থা যদি সুষ্ঠুভাবে হোত তাহলে প্রতিবার গণ্ডগোলের সৃষ্টি হোত না। কিন্তু সহজে এর মীমাংসা হবার উপায় নেই, কারণ বহু স্বার্থ এর মধ্যে জড়িয়ে আছে। অথচ সরকার প্রতিবারই নানা জাতীয় পুস্তক প্রকাশ করে দেশের পুস্তক-ব্যবসায়ীদের সঙ্কট সৃষ্টি করছেন। যেমন এবছর একটি ইংরাজী বই প্রকাশিত করে সাধারণ প্রকাশকদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছেন। সরকার যদি মুদ্রণ, বিতরণ ও অল্পমুল্যের ব্যবস্থা করতে পারতেন তা হলে প্রকাশক ও জনসাধারণের কিছু বলার অধিকার ছিল না, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ অপারক

বা উদাসীন। সরকার চাইছেন পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশন-ব্যবস্থা জাতীয়করণ করতে। অন্তত এই জাতীয়করণের অন্তরালে সমস্ত ব্যাপারটাকে চেপে রাখতে। কিন্তু এটা যে সম্পূর্ণ গণতন্ত্র-বিরোধী তা ভালো করে বিচার করলেই বোঝা যায়।

এই প্রাথমিক পুস্তক প্রকাশনের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সমিতির কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে আমাদের সংঘাত বাধলো। এই বিরোধের সময় সরকার পক্ষের যেসব সদস্য ছিলেন তার মধ্যে বিশ্বভারতী ও আমাদের অর্থাৎ এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্সের নাম করা যেতে পারে। অবশ্য আমাদের স্থান ছিল প্রকাশক রূপে নয়, মাত্র পরিবেশকরূপে।

এর কয়েক বৎসর পরে আমরা পুনরায় সমিতির সভ্য হলাম এবং সমিতির কাজ বেশ ভালোভাবেই চলতে লাগল।

এরপর আমাদের প্রকাশক সমিতির পক্ষ থেকে আমি, জানকীনাথ বসু ও সুনীল বসু বোম্বাই-এর সর্বভারতীয় ফেডারেশনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি। কিন্তু এই ফেডারেশনের প্রথম ও প্রধান কাজই হল বিদেশ থেকে নানারকম পুস্তক আমদানী করা এবং স্থানীয় কিছু কিছু বই বাইরে পাঠানো। পুস্তক-প্রকাশন ব্যাপারে এঁদের বিশেষ তেমন আগ্রহ নেই। দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই ফেডারেশন যোগাযোগ রাখছেন, কিন্তু পুস্তক-প্রকাশন সংস্থাগুলির দিকে মোটেই দৃষ্টি দেন না। এতে আমাদের কলকাতার অ্যাসোসিয়েশনের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের উচিত হলো বোম্বাইয়ের এই সর্ব-ভারতীয় ফেডারেশনের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন ঘটানো এবং কলকাতার একটি সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে প্রকাশক সমিতি গঠন করা। শোনা যাচ্ছে, কোনো কোনো প্রদেশে নাকি এই রকম একটি সংস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। কয়েকটি নাকউঁচু দেশী ও বিলাতী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী পুস্তক প্রকাশকরা আমাদের এই অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দেন নি বলেও অনেক ক্ষতি হচ্ছে।

পুস্তক-প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা, এই দুই পক্ষের মধ্যে যথেষ্ট গোলযোগ আছে। এটি অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন। ইউরোপে কিন্তু এ মীমাংসার সমাধান অনেকদিন পূর্বেই হয়ে গেছে। পশ্চিম জার্মানীতে দেখলাম সেখানে সাধারণ প্রকাশকরা সরকারের সঙ্গে স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা সুরু করেছে। দু'পক্ষই বই ছাপে। যাদের বই ভালো বলে নির্বাচিত হয় তাদের বই-ই স্কুলে পাঠ্য নির্বাচিত হচ্ছে। সাধারণ প্রকাশকের মুদ্রিত বইগুলির মান অনেক উচ্চস্তরের, অথচ দামে সস্তা। এই জন্যে সরকার প্রকাশিত পুস্তকগুলি থেকে সাধারণ প্রকাশকদের বইগুলিই বেশী চলছে।

আমি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেখেছি পুস্তক-প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা, এই দুই দলের মধ্যে প্রভেদ আছে। পুস্তক-প্রকাশকরা (অর্থাৎ Publishers) শুধু বই ছাপেন এবং প্রচার করেন, আর বিক্রেতাদের (অর্থাৎ Sellers) কাজ হল শুধু বই বিক্রি করা। আমাদের দেশে কিন্তু সমস্ত প্রকাশকই বিক্রেতা এবং বেশীর ভাগ বিক্রেতাই প্রকাশক। বিলাতের ফয়েল হলেন বিখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা। একদিন এঁদের দোকান দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম যে, এঁদের দোকানে এমন কোনো ইংরাজী বই নেই যা আপনি পাবেন না। কথায় কথায় জানতে পারলাম যে, এঁদের দোকানে সব সময় পাঁচ লক্ষের মত বই মজুত থাকে, এবং তাঁরা এ কথাটা বেশ গর্বের সঙ্গেই বললেন।

এঁদের কাছ থেকে যদি কোন পুস্তক-বিক্রেতা বা প্রকাশক বই কেনেন তাহলে এঁরা তাঁদের যা কমিশন দেন তা অত্যন্ত কম কারণ এঁরা দুজনেই পুস্তক-বিক্রেতা। তবে সুবিধার মধ্যে হলো এই যে এক জায়গায় আপনি সব বই পাবেন। পুস্তক-বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলি ওখানে সত্যিই খুব বিরাট। আজ একটা জিনিস ওখানে বিশেষভাবে নজরে পড়ে তা' হল দোকানগুলির সাজানোর কায়দা। যেমনি

রুচিসম্মতভাবে সাজানো, তেমনি বিক্রেতাদের সহযোগিতা ও অমায়িক ব্যবহার। কোনরকম হট্টগোল নেই, কোন বই দেখতে চাইলে বা কোনো বই সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে বিক্রেতারা বিরক্তি প্রকাশ করেন না, বরং ওখানকার যাঁরা সেলসম্যান তাঁরা আপনাকে পুস্তক ক্রয়ের ব্যাপারে অনেক ভাবে সাহায্য করবেন। পুস্তকের দোকানের যাঁরা সেলসম্যান তাঁদের রীতিমত ট্রেনিং নিতে হয় আগে। এর জন্যে অনেক দেশে স্কুল আছে।

আর একটা জিনিস বিলেতে জানতে পেরেছি যে যদি কোন লেখকের বই চিত্রে বা মঞ্চে রূপায়িত হয়, তাহলে লেখক যে টাকা পান প্রযোজকের কাছ থেকে, তার থেকে একটা সামান্য কমিশন প্রাপ্য হয় সেই পুস্তকের প্রকাশকের। কারণ তাঁদের মতে লেখকের সেই পুস্তকের জনপ্রিয়তা ও প্রচারের মূলে সেই প্রকাশন-সংস্থা। অতএব তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবেন কেন? আর আমাদের দেশে কি হয় শুনুন। লেখক একবার লিখলেন কোনো সাময়িক পত্রিকায়, তা থেকে একবার টাকা পেলেন। দ্বিতীয়বার টাকা পেলেন যখন কোনো প্রকাশক সেটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করলেন। যখনই সংস্করণ হয় তখনই আবার লেখক টাকা পান। তারপর নাট্যরূপ হয়ে স্টেজে অভিনীত হল, তখন একবার টাকা পেলেন। তারপর ফিল্ম যাদ হয়, তার জন্য টাকা পান। প্রকাশককে কিন্তু ঐ এক বই বিক্রির টাকাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় যদিও তাদের প্রচেষ্টাতেই এই বইয়ের প্রথম প্রচার হচ্ছে।

বিলাতে পুস্তক-প্রকাশকদের আর একটি প্রথা চালু আছে সেটা এখনও এদেশে প্রবর্তিত হয় নি। সেটা হল Remainder System। এ ব্যাপারটা হল যে ধরুন, কোন লেখকের সব বই বিক্রি হল না, বেশ কিছু বই রয়ে গেল অবিক্রীত। প্রকাশকরা অপেক্ষা করলেন একটা নির্দিষ্ট সময়—মনে করুন পাঁচ বছর। তখন প্রকাশকরা সে বইগুলি

বিক্রি করে দেন অনেক কম মূল্যে। এসব ক্ষেত্রে লেখকদের সঙ্গে প্রকাশকদের এমন একটা বোঝাপড়া থাকে যে, যেসব বই অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় হল, সেই অনুপাতেই লেখকরা রয়্যালটি পেলেন। প্রকাশকদের সততার ওপরে কখনও লেখকরা সন্দেহ প্রকাশ করেন না।

এখানে প্রকাশকদের কাছ থেকে বই কিনলে পুস্তক বিক্রেতারা কমিশন বেশী হারে পাবেন, শতকরা ২৫ থেকে ৩৩ অথবা ৪০ পর্যন্ত। যাঁরা ঘুরে ঘুরে বই বিক্রি করেন তাঁরা প্রকাশকদের কাছ থেকে আমাদের দেশে সর্বোচ্চ হারে কমিশন পান। এমনও দেখা গেছে বহু পুস্তক-বিক্রেতা তাঁদের কাছ থেকে বেশী কমিশনে বইগুলি কিনে নেন। এতে প্রথম বিক্রেতাদের লাভ সামান্য থাকলেও বিক্রেতাদের লভ্যাংশের ভাগটা হয় বেশী।

আমাদের দেশে পুস্তক-প্রকাশনা পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এখন নাটক, নভেল, উপন্যাস ছাড়াও নানা ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে যেমন পুস্তক লিখিত হচ্ছে, তেমনি শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের সংখ্যাও বাড়ছে। ফলে পুস্তক বিক্রয়ের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। মানুষের জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণের ব্যয়ও যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে পুস্তকের দাম। অবশ্য মুদ্রণ-পরিপাট্যেরও সেই অনুপাতে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকারী ইস্তাহার অনুযায়ী বাংলা বই ছাপা কমে গেছে তা ঠিক নয় এক হিসাবে। কারণ অনেক বইয়ের পূর্বের চেয়ে চাহিদা হওয়ায় একই সংস্করণ অনেক বেশী ছাপা হচ্ছে তো বটেই এবং একাধিক সংস্করণও একই বইয়ের হচ্ছে। এভাবে মুদ্রণ সংখ্যা একই বইয়ের অনেক বেড়ে যাচ্ছে। তা'ছাড়া প্যাম্ফলেট জাতীয় বইগুলি পুস্তক হিসাবে সাধারণত ধরা হয় না। কিন্তু সেগুলিরও মুদ্রণসংখ্যা অনেক। পঞ্চাশ বছর আগে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীনে'র মত সুবৃহৎ উপন্যাসের দাম তিন টাকা হবে

কি সাড়ে-তিন টাকা হবে—এই নিয়ে আমরা যথেষ্ট মুস্কিলে পড়েছিলাম। কিন্তু এখন কোনো কোনো উপন্যাসের দাম পঁচিশ-ত্রিশ টাকা পর্যন্ত হচ্ছে এবং তা বিক্রিও হচ্ছে—যা আগেকার দিনে কল্পনারও অতীত ছিল।

এই পুস্তক-প্রকাশ বিষয় আর একটা কথা আমি বলতে চাই। বিত্তবান পাঠকের কাছে পুস্তকের এই মূল্যবৃদ্ধি খুব একটা মারাত্মক ব্যাপার নয়, কিন্তু যাঁরা নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহস্থ, চাকরীজীবি— তাঁদের জন্য আমাদের প্রকাশন-সংস্থাগুলি কি করেছেন ? যাঁদের পাঠস্পৃহা প্রবল, অথচ এত অধিক মূল্য দিয়ে কেনার ক্ষমতা নেই, তাঁদের দিকে আমরা ফিরেও তাকাই না। কিন্তু ওদেশে আছে বিখ্যাত পুস্তকগুলির সুলভ সংস্করণ। এছাড়াও আছে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বা পেপার ব্যাক সিরিজ। আমাদের দেশে এ বিষয়ে কোনো চেষ্টাই হয়নি। সরকারপক্ষ থেকেও নিম্নমধ্যবিত্ত পাঠকদের পাঠস্পৃহা মেটাবার কোন প্রয়াসই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। সাধারণতঃ পেপার ব্যাক সিরিজে সম্পূর্ণ বই থাকে আর পকেট বুকে পুস্তকের সংক্ষেপিত সংস্করণ। এই ধরণের বইগুলি য়ুরোপে প্রচুর প্রকাশিত হয়। বাংলায় পেপার ব্যাক প্রকাশিত হয় না বললেই চলে তবে হিন্দীতে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

এই সুলভ সংস্করণ বা পেপার ব্যাক সিরিজ প্রকাশের প্রতিবন্ধকতা কোথায় ? এর স্বপক্ষেও একটা বিরাট যুক্তি আছে। একখানি উপন্যাসের একটি সংস্করণে কত কপি বিক্রয় হয় ? সাধারণত ২২০০ থেকে ৩৩০০। সাধারণত প্রাদেশিক ভাষায় এক একটি সংস্করণে এর বেশী সংখ্যক বই বিক্রি হওয়া একরকম অসম্ভব বললেই হয়। এর ওপর যদি সুলভ সংস্করণ বা পেপার ব্যাক সিরিজ প্রকাশ করা হয় তাহলে মূল সংস্করণটির বিক্রি আশানুরূপ হবে কিনা সেবিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর বিদেশের ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকগুলি লক্ষ লক্ষ কপি ছাপা হয়—সারা পৃথিবীতে তার বিক্রি ছড়িয়ে

পড়ে। সেখানে সুলভ সংস্করণ প্রকাশে প্রকাশকেরও ক্ষতি হয় না এবং লেখকদেরও অর্থলাভ কিছু কম হয় না।

এই প্রকাশক-জীবনে বাংলা দেশের ছোটবড় অনেক লেখক-লেখিকার সংস্পর্শেই আমাকে আসতে হয়েছে। এঁদের মধ্যে অনেকের কথাই আমার এই রচনার মাধ্যমে আগেই কিছু কিছু বলেছি। আরও কয়েকজনের সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। এইবার তাঁদের বিষয় কিছু বলব।

এই সূত্রে যাঁর কথা সর্বাগ্রে মনে হচ্ছে তিনি হলেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

প্রেমেন্দ্রবাবু একালের একজন বিশিষ্ট লেখক—সাহিত্যের সমস্ত বিভাগেই তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বর্তমান। কবিতা, গল্প, বৈজ্ঞানিক কাহিনী, ডিটেকটিভ কাহিনী, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সাংবাদিকতা, চিত্রনাট্য, গান, চিত্র-পরিচালনা—যেটিতেই তিনি হাত দিয়েছেন সেটিই হয়ে উঠেছে অনবদ্য।

'কল্লোল' গোষ্ঠীর তিনি একজন খ্যাতনামা পুরুষ, এবং সেই সময় থেকেই তাঁর খ্যাতির সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। 'মৌচাকে'র আর একটি কৃতিত্ব হল তাঁর মত লেখককেও ছোটদের আসরে নামানো। 'মৌচাকে'র মধুভাণ্ডে তাঁর অবদান হল 'বৈজ্ঞানিক উপন্যাস' (Science fiction)। 'ঘনাদা'র গল্প যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন প্রেমেন্দ্রবাবুর এই ধরণের লেখায় শক্তির পরিচয়। আমরা জোর করে বলতে পারি বাংলা সাহিত্যে এবিষয়ে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। এ ছাড়াও তিনি 'মৌচাকে' নানাধরনের কবিতা ও ছড়া লিখে ছোটদের চিত্ত জয় করেছেন।

আমরা বড়দের জন্য তাঁর 'মনুষ্যদ্বাদশ' উপন্যাস ও 'অথবা কিন্নর' কবিতার বইখানি প্রকাশ করেছি। তাঁর প্রতিভার পুরস্কারস্বরূপ তিনি সাহিত্য-আকাদমী ও রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করেছেন 'সাগর

থেকে ফেরা' নামক কাব্যগ্রন্থে এবং কয়েক বছর আগে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তিনি 'মৌচাক পুরস্কার'ও পেয়েছেন।

তাঁর বহু কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে, তার মধ্যে বহু স্বরচিত কাহিনী তিনি নিজেই পরিচালনা করেছেন। এর মধ্যে 'কালোছায়া' হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি। বহু অপরের লেখা চিত্রকাহিনীরও তিনি চিত্রনাট্য করে দিয়েছেন। কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনা করেও তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। লেখক হিসাবে তাঁর প্রত্যেক লেখার মধ্যেই এমন একটা বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় যেটা অন্যের রচনায় পাওয়া যায় না।

এই 'কল্লোল' যুগের আর একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক হলেন শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। প্রবোধবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হল প্রায় চল্লিশ বছরেরও বেশী। আমি যখন রাজশেখরবাবুর প্রথম বই 'গড্ডলিকা' প্রকাশ করি সেইসময় প্রবোধবাবুর প্রথম উপন্যাস 'কাজললতা'ও প্রকাশ করি। এই 'কাজললতা'র প্রচ্ছদটি অঙ্কিত করেন শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন—যিনি রাজশেখরবাবুর কজ্জলী, গড্ডলিকা প্রভৃতি বই-এর অঙ্গসজ্জা করেছিলেন।

ছোটগল্প ও উপন্যাস দিয়ে প্রবোধকুমারের সাহিত্যিক-জীবন শুরু হলেও পরবর্তীকালে ভ্রমণ-সাহিত্যে তিনি সমধিক খ্যাতিলাভ করেন। ভ্রমণ-সাহিত্যে 'মহাপ্রস্থানের পথে' তাঁর একটি অনবদ্য অবদান। ভ্রমণ-সাহিত্যকে (travelogues) যে উপন্যাসের থেকেও মনোরম এবং আকর্ষণীয় করে লেখা যেতে পারে পথিকৃৎরূপে প্রবোধকুমারকে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। এখন অবশ্য অনেকেই এই দিকে হাত দিয়ে ভ্রমণ-সাহিত্যকে বহু ভাবে পরিপুষ্ট করছেন। প্রবোধকুমারের 'দেবতাত্মা হিমালয়' পড়লে বোঝা যায় যে হিমালয়ের প্রতি এঁর আকর্ষণ কি বিরাট। তাছাড়া 'রাশিয়ার ডায়েরী' তাঁর একটি বিরাট গ্রন্থ।

ভ্রমণ প্রবোধকুমারের একটি বিরাট নেশা, রাশিয়া ছাড়া তিনি ইয়োরোপও ঘুরে এসেছেন—এছাড়া ভারতের সর্বত্র তো গেছেনই। ছোটদের লেখা অবশ্য তিনি কমই লিখেছেন, তবে তিনিও আমার অনুরোধেই শিশু-সাহিত্যে আগমন করেন।

চলচ্চিত্রে তাঁর কয়েকখানি বই রূপায়িত হয়েছে, তার মধ্যে 'মহাপ্রস্থানের পথে' এবং 'প্রিয় বান্ধবী'ই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। 'যুগান্তর' পত্রিকার 'সাময়িকী' সম্পাদনা করেছিলেন কিছুদিন।

'মৌচাক'কে কেন্দ্র করে আর একজন লেখকের সঙ্গে আমার বিশেষ অন্তরঙ্গতা জন্মে—তিনি হলেন শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। প্রথমে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় 'মৌচাকে'র লেখক হিসাবেই—তাঁর সুদর্শন চেহারা, ছিমছাম বেশভূষা এবং মিষ্টি ব্যবহার আমাকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করে। তারপর 'মৌচাকে'র লেখা নিয়ে আসা-যাওয়া ও গল্পগুজবের ফলে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেলেন। সম্ভবত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে ১৯৪২-৪৩ সালে ইনি 'মৌচাকে'র ভার গ্রহণ করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে 'মৌচাকে'র সম্পাদনা ব্যাপারে সহকারীরূপে আমাকে সাহায্য করে আসছেন।

আমার সঙ্গে বিশুবাবু অনেক জায়গায় বেড়িয়েছেন এবং বহুদিন আমরা একত্রে কাটিয়েছি। কালিম্পং-এ যখন আমি বাড়ী করি তখন যে তিনি কতবার আমার সঙ্গী হয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। কালিম্পং-এ তাঁর সঙ্গে একদিন বেড়াচ্ছি, এমন সময় একটি মজার ঘটনা ঘটে গেল। সেটা বলছি শুনুন।

বিশুবাবুর বেশভূষার বৈশিষ্ট্য হল ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি ও গেরুয়া রং-এর চাদর। এই গেরুয়া চাদর তিনি আমাকেও একখানি উপহার দেন। একদিন শীতের সকালে কালিম্পং-এর বাজার থেকে ফিরছি। দুজনেই গেরুয়া চাদরে বেশ করে মুড়ি দিয়ে শীতের হাত থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করছিলাম, এমন সময় রাস্তায় একজন পথচারী আমাদের কাছে এসে অত্যন্ত বিনয় সহকারে প্রণাম করে বললেন,

'স্বামীজী, দু-জনে মঠে ফিরছেন বুঝি ? আমি মঠে গিয়ে আপনাদের দর্শন পাইনি—যাক্‌, আমার সৌভাগ্য যে পথেই দেখা হয়ে গেল।'

বুঝলাম যে ভদ্রলোক আমাদের কোন একটি মিশনের সাধু বলে ভুল করেছিলেন। আমি তাঁর ভুলটি ভেঙে দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় তাড়াতাড়ি বিশুবাবু আমাকে দেখিয়ে বলে উঠলেন, মহারাজ কালই তো নেমে যাচ্ছেন, সত্যিই আপনার ভাগ্য ভাল যে আজই দর্শন পেয়ে গেলেন।

ভদ্রলোক গদগদ হয়ে আবার প্রণাম করে চলে গেলেন। আমাদের অবশ্য তার পরের দিনই কলকাতা ফেরার কথা ছিল।

সাধারণ সাহিত্য ও শিশুসাহিত্য—উভয় ক্ষেত্রেই বিশুবাবুর সমান দখল আছে। ছোটদের ও বড়দের উভয় শ্রেণীর জন্যই তিনি অনেক বই লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। সংকলক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে। রবীন্দ্র-সাগর সঙ্গমে, পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রেমের গল্প, কবি-প্রণাম, বিখ্যাত শিকার-কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশুবাবুই আমার সঙ্গে আর একজন প্রতিভাধর সাহিত্যিকের আলাপ করিয়ে দেন—তিনি হলেন শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। আমাদের দোকানে যাওয়া-আসা করতে তিনিও আমাদের দোকানের আড্ডার একজন হয়ে পড়লেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ভারতীয় রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি নিয়মিত নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য-চর্চা করে আসছেন। অধুনালুপ্ত 'বাতায়ন' ও 'দীপালি' পত্রিকার সঙ্গে তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে।

গল্প, উপন্যাস, অনুবাদ, জীবনী ও বৈদেশিক সাহিত্যের মধ্যেই তাঁর কৃতিত্ব বিশেষভাবে দেখা গেছে। মাদার রাশিয়া, জার্মানীর ছোটগল্প, রেজার্স এজ, অস্কার ওয়াইল্ড প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অনুবাদ করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। জর্জ বার্নাড শ-র জীবনী ভবানীবাবুর একটি অতি প্রশংসিত গ্রন্থ। ছোট-বড় প্রায় সব সাহিত্যিকদের

সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। কিছুদিন ধরে 'বৈতানিক' নামে একটি সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদনা করে আসছেন। তিনি 'অমৃত'য় অভয়ঙ্কর নাম গ্রহণ করে বিভিন্ন সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সাহিত্য-সৃষ্টি ছাড়া মানুষ হিসাবেও তিনি অতিশয় সদালাপী, বন্ধুবৎসল ও অমায়িক। ১৯৬৪ সালে নিখিল বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতিরূপে আমি যখন কটক যাই তখন আমার সঙ্গে বিশুবাবু ও ভবানীবাবুও গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আমরা একসঙ্গে কোনার্ক ভ্রমণ করে কয়েকদিন একসঙ্গে কাটিয়ে ফিরে আসি। এ কয়দিন আমাদের খুব আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটেছিল।

আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে আর একজনের নাম উল্লেখ না করলে আমার এ জীবনী-গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তিনি হলেন স্বনামধন্য বিমল মিত্র মহাশয়। আমাদের প্রকাশন-সংস্থা থেকেই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ছাই' প্রকাশিত হয়। তাঁর আর একটি শিশু-উপন্যাস আমরা প্রকাশ করি, সেটি হল আমেরিকায় প্রকাশিত 'Yarling'-এর অনুবাদ। তাঁর সাহেব বিবি গোলাম, বেগম মেরী বিশ্বাস, কড়ি দিয়ে কিনলাম, একক দশক শতক, সখী সমাচার, বেনারসী—এগুলি হল সব থেকে জনপ্রিয় উপন্যাস। কড়ি দিয়ে কিনলাম-এর দাম হল ত্রিশ টাকা। এত দামী বাংলা উপন্যাস আর একখানিও আছে কিনা সন্দেহ। তাঁর বহু গল্প বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে ও মঞ্চে রূপায়িত হয়েছে। 'মৌচাকে' তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে—সুতরাং শিশু-সাহিত্যেও বিমলবাবুর দান কম নয়। ছেলেদের জন্য লেখা তার উপন্যাস 'কেস নং ৪৯' 'মৌচাকে'ই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

উপরে যাঁদের নাম করলুম তাঁরা ছাড়া আরও যেসব সাহিত্যিক

বন্ধু আমাদের দোকানে এসেছেন এবং এখনও এসে গল্পে আলোচনায় প্রীতির বন্ধনে আমাকে ভরিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁর বহু উপন্যাস মঞ্চে ও চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। এই বছর সাহিত্য-আকাদমী কর্তৃক সম্মানিত হয়েছেন তাঁর 'নিশিকুটুম্ব' উপন্যাসের জন্য। প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন শিক্ষক, সে-সময় গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

বেঙ্গল পাবলিশার্স ও গ্রন্থপ্রকাশ—এই দুটি পুস্তকের দোকানের মালিক তিনি। তাঁর এই প্রতিষ্ঠান দুটি থেকে বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। মানুষ হিসাবে তিনি অত্যন্ত সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর। আমরা দুজনে সমব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে প্রীতির অভাব কোনদিনই ঘটে নি।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় আর একজন পাকা সাহিত্যিক যাঁর 'কলকাতার কাছেই' কয়েক বছর আগে সাহিত্য-আকাদমী কর্তৃক সম্মানিত হয়েছিল। রবীন্দ্র-পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। তিনি মিত্র ও ঘোষ প্রকাশন-সংস্থার অন্যতম স্বত্বাধিকারী। বহু গল্প এবং উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত। এঁর সঙ্গেও আমার পরিচয় আজ দীর্ঘদিন থেকে।

আর একজন সুপণ্ডিত সাহিত্যিক বন্ধুর নাম এখানে উল্লেখ করা দরকার—তিনি হলেন প্রমথনাথ বিশী। এঁর সঙ্গে পরিচয় আমার দীর্ঘদিনের ধরতে গেলে রাজসাহী থেকে কলকাতায় এসে যখন তিনি প্রথম সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন তখন থেকেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ও বঙ্কিম-সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য।

আগে ইনি মেট্রোপলিটান কলেজ ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপক ছিলেন, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রধানরূপে ছিলেন। বর্তমানে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আছেন—

'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় নিয়মিত কমলাকান্তের দপ্তর লিখে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন।

সমালোচনা ও শ্লেষাত্মক রচনায় বর্তমানে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

যে সব সাহিত্যিক বন্ধুর কথা আগে বলেছি তাঁরা ছাড়া আরও যাঁরা আমার স্মৃতিপটে এসে ভিড় করছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেণীর লোক আছেন। যেমন শিল্পী, চিত্রপরিচালক, চিত্রনট প্রভৃতি। এঁদের কারুর সঙ্গে পরিচয় খুব নিবিড়, কারুর সঙ্গে সামান্য এবং কারুর সঙ্গে হয়ত একদিনের আলাপ মাত্র। কিন্তু সকলেই স্মৃতির পর্দায় যে দাগ কেটে গেছেন সে দাগ হয়ত কিছু কিছু মুছে গেছে—সেটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়, তবে এখনও অবসর মুহূর্তে যাঁদের মুখগুলি মনের পর্দায় উঁকিঝুঁকি মারে তাঁদের সম্বন্ধে দু-চার কথা না বলে আমার এ স্মৃতিচারণের যবনিকা টানতে পারছি না।

প্রথমে ধরা যাক ভারতীয় চিত্রজগতের একটি অতিপরিচিত ব্যক্তি—শ্রীদেবকীকুমার বসু। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ দীর্ঘদিনের। নির্বাক চলচ্চিত্রে তিনি প্রথমে অভিনয় করে চলচ্চিত্র জগতে পদার্পণ করেন। সবাক চিত্রযুগের প্রথম দিক থেকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁর পরিচালনায় যে সব ছবিগুলি আমরা দেখেছি সেগুলি সব দিক থেকেই স্মরণীয়—উপস্থাপনায়, বিষয়-বৈচিত্রে এগুলি ছিল যেমন অভিনব, তেমনি লিরিক্যাল-ধর্মী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কবি, সোনার সংসার, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, মীরাবাঈ, রত্নদীপ, চিরকুমার সভা প্রভৃতি। বৈষ্ণব-সাহিত্য নিয়ে ও অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবে তিনি কয়েকটি রবীন্দ্র-কাহিনীও প্রযোজনা করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং রস-পরিবেশনার কৃতিত্ব আমাকে মুগ্ধ করে। বর্তমানে তিনি চিত্রনির্মাণের ক্ষেত্র থেকে একরকম অবসর নিয়েছেন। তা হলেও বাংলা তথা ভারতীয় চিত্র-জগৎ কোনদিন দেবকীবাবুকে

বিস্মৃত হবে না, তার কারণ ভারতীয় চিত্রজগৎকে পরিপুষ্ট করতে তাঁর অবদান অনেকখানি।

তখনকার দিনে যখন বোম্বাইয়ে এত শিল্পী কলকাতা থেকে যাতায়াত করতেন না, সে-সময়েই দেবকীবাবু বোম্বাইয়ে চিত্রনির্মাণ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' তিনি কলকাতায় চলচ্চিত্রায়িত করেন এবং বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট বাঙালা শিল্পী অশোককুমার এই বাংলা ছবিতে অভিনয় করেন। কানন দেবী এই ছবিতে নায়িকা-চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

এই সূত্রে আর একজনের কথাও না বলে পারছি না—তিনি হলেন বাংলা চিত্রজগতের স্বনামখ্যাত গায়ক-অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল। তিনি সুদর্শন, সুঅভিনেতা এবং সঙ্গীতে সুপণ্ডিত বলে সর্বজন-স্বীকৃত। তাঁর বহু ছবি আমি দেখেছি এবং মুগ্ধ হয়েছি। বাংলা, হিন্দি, ইংরাজী ছাড়াও তিনি ফরাসী, জার্মান ও উর্দু ভাষাও খুব ভাল জানেন। প্রথম জীবনে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে যান, কিন্তু সেখানে বিশেষ সুবিধে করতে না পারায় চলে যান লক্ষ্ণৌ-এর ম্যারিস কলেজে সঙ্গীত শিক্ষা করতে। কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ অতুলপ্রসাদের সংস্পর্শে এসে তিনি অতুলপ্রসাদের গান খুব ভাল রপ্ত করেন।

মানুষ হিসাবে তিনি খুব আমুদে এবং আসর জমাতে ওস্তাদ। সব ব্যাপারে বিশেষতঃ পোশাক-আশাকে, নানারকম টুকিটাকি নতুন ধরনের জিনিস কেনায় তিনি নতুনত্বের প্রয়াসী। তাঁর দিলখোলা মেজাজ এবং হাসি-খুশী স্বভাবের জন্য যে কোন লোককে সহজেই তিনি আপনার করে নিতে পারেন।

আগেকার দিনের সুলেখিকা প্রিয়ংবদা দেবীর একখানি ছেলেদের বই আমরা প্রকাশ করি, তাতে নন্দলাল বসু ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। ইনি হলেন প্রমথ চৌধুরী ও আশুতোষ চৌধুরীর ভগিনী প্রসন্নময়ী

দেবীর কন্যা। প্রিয়ংবদা দেবীর কণ্ঠস্বর খুব মধুর ছিল। অল্পবয়সে বিধবা হন। এঁর ব্যবহার ছিল খুব অমায়িক।

শিশু-সাহিত্যজগতে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম বিশেষ সুপরিচিত। ছেলেদের গল্প লিখে তিনি রাশিয়া থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। 'মৌচাকে'র ইনি নিয়মিত লেখক। রাজশেখর বসু মহাশয়ের ইনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমাদের প্রকাশন-সংস্থা থেকে প্রকাশিত চলন্তিকা ব্যাপারে তিনি অনেক সাহায্য করেছিলেন।

'মৌচাকে'র আর একজন নিয়মিত লেখক হলেন বিমল দত্ত। ইনি বেশীর ভাগই হাসির গল্প লেখেন এছাড়া কবিতাও ভাল লিখতে পারেন। শিশু-সাহিত্যজগতে এঁর লেখা 'শিং খুড়ো' গল্পগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'মৌচাকে'র আর একজন লেখিকা হলেন ইন্দিরা দেবী। ইনি বহু পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘদিন ধরে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে যুক্ত আছেন। 'মধুদি' নাম দিয়ে 'মৌচাকে' নিয়মিত লেখেন।

বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব সেক্রেটারী চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল একসময়ে। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক। সেই সময় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে তাঁর গবেষণার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেন। পরে তিনি বঙ্গীয়-প্রকাশক-সমিতির সভাপতি হন। শেষ বয়সে ইনি 'বসুধারা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

আমার একজন প্রিয় বন্ধু হলেন ডাঃ নির্মল সরকার। ইনি শুধু সাহিত্য-রসিক নন, সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁর বিশেষ পরিচিতি আছে। ডিটেকটিভ গল্প লেখাতে তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর একটি মহৎ গুণ হল কোন সাহিত্যিকের অসুখ-বিসুখ করলে তিনি সানন্দে তার চিকিৎসা করেন, কোনরকম প্রতিদানের প্রত্যাশা না করেই।

অধুনালুপ্ত 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদক অবিনাশ ঘোষাল ছিলেন

আমার আর একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ। অবিনাশবাবু প্রথম জীবনে আলিপুরে ওকালতি করতেন, তারপর ওকালতি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি-ভাবে সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যচর্চা করেন। তাঁর সম্পাদনায় 'বাতায়ন' এক সময় অসম্ভব খ্যাতি অর্জন করেছিল।

১৯১৪ সালে আমরা Bench & Bar Diary বার করি। এর সম্পাদক ছিলেন দার্জিলিং-এর রায় বাহাদুর এম. এন. ব্যানার্জী। তারপর ১৯১৮ সালে 'ঘোষেস ডায়েরী' নাম দিয়ে একটি ডায়েরী প্রকাশিত হয়, তার সম্পাদক ছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং এই ডায়েরী আমরাই প্রকাশ করি ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত। তারপর জ্ঞানবাবুর মৃত্যুর পর কয়েক বছর উপরোক্ত নামেই আমরা ডায়েরী বের করি, যদিও এই ডায়েরী প্রকাশ করে লাভ বিশেষ কিছুই হয়নি তবে সুনাম যথেষ্ট পেয়েছিলাম। তারপর আমরা বের করি 'সরকারস্ ডায়েরী'। এই ডায়েরীটি এখন পর্যন্ত বিশেষ সুনামের সঙ্গে আমাদের প্রকাশন-সংস্থা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

যে-সব বিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জন্মে তাঁদের বিষয়ে কিছু কিছু উল্লেখ করছি। আমি এখানে তাঁদের কারু শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা করছি না, তাঁদের শুধু আমার অন্তরের প্রীতি জানাবার জন্যেই নামোল্লেখ করছি।

এঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কথা। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় রামকৃষ্ণ মিশনের গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের মাধ্যমে। নন্দলাল বসুর একখানা শিল্প-পুস্তক আমরা প্রকাশ করি—তার নাম 'ফুলকারী'। বইখানি খুবই জনসমাদর লাভ করেছিল।

লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ অসিতকুমার হালদার আমার বিশেষ বন্ধু। তাঁর এক মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ আমি করে দিই সৌরীন্দ্রমোহনের পুত্র সৌম্যেন্দ্রের সঙ্গে।

এঁরা ছাড়াও আর যেসব শিল্পীর সঙ্গে আমার বিশেষ অন্তরঙ্গতা জন্মে তাঁরা হলেন এলাহাবাদ আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ললিতমোহন সেন, বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রচার-শিল্পী ও রাজশেখর বসুর সমস্ত বইগুলির যিনি অঙ্গসজ্জা করেছিলেন সেই যতীন সেন, পূর্ণ ঘোষ, প্রচারশিল্পী ও কার্টুনিস্ট বিনয় বসু, 'ওমর খৈয়ামে'র চিত্রকর হিতেন্দ্রমোহন বসু, পোর্ট্রেট-শিল্পী অতুল বসু, আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুল দে এবং পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি।

আমার আর একজন অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন অবনীনাথ মিত্র (চানুবাবু)। প্রতিদিন তাঁর আমাদের দোকানে আসা চাই-ই। এমন কি বৃদ্ধবয়সে পক্ষাঘাতে তিনি চলৎশক্তিরহিত হয়ে যান, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বাড়ীর লোকেরা ধরে ধরে নিয়ে আসতেন তাঁকে আমাদের দোকানে—এমনই ছিল তাঁর টান আমার ওপর। আজ তিনি আর ইহজগতে নেই, কিন্তু তাঁর সেই মধুর ব্যক্তিত্ব আজও আমার মনে অম্লান হয়ে আছে।

আমার দোকানে এখন নিয়মিত আসেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। নানারূপ সরকারী কাজে এখনও তিনি সংশ্লিষ্ট এবং ইংরাজী-বাংলা দুই ক্ষেত্রেই তিনি রচনায় সিদ্ধহস্ত এবং অরবিন্দ ও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বহু লেখা আছে।

আর একজন বিপ্লবীর নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে তিনি হলেন কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইংরাজ আমলে বহু পুলিশী নির্যাতন তিনি সহ্য করেছেন, এমন কি উৎপীড়নের ফলে পড়ে তিনি সোজা হয়ে বসতে পর্যন্ত পারতেন না। তিনি তাঁর গুরু স্বামী প্রজ্ঞানানন্দর নামে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করে দেন সেটি এখনও আমাদের দোকানের কাছেই রয়েছে। এই পাঠগৃহটির বর্তমান পরিচালক হলেন সরস্বতী প্রেসের শৈলেন গুহরায় মহাশয়। এই লাইব্রেরী স্থাপনে আমি তাঁকে আমার সাধ্যমত সাহায্য করেছিলাম।

ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজের স্বত্বাধিকারী ধীরেন ধর, হাস্যরসিক দা'ঠাকুর, কবি জসীমউদ্দীন, বিপ্লবী ও সাংবাদিক মাখনলাল সেন, কবি ও 'অমৃতে'র সহ-সম্পাদক মণীন্দ্র রায় এঁরাও আমার জীবনের চলার পথে নানাভাবে জড়িয়ে আছেন।

আর একজন চৌকষ ব্যক্তির কথা আজ আমার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, তিনি একাধারে ক্রিকেট-খেলোয়াড়, ভালো ফটোগ্রাফার এবং সাহিত্যিক। শিশুসাহিত্য-জগতে তাঁকে সকলেই চেনে, ইনি হলেন কুলদারঞ্জন রায়। এঁর বত্রিশ সিংহাসন, রত্নদ্বীপ, আশ্চর্য দ্বীপ শিশুমহলে খুবই সমাদৃত—তা ছাড়া প্রাচীন সাহিত্য থেকে ছোটদের উপযোগী করে বহু গল্প লিখেছেন।

আমার দোকান এবং প্রকাশনার ব্যাপারে যাঁরা আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন তাঁদের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। বহুভাবে যাঁরা আমার জীবনের চলার পথকে সহজ ও সরল করেছিলেন—তাঁরা হলেন অপূর্বকুমার বাগচী, অশোক গুপ্ত, অমর দেব, নলিনীমোহন রায়চৌধুরী, পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

সকলের কথাই মোটামুটি বলা হোল, বলিনি শুধু একজনের কথা—অথচ তাঁর কথাই আমার সর্বাগ্রে বলা উচিত ছিল, কারণ আমার এই পৃথিবীতে আসার মূলে তিনিই। হ্যাঁ, আমি আমার মার কথাই বলছি। তিনি ছিলেন বহরমপুরের কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক আনন্দচন্দ্র সরকারের কন্যা মনোমোহিনী দেবী। মার কথা সবশেষে বলার কারণ হোল যে মাতৃ ঋণ তো কখনও শোধ করা যায় না—আর তাঁর স্নেহ-ভালবাসা, শাসন-অনুশাসনের গভীরতার পরিমাপও করা যায় না। আশী বছর বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন পৃথিবী থেকে কিন্তু চোখ বন্ধ করে মনের গভীর অতলে খুঁজে দেখলে দেখতে পাই তাঁকে—তাঁর সেই সদাহাস্যময় স্নেহমধুর

মূর্তিকে। আজ আমি তাঁকে প্রণাম জানাই আমার স্মৃতিচারণ শেষ করার প্রাক্কালে।

'আমার কাল আমার দেশ' সম্বন্ধে যা কিছু বলার তা আজ মোটামুটি শেষ হল। হয়ত আরও অনেক কিছুই বলার ছিল, লেখার ছিল—সব কথা ঠিকমত গুছিয়ে বলতে পারিনি—হয়ত স্মৃতিপথে অনেকের কথা বা অনেক ঘটনা আবছা হয়ে গেছে বলে বলতে পারিনি, বিশ্বাস করুন সে ত্রুটি আমার ইচ্ছাকৃত নয়। তবে এটা ঠিক যে, যেটুকু বলেছি বা বলতে পেরেছি—তার মধ্যে কোনরকম ভেজাল নেই—সবটাই নির্ভেজাল সত্য।

আজ জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে একটি কথাই বলতে ইচ্ছা করে—বেলা যায়। সেই সঙ্গে মনের পর্দায় ভেসে ওঠে আর একটি প্রশ্ন: কেন আমি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করলাম আর কেনই বা বইয়ের ব্যবসা করতে গেলাম এত ব্যবসা ছেড়ে?

একথা এখন ভাবতেই আমার খুব আশ্চর্য লাগে। বাবা ছিলেন বিচারক, রায়বাহাদুর খেতাবও পেয়েছিলেন তিনি। তিনি আইনের বই লিখতেন। ইংরাজী আমলে তখনকার সাহেবরা বাবাকে ভালবাসতেন খুব। দাদা আইন পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার একটি মুখের কথায় মুন্সেফের চাকরী পেয়ে গেলেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে আমারও তাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হল না।

বাবা চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পর বড়সাহেবরা বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: রায়বাহাদুর, বল, তোমার জন্যে আর কি করতে পারি? অর্থাৎ ইঙ্গিতটা হোল যে তোমার তো আরও ছেলে আছে, যদি তুমি বল তাহলে তাদের জন্যেও কিছু করে দিতে পারি। বাবা আমার মুখের দিকে চাইলেন। কিন্তু আমার ছোটবেলা থেকেই ঝোঁক ছিল সাহেবদের চাকরী আমি করব না। সাহিত্যিক হতে পারি আর না পারি সাহিত্যের মধ্যে ডুবে থাকা—সাহিত্যিক ও

শিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, এই ছিল আমার চিরদিনের সাধ; আমি কারু কোন কথা না শুনে সাহিত্যসেবা এবং বই-এর ব্যবসা, এই পথটাই বেছে নিলাম। এই পথ তখন কণ্টকময়, অনিশ্চিতের পথ। এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথ বেছে নেওয়ায় বাবা অবশ্য কিছুই বললেন না। তিনি আমার স্বাধীন মতামতকে উপেক্ষা তো করলেনই না, বরং তাঁর সস্নেহ আশীর্বাদের আলোয় আমার যাত্রাপথকে রাঙিয়ে দিলেন।

কিন্তু অনেকেই আমার পাগলামি দেখে হেসেছিলেন। অবশ্য তদানীন্তন সমাজের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তখন ক'টা লোকই বা বাংলা বই পড়ত এবং বই-এর ব্যবসার জন্যে লেখাপড়া শিখে অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়াত? চাকুরে, বিশেষতঃ সরকারী চাকুরেদের খাতিরই তখন আলাদা। মাসান্তে একটা নিশ্চিত আয়, শেষজীবনে পেনসন, নিরুদ্বিগ্ন জীবন-যাপন এ কে না চায়? বিরাট প্রলোভন এবং প্রতিবাদের তুমুল ঝড়-ঝঞ্ঝা ভেদ করে আমায় এগিয়ে আসতে হয়েছিল। কিন্তু আমি আমার আদর্শ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হইনি। এইভাবেই আমি সাহিত্যসেবা ও বই-এর ব্যবসায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

আজ জীবনের পথপ্রান্তে এসে যাত্রারম্ভের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় সত্যিই কি আমি অন্যায় করেছি? আমি কি ভুল পথ বেছে নিয়েছিলাম? চাকরী করলে হয়ত চিরজীবন নিরুদ্বেগে কাটাতে পারতাম। কিন্তু নিবাতনিষ্কম্প পুষ্করিণীর জলের মত আমার জীবন-সরোবর একদিন শুকিয়ে যেত। অতি নিকট পড়শীরা ছাড়া আর কারু মনেই পড়ত না এই পুষ্করিণীটির কথা। কালক্রমে তারাও হয়ত ভুলে যেত, আর পুষ্করিণীটির ওপরেও তৈরী হোত বৃহৎ ইমারত। আমি সে জীবন চাইনি; আমি চেয়েছিলাম অশান্ত সমুদ্রের মত উত্তাল হতে, যাতে তার তরঙ্গমালার উপর দিয়ে বহু তরণী জানা-

অজানা বহু দেশের দিকে পাড়ি দেয়—বহু নরনারীর নিবিড় সংস্পর্শে এসে সমুদ্র যেন নিজেকে ধন্য মনে করে।

চাকরী করলে কি হোত। নির্দিষ্ট সময় একটা গণ্ডীর মধ্যে থেকে অপরের মতে মত দিয়ে চলা, তারপর বাড়ী ফিরে গিয়ে পান চিবোতে-চিবোতে পার্কে বসে, নয় কারুর দাওয়ায় বা বৈঠকখানায় বসে পরনিন্দা পরচর্চা করা ; নয়ত অবসর সময়ে তাস-পাশা-দাবা খেলে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া। আমি ঠিক এ জীবন চাইনি।

এখনও আমার মনে হয়, আমার অনেক কাজ বাকী—অনেক লেখা বাকী। সম্প্রতি একটা ছোটদের এনসাইক্লোপিডিয়া লিখতে শুরু করেছি কিন্তু সে কাজটা এতই বিরাট যে শেষ করে যেতে পারব কিনা জানি না। এই এনসাইক্লোপিডিয়া রচনার একটা ইতিহাস আছে। অনেকদিন আগে আমার ছেলেরা যখন ছোট, তখন আমি তাদের পড়াতাম। দেখতাম যে সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। যেটুকু স্কুলের পড়া তার বাইরে আর তারা কিছু জানে না। যেমন হিমালয় কত উঁচু, পৃথিবীর কোন সমুদ্র কত গভীর, কোন জন্তু সবচেয়ে দ্রুতগামী, এ সমস্ত কিছুই তারা বলতে পারে না। স্কুলের পড়ার বাইরে যে একটা বিরাট জগৎ পড়ে আছে সে সম্বন্ধে তারা একেবার অজ্ঞ। ক্লাসে কোনমতে প্রমোশন পেলেই তারা খুশী। শিক্ষকমশাইরাও তেমন কিছু ভ্রুক্ষেপ করেন না।

আমি তখন ঠিক করলাম যে ছেলেদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে একটা কিছু করা দরকার। আমি তখন 'সাধারণ জ্ঞান' নাম দিয়ে একটি বই লিখলাম, এবং সে বইখানি এত জনপ্রিয় হয় যে তার ৩৬টি সংস্করণ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এই থেকে আমি 'হিন্দুস্থান ইয়ার বুক' লেখার প্রেরণা পাই। এই বই যে শুধু লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে তাই নয়, আমায় বহু সম্মানও দিয়েছে।

এরপর বড় ছেলে সুব্রতর বিয়ে হল। ঘরে ফুটফুটে বউ এল। ছোট্ট মেয়ে—ক্লাস নাইন-এ পড়ে—তাকে 'মেঘনাদ বধ' পড়তে হয়।

প্রচুর পৌরাণিক চরিত্রের ভীড় তাতে। আমি তাকে সব চরিত্রই বুঝিয়ে দিতাম, কিন্তু সে সব মনে রাখতে পারত না। আমার স্ত্রী সুলেখা তার জন্যে ছোট ছোট করে নোট লিখে দিতেন। আমি দেখলাম, রামায়ণ-মহাভারত ও বেদ ইত্যাদিতে যত চরিত্র আছে ও আবশ্যকীয় তথ্য আছে এই সবগুলিকে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে একটি বই-এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করলে তো অনেকেরই সুবিধে হয়। সেই হল আমার 'পৌরাণিক অভিধান' লেখা শুরু। এবং আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এ বইখানি বাংলার সুধীসমাজ সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন।

আমার ছোট ছেলে সুপ্রিয় কলেজের পড়া শেষ করে আমারই দোকানে ঢুকল, দোকানের কাজ-কর্ম সব দেখাশোনা করতে লাগল। কপিরাইট এ্যাক্ট সম্বন্ধে তার তখন বিশেষ কোনো জ্ঞান ছিল না এবং হাতের কাছে এই সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ভাল বইও ছিল না। তখন আমি কপিরাইট সম্বন্ধে একটা আইনের বই লিখি।

এইবার আমার শেষের পালা। দেহ অক্ষম হয়ে এসেছে—দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ। জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি—অনেক ভালবাসা, সম্মান, অর্থ, যশ, বন্ধু—মানুষের যা কাম্য সবই অল্প-বিস্তর পেয়েছি——কিছু না-পাওয়ার আক্ষেপ আমার নেই। বিধাতার কাছে সেই দিক দিয়ে আমি অশেষরূপে কৃতজ্ঞ।

আমার জীবনী যে কোনদিন লিখতে হতে পারে একথা কোনদিনই ভাবিনি। ভাবলে হয়ত অনেক মাল-মশলা সংগ্রহ করে রাখবার চেষ্টা করতাম। আমার জীবনে কোন উত্তেজনা নেই, কোন উপন্যাসের নায়কের মত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নেই। এক চেয়ারে বসে আছি আজ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর। সে চেয়ার পেরেক মারতে মারতে বেঁকে গেছে। চারিদিকে শুধু বই দিয়ে ঘেরা। নতুন আর পুরনো সব বইয়ের মাঝে আমি যেন হারিয়ে যাই।

ছোট ছোট ছেলেরা আসে—তাদের কচি হাতের লেখা নিয়ে

'মৌচাকে' ছাপাতে। তার কিছুদিন পরেই শুনি তারা বিরাট সাহিত্যিক হয়েছে, কেউ রবীন্দ্র-পুরস্কার পাচ্ছে—কেউ ডক্টরেট হচ্ছে, কেউ বৈজ্ঞানিক হচ্ছে—কেউ বা নেতা হচ্ছে। দেশে-বিদেশে তাদের যত নাম-ডাক ছড়াচ্ছে, গর্বে আনন্দে আমার বুকও তত ভরে উঠছে। আজ যারা অঙ্কুর, কাল তারা বিরাট বনস্পতিরূপে লোকের সম্ভ্রম জাগাচ্ছে।

জীবনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় প্রচুর লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে— বহু বন্ধু আমি পেয়েছি। কেউ সাহিত্যিক, কেউ শিল্পী, কেউ অভিনেতা, কেউ শিক্ষাবিদ, কেউ বা দেশনেতা, কেউ রাজনীতিক। সকলের স্নেহ প্রীতি ও ভালবাসা আমি পেয়েছি। আমাকে কেউ ঘৃণা করেনি, অপবাদ দেয়নি বা অবহেলা করেনি। সম্মান জানিয়েছে সকলে। সেইদিক থেকে আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে করি।

আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করে আমার এই গ্রন্থের যবনিকা টানতে চাই আমি। সেটি হল সব শেষের কথা—অন্তরের কথা এবং দরকারী কথা। 'আমার কাল আমার দেশ' লিখতে যাঁরা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, সাহায্য করেছেন সবদিক দিয়ে তাঁদের কথা আমি স্বীকার করছি অকপটভাবে। তাঁদের সাহায্য না পেলে হয়ত এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হোত না। তাঁদের আমি অন্তরের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করলাম।